সম্পাদকীয়

দুই সংখ্যার দ্বিতীয় সংখ্যা সময়মত প্রকাশ হলেও 'সাঁকো' বাৎসরিক গন্ডি থেকে বের হতে পারল না ২০১৩তে। ইচ্ছা আর সাধ্যের মধ্যে যে টানাটানি চলে আমাদের দৈনন্দিন কাজে তাতে ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যে হল না। তবে তপনদার 'স্মরণিকা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'টেম্পার কারখানা'র জঠরে 'সাঁকো'র বাৎসরিক পত্রিকার শুরুর মতই হয়তো অমূল্যভূষণ পালের স্মৃতিতে 'সাঁকো'র বিশেষ সংখ্যা ২০১৪-তে সান্মাষিক প্রকাশনার শুরু হিসেবে ভবিষ্যতে থেকে যাবে।

পল্লবদার বাবা আমাদের মেসোমশাই, দিয়েই পরিচয়ের শুরু, তারপর 'সাঁকো'র প্রথম সংখ্যা ২০০২ থেকে শ্রী অমূল্যভূষণ পালের প্রবন্ধ, গল্প আর কবিতা 'নবম' সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ সংখ্যায় অসুস্থতার জন্য লেখা দিতে পারেননি। 'দশম' সংখ্যা হাতে পৌঁছে দেবার সময় অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন ডাক্তার ছোট ছেলের কাছ থেকে ইঞ্জেকশন নিতে নিতেই। গল্পের মধ্যে এত প্রাণের পরশ আর শিক্ষার রসদ থাকত যে আমরা সময়ের হিসাব রাখতে পারতাম না। কোনদিন বিরক্ত হতেন না। প্রকৃত অর্থে 'সাঁকো'র অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন উনি। আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্ম হওয়া 'সাঁকো'কে উনি দায়বদ্ধ করেছিলেন ওনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অমূল্য মিশ্রণে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারিতে উনি মারা যান একটি নার্সিং হোমে। পরের দিন আর.জি.কর হাসপাতালে ওনার দেহদান হয়। 'সাঁকো'তে প্রথম '৩৪' জন মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদানের অঙ্গীকারকের মধ্যে উনি ছিলেন। এই বিরল কাজের মানুষের স্মৃতিচারণা সম্পাদকীয় বা 'স্মৃতিচারণা ও প্রেরণা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় তাই 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হবে। পল্লবদা সহ ওনার পরিবারের সবার কাছে অনুরোধ থাকবে এই প্রচেষ্টায় আমাদের পাশে থাকার। চরম বেদনার মধ্যে কিছু ক্ষোভ থেকে গিয়েছিল আমাদের এই শ্রদ্ধেয় অভিভাবকের মরণোত্তর 'দেহদান'কে ঘিরে। চক্ষুদান সুষ্টভাবে মিটলেও মরণোত্তর দেহদানের সময় আর.জি.কর হাসপাতালের পরিবেশ ঠিক ছিল না। এই মানবিক আন্দোলনের আমরা সৈনিক হওয়ার সূত্রে আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে কি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে এই দান গ্রহণ করা হত পশ্চিমবাংলার সরকারী হাসপাতালে এই কয়েক বছর আগেও। সত্যিই বিশ্বাস হত ডাক্তারী শিক্ষায় এই দানের মূল্য। সেই নির্মল পরিবেশের 'পরিবর্তন' হয়ে গেছে। ঐ কলেজের একজন প্রাক্তন শিক্ষকের পিতা হওয়া সত্ত্বেও কি অবহেলায় পড়েছিল তাঁর দেহ, 'লাস কাটা' ঘরের পাশে। একেবারে স্থির হয়ে বাবার দেহ আগলে বৌমা ও ছেলেরা দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। অমূল্যদানের এই অবহেলা অমূল্যভূষণ পালের প্রতিবাদী কলমে কি রূপে প্রকাশ পেত তা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু আমরা এর 'পরিবর্তন' করব।

২০১৩ ভাল-মন্দ মিলে কেটেছে। তবে মন্দের চূড়াগুলো এবারে উচ্চতায় অবশ্যই উচ্চতর বা কঠিনতর ছিল অন্য বছরের তুলনায়। ফলে উত্তরণ বা অগ্রগতি সহজ বা মসৃণ হচ্ছে না, কিছু ক্ষেত্রে থমকে গেছে। ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত শক্তিক্ষয় হয়েছে, মনে হয়েছে শেষ বা ফুরিয়ে যাব। দু-একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের সবচেয়ে পুরান ঐতিহ্যবাহী তাপ প্রক্রিয়াকরণ বিভাগে কাজের সংকটের কথা বিগত দুটি সম্পাদকীয়তেই উল্লেখ ছিল। এবারে বাহিরের কাজ একেবারেই বন্ধ। আমাদের প্রধান গ্রাহক Usha Telehoist প্রায় বন্ধ হয়ে BFIR-এ গেছে। ফলে ওদের কাজ থেকে পাওনা ৩০ লক্ষ টাকা আদায়ের আইনী রাস্তাও বন্ধ। বছর দু আগে পর্যন্ত আমাদের মোট কাজের ১/৩ অংশ ছিল তাপ প্রক্রিয়াকরণ। Central Boiler Board (CBB) এর স্বীকৃতির পর ২০১২-র শেষদিকে কারিগরী পরিষেবা বিভাগের কাজের সুযোগ অনেকটাই সন্তোষজনক হয়। মে-জুন মাসে মাঙ্গালোর এবং বীণায় দুটো বড় site শুরু হয়। আর্থিক ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় man-machine-material জোগানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দুটো জায়গাতেই কাজে বিঘ্ন ঘটে। এক জায়গায় তিনটি Boiler এর কার্যকারী জীবনকাল নির্ধারণের কাজ ছিল এবং অপরটি ছিল বিস্ফোরক গ্যাস সংরক্ষণের জন্য ছয়টি Horton Sphere এর বর্তমান 'ব্যবহার পরবর্তী' কারিগরী স্তর পরীক্ষা করে আগামী পাঁচ বছর এর জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান। একটি ক্ষেত্রে Boiler গুলি এত ঘনঘন বিকল হতে থাকে যে দুটিকে চালু রেখে তৃতীয়টির সমস্ত রকম পরীক্ষা করবার জন্য নির্ধারিত সময় দেওয়া বাস্তবে অসম্ভব হয়ে পড়ে, ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, Team ফেরত চলে আসে। অন্যটিতে ছয়টি Horton Sphere-এর মধ্যে তিনটিতে ৪০০-র উপর crack গত পাঁচ বছর আগের পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল এবং তা সারাতে গিয়ে দুশোর উপর

বিপজ্জনক গর্ত তৈরি করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তার গুরুত্ব বুঝে এই অবস্থার জন্য আরও অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) থেকে তিনটি sphere কে বাতিল না করে সঠিক নিরাপত্তা বজায় রেখে চালু রাখার উপায়ের অনুমতি ও অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট সময় লাগে। আমাদের কাজ থমকে যায়। পূজার সময় এক মাসের জন্য site বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে আমাদের সহকর্মী শ্রী কার্ত্তিক সেন কর্মরত অবস্থায় উপর থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান ও গুরুতর আহত হয়। বাঁহাতে একাধিক জায়গার হাড় ভেঙ্গে যায়। E.S.I.তে জটিল operation হয়। এছাড়াও পূজার বোনাসের ধাক্কা, ব্যাঙ্কের সহায়তার অভাব, স্বাধীনতার পর খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি এবং সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু সংস্থা ও সদস্যের অসহযোগিতা রয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও গরিষ্ঠাংশ সদস্য হার মানতে রাজী ছিল না। আসাম বা গুজরাট বা কারখানায় যতটুকু কাজের সুযোগ ছিল তাকে গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে থাকে একদিকে অন্যদিকে Report ও Bill করা এবং পাওনা সময়মত নিশ্চিত করা, কারিগরী ক্ষেত্রে সঠিক উদ্ভাবনী সমাধান বার করে থেমে পরা site গুলোতে কাজ শুরু করা, Bank এর সাথে ধৈর্য্য ধরে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা, NSIC-Corporation-Tax প্রভৃতি সরকারী জায়গায় নিজেদের ঘাটতিগুলো সময়মত পূরণ করা, নাটকের শিল্পীরা বিভিন্ন জায়গায় কাজে ব্যাস্ত থাকায় script ও মহড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং দর্শকদের থেকে কয়েকজন এগিয়ে আসেন, পত্রিকার লেখা সংগ্রহ ও প্রুফ সংশোধন হতে থাকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মারফত যাতে সদস্যরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, নতুন নতুন শিক্ষাকর্মী জড়ো হন শিক্ষা কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমাদের ছোট জায়গার মধ্যেই ৩০ জন ছাত্রের একসঙ্গে বসবার ব্যবস্থা হয় প্রভৃতি ঘটনাও ঘটতে থাকে। ফলে বছর শেষে দেখা যায় কারখানায় কাজের এত অনিশ্চিয়তার মধ্যেও মোট কাজের পরিমান গতবারের তুলনায় বেড়েছে, কার্ত্তিকের হাত অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে, মাহিনা-বোনাস অনিয়মিত হয়নি, বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, সাঁকোর বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও পত্রিকা প্রকাশে ছেদ পড়েনি, TMCIL এর ছাত্র সংখ্যা ও অন্যান্য শিক্ষা কর্মসূচী বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি ঘটেছে, অনান্য সামাজিক দায়িত্ব সদস্যরা কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্যেও পালন করেছেন। হতাশা-ক্লান্তি-বার্ধক্য কঠিন বাস্তব হলেও জয় করার তাগিদ বাঁধাকে দূর করে নতুনের আগমনীকে নিশ্চিত করেছে।

২০১৩তে আরও একবার বুঝলাম 'জয় করার তাগিদ' কি মূল্যবান জীবনশক্তি আমাদের মত ছোট সংস্থার কাছে। আজকাল চরম হতাশা আর ভোগবাদের লোভে কেমন যেন সব গুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। ভোগবাদের পীঠস্থানে একদিকে ঘটছে ২৬ দিনের 'Work Shut Down' অর্থাৎ কাজ নেই বেতন বন্ধ, অর্থনীতি টিঁকে রয়েছে পর্যটন আর শিক্ষার উপরে কারণ শিল্প ও বাণিজ্যের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে অসাম্যের ফলে সারা দুনিয়ার গরিষ্ঠাংশ মানুষের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ, কিন্তু দানাবাঁধাতে না পারায় বাড়ছে হতাশা, যার থেকে জন্ম নিচ্ছে নানান বিকৃতি। এই দুর্বিসহ অবস্থায় দেশে ও বিদেশে যাঁরা পাগলাবুড়োর মত মানুষের মনে অন্ধকারের শেষে আলোর আশাকে মরতে দেননি, বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন 'যাঁদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, তাঁদের জয় করার আছে সারা বিশ্ব'। সেই আলোর দিশারীদের মধ্যে থেকে আমরা এ বছর হারিয়েছি নেলসন ম্যান্ডেলা, হুগো সাভেজ, সমর মুখার্জ্জী, গিয়াপের মত অগ্রগনীদের। এনাদের ব্যক্তি জীবন শেষ হলেও জীবন সংগ্রামের অমূল্য শিক্ষা চিরন্তন থাকবে মানুষের অন্তরে 'জয় করার তাগিদ' বাঁচিয়ে রাখতে।

'এক অর্থে বই হল সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি।'

কার্ল মার্কস।

সাঁকো, ৩৯/৩ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৪ হইতে প্রকাশিত ও লেজার ম্যাট কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

বি ই কলেজ ও মান্না দে	*দীপ্ত প্রতিম মল্লিক*	৫
অচেনা চার্লি	*রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য*	৮
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও অধ্যয়ন	*স্বপন দত্ত*	১০
Remembering General VO Nguyen Giap And Dien Bien Phu	***Pathik Mitra***	১২

শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ

হলুদ বৃষ্টি	*অনুপম দাশশর্মা*	১৬
বাঁক ফেরা	*দীপায়ন নন্দী*	১৬
আনমনে গান	*দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী*	১৬
ফিরে পাওয়া বন্ধুত্ব	*ভাস্বতি চক্রবর্তী*	১৭
চোরাবালি	*কৃশানু ভট্টাচার্য্য*	১৮
সাঁকো	*মুদ্রা*	১৮
Living Things	***Raddur (Samaddar)***	১৮
আতসকাঁচের অন্তরালে	*অরিত্র ভট্টাচার্য্য*	১৯
হলুদ পাখি	*পৃথা তা*	২১
ভয়, ভয় ... নেই, নেই	*অপর্ণা চক্রবর্ত্তী*	২৬
মানুষ	*ধীমান দত্ত*	২৭
অ্যাডভেঞ্চার	*দীপমালা গঙ্গোপাধ্যায়*	২৯
সুশীলবাবুর আংটি	*মল্লার দাশগুপ্ত*	৩০
আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের সূত্রপাত : বেকন ও দেকার্ত	*আশীষ লাহিড়ী*	৩১
Technical Education	***Prof. Md. Ismail***	৩৩
Independence Day	***Devdoot Roy Choudhury***	৩৪
Maladies of Engineering Education In West Bengal	***Prof. Indra N Sinha***	৩৫

হাতে আঁকা	*মৌমিতা বাসু*	১৫
	সঙ্গীতা পাল	১৫
	অনন্যা কর	১৫
	রোহক পাল	১৫
	নিরাজ সাউ	৩৮

কবিতা

তাজমহল	*ডাঃ ডি. এন. ঘোষ*	৪১
তিনটি অণুকবিতা	*সমু*	৪১
দাঁড়াও পথিকবর	*কনক কুমার ঘোষ*	৪২
অবক্ষয়	*শুভ্রা পাল*	৪২
ভুল করছি	*অনির্বান চক্রবর্ত্তী*	৪২
দুই কন্যা	*পারমিতা*	৪৩
সত্যি স্বপ্ন	*গার্গী সরকার*	৪৩
মধ্যরাতের শহর	*নন্দিত নন্দিনী*	৪৪
মৌষলপর্ব	*তাপস দাস*	৪৫
জোছনায় ক্যামোফ্লেজ	*সাইদা সারমিন রুমা*	৪৬
রণডিহা-২	*দেবজিৎ চক্রবর্ত্তী*	৪৬
নিকট বৃত্ত	*পারমিতা*	৪৭
নতুনের ডাক	*অনির্বান চক্রবর্ত্তী*	৪৭
কখনো	*ডাঃ নির্মাল্য রায়*	৪৮
চোদ্দো আনা	*সিদ্ধার্থ দত্ত*	৪৮

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

দূর নয় বেশী দূর	*শর্মিষ্ঠা দাস*	৪৯
দিবস এবং তারিখ	*দেবকুমার মিত্র*	৫২
নিবন্ধ মুক্তির শারদোৎসব-২০১৩ (ইং)	*অসিত মজুমদার*	৫৪
মন কেমন করে, মাঝে মাঝে	*কিন্নর রায়*	৫৬
ভানুকাকার তেইশ-ছাব্বিশ	*প্রদীপ দাশগুপ্ত*	৬২
প্রকৃতির রুদ্ররূপ	*জগন্নাথ রায়*	৬৫
At Crossroads	***By Prasun Ray***	৬৬
১৫ থেকে ১৬	*টেম্পার কারখানা*	৬৯

অঙ্কন	সত্যপ্রিয় চক্রবর্ত্তী	৯২

স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

বি ই কলেজ ও মান্না দে

দীপ্ত প্রতিম মল্লিক

[**সূচনা ঃ** আজ ৩৩ বছর হয়ে গেল কলেজ থেকে বেরিয়েছি কিন্তু আজও যেন মনে হয় সেদিনের ঘটনা। সেদিনের সেই সোনাঝরা দিনগুলো ভেবে আজও ভালো লাগে। মন যেন এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে ওঠে। দীর্ঘ দিন বাইরে থেকে আজ ভীষণভাবে ইচ্ছা করছে কলেজ জীবনের সাথে মান্না দের অতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকার কথা লিখতে। মানুষটা আজ নেই, কিন্তু তিনি আজীবন বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। এ লেখা নিজের জন্য তো বটেই, আমার অন্যান্য ভাই-বোন, দাদা-দিদিদের জন্যও। যদি এই লেখা থেকে একটুও হারিয়ে যাওয়া ভালোলাগা ফিরে পাও—এক মুহূর্তর জন্যও, সেটাই হবে আমার সত্যিকারের বড়ো পাওনা।]

সেদিন ভোরবেলা উঠে টিভির খবর দেখে হতবাক—মান্না দে আর নেই। উনি ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে আমাদের অনাথ করে চলে গিয়েছেন। অনাথ-ই হলাম বটে। মান্না দে-র সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ কি আজকের? মন ভারাক্রান্ত, বারবার মন চলে যাচ্ছে সেই পুরানো বি ই কলেজের হোস্টেলের দিনগুলোতে। সেটা ১৯৭৫ সাল। সদ্য হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢুকেছি। আজ প্রায় আটত্রিশ বছরের পুরানো কথা লিখতে বসে মনে হয়—সেই সুখের দিনগুলো ছিল যেন নিছকই স্বপ্ন। চোখ বুজলে এখনো যেন দেখতে পাই ১৯৭৫ সালের সেই দিনগুলি। দেশ জুড়ে ইলেকট্রনিক যুগের সদ্য সূচনা হচ্ছে। প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে ৯ই আগস্ট আর আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখছি সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক ফার্নিচারের মতো বাক্স—যার সামনে কাঁচ-সেখানে ফুটে উঠছে সুন্দর সুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি। অত্যন্ত বনেদী বড়োলোক ছাড়া তখন টেলিভিশন ভাবা যেত না। আমরা তখনো পর্যন্ত জানতাম সম্প্রচারের এক এবং অদ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে রেডিও। স্বপ্ন ছিল ছোটবেলা থেকে—কবে হবে আমার নিজের একটি রেডিও। টেপ রেকর্ডারের কথা তখনো ভাবতে শিখিনি।

যে কথা লিখছিলাম, সেটা ১৯৭৫ সাল-সবে কলেজে ঢুকেছি—থাকি ১৩ নম্বর হোস্টেলে। মনে অগাধ আনন্দ-বাঁধন ছাড়া পাখির মতো জীবন। ক্লাস করি, দিবারাত্র চুটিয়ে আড্ডা মারি, গল্প, আনন্দ, আড্ডা আর সর্বোপরি গান। তখন গান শোনার মাধ্যম ছিল রেডিও। হোস্টেলের কমন রুমে একটি রেডিও ছিল—অবকাশ পেলেই শুনতাম মান্না দে-র গান। তখন মান্না দে একের-পর-এক গান গেয়ে মন প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছেন। সিনেমার গান, আধুনিক গান-প্রতিটি গান যেন আমাদের বি ই কলেজের ছেলেদের মুখে মুখে। প্রচণ্ড আশা-যদি একবার মান্না দে-কে দেখার সৌভাগ্য হতো, জীবন হতো সার্থক। আচমকা সে সাধ পূর্ণ হলো—শুধু আমার নয়, গোটা বি ই কলেজের আর তার সঙ্গে আশে পাশের লোকেদের।

১৯৭৬ জানুয়ারীতে শুরু হলো রিইউনিয়ানের তোড়জোড়। ২৪ থেকে ২৬ পর্যন্ত তিন দিন ধরে চলবে বিরাট অনুষ্ঠান। লর্ডস মাঠে বিরাট প্যান্ডেল। প্রায় কয়েক হাজার লোক বসার মতো ব্যবস্থা। তিনভাগে প্যান্ডেলটা ভাগ করা—স্টেজ থেকে প্রথম দিকটা শিক্ষক ও অ্যালাম্‌নিদের। তারপরের অংশটুকু বর্তমান ছাত্রদের। আর শেষ অংশটুকু অশিক্ষক স্টাফদের। এত বড়ো আয়োজন আগে কখনো দেখিনি। রিইউনিয়ান মানে যেন উৎসব। সাধারণতঃ সন্ধ্যা থেকে অনুষ্ঠান চালু হতো আর সারারাত ব্যাপী চলার পর ভোরবেলা শেষ হতো।

প্রথম দুদিনের অনুষ্ঠানে কানাঘুষো শুনেছি মান্না দে আসতে পারেন। মন উত্তেজিত। কিন্তু তৃতীয় দিন মানে ২৬শে জানুয়ারী সকাল থেকে জোর গুজব যে মান্না দে আসছেন-ই। আগেই লিখেছি যে তখন মান্না দে-র স্বর্ণযুগ—উত্তমকুমারের কয়েকটি বিখ্যাত সিনেমা যেমন সন্ন্যাসী রাজা তার সঙ্গে মান্না দে-র গানের মূর্ছনা সবাইকে যেন পাগল করে দিয়েছিল। তখন সবার মুখে মুখে মান্না দের পুজোর গান, 'ও কেন এতো সুন্দরী হলো' বা 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে...' আমাদের মুখে মুখে সদা আসতো ঘুরে ফিরে। তখন যেহেতু টেপ রেকর্ডার বা টিভির যুগ তেমন ছিল না, গান শোনার একমাত্র উপায় ছিল রেডিও, নয়তো বিভিন্ন পূজা বা অনুষ্ঠানে বা GF (grand feast) তে বাজানো মাইক। মোদ্দা কথা—মান্না দে তখন আমাদের সবার হৃদয়ে। আর সেই মান্না দে কে চাক্ষুস দেখবো! মন উত্তেজিত। বিকাল থেকেই চারদিক থিকথিক করছে লোক। প্রথমে শুরু হলো পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষের শ্রুতি নাটক। তারপর নির্মলেন্দু চৌধুরী লোকসংগীতে আসর জমিয়ে দিলেন।

রাত এগারোটা নাগাদ শুরু হলো মান্না দে-র অনুষ্ঠান, পাড়ায় পাড়ায় খবর চলে গিয়েছে যে মান্না দে এসেছেন, ফলে দূরদুরান্ত থেকে থেকে লোকেরা এসেছে। একটা সময় এল সব কিছু যেন হাতের বাইরে চলে যাবে। বাধ্য হয়ে প্যান্ডেলের পিছন দিকের ত্রিপল খুলে ফেলতে হলো যাতে আমজনতা দেখতে পায়। এতে উত্তেজনা, লোকাল লোকেদের চেঁচামেচি কমলো। এদিকে মান্না দে তখন একের-পর-এক গেয়ে চলেছেন—সন্ন্যাসী রাজা, স্ত্রী, স্বয়ংসিদ্ধা, মেহবুবা, আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন সিনেমার বাছাই করা বাইশখানা গান গেয়ে যখন উঠলেন তখন রাত একটা বেজে গেছে। জনগণ খুশি, আনন্দে আত্মহারা, মাতোয়ারা। বাইশটা গানের পর কি আর অনুষ্ঠান জমে? কিন্তু এরপর এলেন হিমাংশু বিশ্বাস তাঁর বাঁশির মূর্ছনা নিয়ে। জনতার ভিড় তখন অনেক কমেছে, শান্ত,

ঠান্ডা প্যান্ডেল সুরের আবেশে জমে উঠল। যখন প্রোগ্রাম শেষ হলো তখন ভোর ছ-টা। মনের মধ্যে কিন্তু গুনগুন করছে সদ্য শোনা মান্না দে-র গান। একরাশ তৃপ্তি নিয়ে হোস্টেলে ফেরা।

মান্না দে-কে চোখে দেখার পর আমরা সবাই হয়ে পড়লাম মান্না দে-র অন্ধ ভক্ত। উঠতে বসতে সবার মুখে মান্না দে-র দু-কলি গান। মান্না দে তখন হয়ে উঠেছেন আমাদের সবার মান্নাদা। আমার তিন রুমমেটের একজন ছিল সুধীর। রাত জেগে আমাদের পড়ার অভ্যাস থাকলেও সুধীর রাত বারোটা বাজলে আর জেগে থাকতে পারত না। যখন ডিনার খাওয়ার পর আড্ডা মেরে রাত এগারোটায় পড়তে বসতাম—জটিল ক্যালকুলাসের অঙ্কে হিমসিম খেতাম—চাইতাম আরো পড়তে—কিন্তু রাত বারোটা বাজলেই সুধীর ''ভালোবাসার আগুন জ্বালাও, ঝাড়বাতিটা নিভিয়ে দাও" বলে লাইট অফ করে দিত। প্রথম প্রথম আমরা প্রতিবাদ করতাম, ''আরে সুধীর এটা কি করলি, আমাদের কিছুই তো পড়া হয়নি"। সুধীর তখন অন্ধকারে আরো একটা মান্নাদার গান ধরত, ''হুজুর বলে সেলাম করো, হুকুম আমার সবাই মানে..." আর কিছু বলা যেত না, যদিও মনোজ দু-একবার গাঁইগুঁই করে প্রতিবাদ করলে সুধীর আরো একটা মান্নাদা ধরত, ''শাওন রাতে যদি, স্বপনে পড়ে মনে..." আকাশের তারা, গঙ্গার মিঠে হাওয়া আর সুধীরের সুরেলা গলায় প্রতিবাদ তার ভাষা হারিয়ে ফেলত। এভাবে এক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে, এক ছন্দে জীবন প্রবাহিত হতে লাগল, বিশেষ করে রাতের ঘুম।

হোস্টেলে দুটো ঘর পরে থাকত নগেন্দ্র। নগেন্দ্রর একটি গুণ ছিলো—যে-কোনো জিনিস নিয়ে ও তর্ক করত আর তর্ক যখন জমে উঠত, ওর মুখ থেকে ফুট তিনেক দূর পর্যন্ত থুথু স্প্রে হতো। ফলে তর্কে ওর সাথে কেউ সুবিধা করতে পারত না। তো কেদিন জোর তর্ক চলছে—মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান হবে না ইস্টবেঙ্গল—নগেন্দ্র তখন জোর থুথু ছেটাতে শুরু করেছে, বিপক্ষ পিছু হঠছে—হঠাৎ সুধীর নগেন্দ্রকে আঙ্গুল দেখিয়ে গেয়ে উঠল, ''ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বল না।" নগেন্দ্র হতবাক, ''তুই আমায় চলে যেতে বললি?" সুধীর সদর্পে বলে উঠল, ''আমি গান গাইছি, কারুর ব্যাক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তুই করতে পারিস না।" নগেন্দ্রর মুখে ভাষা নেই—তর্কে এই প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল নগেন্দ্র। আমরা সবাই বলে উঠলাম, ''জয়, মান্নাদার জয়।"

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। সবাই বলা যায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে অবিরাম পড়ে যাচ্ছি। সারা বছর আড্ডা, ফাঁকি-এর থেকে বেরুতে হবে তো! সবচেয়ে ভোগাচ্ছে অঙ্ক। তখন স্যারেরা স্পেশাল ক্লাস নিতেন—নাম GST বা জেনারেল স্টুডেন্ট টিউটোরিয়াল—সেখানে কঠিন কঠিন অঙ্ক পেপার দিতেন আর বলতেন এগুলো থেকে পরীক্ষায় আসবে। চার-পাঁচ জন মিলে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করতাম। একদিন সেরকম এক দুরূহ অঙ্ক নিয়ে সবাই হিমসিম খাচ্ছি—ঝড়ের মতো এল অভিজিত—হাতে অঙ্কের শীট, মুখে মান্নাদার গান, ''আমি আগন্তুক, আমি বার্তা পেলাম, কঠিন অঙ্ক এক কষতে দিলাম..." একই অঙ্ক, অভিজিৎও আমাদের সাথে বসল। মান্নাদার গানেই হোক বা অভিজিতের অন্য দিক থেকে ভাবনার জন্যই হোক, অঙ্কটা নেমে গেল। আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠলাম, ''এই এতো আলো, এতো আকাশ, আগে দেখিনি...।"

পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল। প্রথম কটা পরীক্ষা ভালোভাবে উতরালেও ধাক্কা খেলাম কেমিস্ট্রির দিন। বিরাট বিরাট ফর্মূলা—মনে থাকে না—মনে রাখার জন্য আমরা অনেকেই সেট স্কোয়ারে পেনসিল দিয়ে লিখে নিয়ে যেতাম। এমনিতে বেঞ্চে সেট স্কোয়ার ফেলে রাখলে কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু খাতার ওপর ফেললে লেখা গুলো বোঝা যাবে। সেই দিন হলে গার্ড ছিলেন ইঁদুর স্যার। এমনিতে খুবই ভালো লোক কিন্তু তীক্ষ্ণ নজর। দুর্জনে বলতো ইঁদুরের নজর তো তীক্ষ্ণ হবেই! সুজিত সবে সেট স্কোয়ারটা খাতায় ফেলে কঠিন কিছু ফর্মূলা খাতায় টুকছে, এমন সময় ইঁদুর স্যার কোথা থেকে এসে ছোঁ মেরে ওর সেট স্কোয়ারটা তুলে নিলেন—সুজিত কিছু বোঝার আগেই। সুজিত করুণ মুখে ব্যাপারটা কি বুঝতে মুখ তুলতেই স্যার আচমকা গেয়ে উঠলেন, ''কাগজে লেখো নাম, সে নাম ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো নাম, সে নাম ক্ষয়ে যাবে, হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে।"—বলে সেট স্কোয়ারের লেখাগুলো সব মুছে দিলেন, বললেন ''হৃদয়ে লেখো ফর্মূলা, বুঝলে ছোকরা!" সুজিত করুণ মুখে বলল, ''হৃদয়ে কি আর ফর্মূলা লেখার জন্য স্যার?"

ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার পর সবে সেকেন্ড ইয়ারে পা দিয়েছি। মনে পড়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে হারানোর কথা নয়, প্রতি সপ্তাহে দু-তিন বার যাচ্ছি—কিন্তু সেদিন সবাই মিলে বোটানিক্যালের গেটের ঝুপড়ি থেকে মনিপুরি গাঁজা কিনেছিলাম আর সেটা নেওয়ার পর নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। বোটানিক্যালের বাগান মনে হচ্ছিল আফ্রিকার জঙ্গল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বেরবার কোনো রাস্তা পাচ্ছি না—হতাশ হয়ে সবাই গাছের তলার শুয়ে পড়েছি, এমন সময় সুধীর ধরলো মান্নাদার এক অমরগীতি, ''ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে, কি সঙ্গীত ভেসে আসে...।" খোলা আকাশের নীচে গঙ্গার মিষ্টি হাওয়াতে সে গান যে কি এক আশ্চর্য সুখানুভূতি দিয়োছিল—লিখে প্রকাশ করা যাবে না।

ঝড়ের মতো দিন কেটে যায় হোস্টেলে। পাঁচ বছর ছিলাম, পাঁচ বছরে যে কতবার মান্নাদার গান শুনেছি আর গেয়েছি—তার ইয়ত্তা নেই। মান্নাদার যে-গানই নতুন বেরোয়, সুপারহিট; আর আমরা ঘরে ঘরে সেই সব গানের কলি গুনগুন করি, ''গোরি তেরি পহেছানিয়া, জিন্দেগী, ইয়ারি হ্যায় তো" ইত্যাদি হিন্দির সঙ্গে, ''আমি যে জলসাঘরে, মানুষ খুন হলে পরে, অভিমানে চলে যেও না," কত আর নাম বলব!

মনে পড়ে একদিন কলেজের ক্লাসের পর বেরিয়েছি হোস্টেল যাব, দিনটা শুক্রবার, মনে তাই ফুর্তির আমেজ। সঙ্গে ছিল তন্ময়—আনন্দের চোটে গলা ছেড়ে গান ধরেছি, ''পাগলা গারদ কোথায় আছে, নেই বুঝি তা জানা, ঘোড়ার কি ডিম হয়, সেই

ডিমে কি হয় ছানা...ইত্যাদি" হঠাৎ পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় ডাক, ''এই যে ছোকরারা, খুব যে গান গাইছো, দাঁড়াও।''

কে না কে ডাকছে ভেবে আমরা পিছন ফিরে দেখি ঘোড়া আর পাগলা। ঘোড়া আমাদের ফিজিক্সের হেড ডিপ আর পাগলা ইলেকট্রিকালের। ওনাদের নাম অন্য কিছু কিন্তু গোটা কলেজে ওনাদের পরিচিতি ছিল ঘোড়া ও পাগলা নামে। যাই হোক, আমরা ভয় পেয়ে দাঁড়াতে পাগলা এগিয়ে এলেন হনহন করে, বললেন, ''বি ই কলেজ।''

আমরা আবাক হয়ে বললাম, ''তার মানে?''

পাগলা মৃদু হেসে বললেন, ''ওই যে জিজ্ঞাসা করছিলে পাগলাগারদ আর ঘোড়া কোথায় পাওয়া যায়, তাই বললাম বি ই কলেজ। তোমরা তো আমাদের পাগলা আরা ঘোড়াই বলো, তাই না?'' এই বলে আবার হনহন করে স্যার এগিয়ে চললেন, সঙ্গে ঘোড়া।

আগেই বলেছি আমাদের কলেজ জীবনে বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। অবসর পেলেই চলে যেতাম বি গার্ডেনে, যতটা না প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে তার চেয়ে অনেক বেশী নারী-দর্শনের আকাঙ্খায়। ছুটির পর বিকালের দিকে মাঝে মাঝে-ই চলে যেতাম যদি কারুর আমায় মনে ধরে এই প্রত্যাশায়। পাঁচ বছর যদিও ঘোরাটাই সার হয়েছে, ফল লাভ কিছুই হয়নি, আর তার সঙ্গে ভয়ও ছিল। তখন ওখানকার লোকাল মস্তান বা দাদা ছিলেন জোলো। কোনো কিছু যদি দাদার চোখে পড়ে তো শেষ। তাই অতি সন্তর্পণে আমাদের নারী-দর্শনের কাজ সারতে হতো।

সেদিন বি গার্ডেন যাব বলে গেটের কাছে এসেছি আমি আর গৌতম, বাস থেকে নামল দুই সুন্দরী। নীলবসনা শাড়ী, হাতে সুদৃশ্য ব্যাগ, কপালে ঝকঝক করছে সোনালী টিপ। দেখে অন্তর আর কোনো বাধা মানলো না, একটু জোরের সঙ্গেই বেরিয়ে এলো মান্নাদার গান, ''হয়তো তোমার জন্য, হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশায় হাত বাড়াই...''

সুন্দরী যুগল একটু ফিরে তাকাল মাত্র, তাতে অবজ্ঞাই ষোল আনা। প্রেমের কোনো লক্ষণই নেই, তারপর দুলকি চালে এগিয়ে চলল। সবে দুজনের পিছু নিতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছনে জামার কলারে হ্যাঁচকা টান। ঘুরে দেখি জোলো, দেখে চোখ মুখ শুকিয়ে গেল, বুকের ভিতর যেন ড্রাম পিটছে। জোলো চোখ লাল করে বলল, ''খুব যে হুক্কা তুলছিলি মেয়ে দেখে, মারব এক ঘুষি, পেট ফেটে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।''

আমি ভয়ে কাঁপছি, গৌতম কিন্তু একটুকুও ঘাবড়ালো না, মিষ্টি নরম সুরে বলল, ''জোলোদা, কাউকে দেখে নয়, এমনিই একটু মান্না দে-র গান ধরেছিলো, মান্না দে-র ভক্ত কিনা! তাই বসন্ত কালের ফুরফুরে হাওয়াতে একটু গান করে ফেলেছে। আপনি বলুন, মান্না দে-র গান গাওয়া, বিশেষ করে এই বসন্তর দিনে, সে কি অন্যায় দাদা?''

জোলো একটু যেন নরম হলো, বলল, ''খুব নকসা মারতে শিখেছিস না, জানিস আমি মান্নাদার ভক্ত, তাই ভাবছিস মান্নাদার নামে পার পেয়ে যাবি? কেন, সে আমার ছোট বোন, আদরের ছোট বোন গান বেরুলো না? মারব এক ঘুষি!''

জোলো দেখলাম অনেক নরম হয়েছে মান্নাদার নামে, তাই সুযোগ পেয়ে বললাম, ''সরি জোলোদা, ভুল হয়ে গিয়েছে, আর গাইব না, আর গাওয়ার ইচ্ছা হলে শ্যামাসংগীত ছাড়া আর কিছু নয়।''

জোলো বলল, ''ভালো, বুঝতে পারলেই ভালো, বিক কলেজের ছেলে কিনা, নাহলে মান্নাদার একটা গান আছে না—কি বলে—মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করে...। আমায় সেই খুন করেই বিচার করতে হবে। যা ভাগ, আর যেন মেয়েদের পিছনে না দেখি...''

মুখ শুকনো করে ফিরে এলাম ''সবাই তো সুখী হতে চায়, কেউ হয়, কেউ হয় না'' গাইতে গাইতে।

এইভাবে মান্না দা-র গান আর পড়াশুনো, গল্পে আড্ডায় কিভাবে যেন চলে গেল পাঁচটা বছর। ১৯৮০ সালের জুন মাসে ছাড়তে হলো হোস্টেল—আমরা যে ফাইন্যাল দিয়ে দিয়েছি। কদিন পর রেজাল্ট বেরবে আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জীবন সমুদ্রে ঝাঁপ দেব—কিন্তু আনন্দর বদলে চোখ অশ্রুসজল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিলাম বন্ধুদের থেকে, ''আবার হবে গো দেখা, এ দেখা শেষ দেখা নয় গো...''

বিদায় তো নিলাম, কিন্তু কিছুদিন নিয়মিত দেখা সাক্ষাতের পর দেখা গেল আবার যেন মান্নাদার গানই সত্য হয়ে উঠছে—''আমি তার ঠিকানা রাখি নি, ছবিও আঁকিনি...'' সত্যি আস্তে আস্তে অতি প্রিয় দু-চারজন ছাড়া সবাই যেন কোথায় হারিয়ে যেতে লাগল। প্রথমদিকে রিইউনিয়ানে যেতাম, দেখা হতো বন্ধুদের সঙ্গে—''আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল, কত সুর কত গান মনে পড়ে গেল, বল, ভালো আছো তো?'' বেরবার সময় ভারাক্রান্ত মনে বলতাম, ''কথা দাও আবার আসবে...''

ক্রমে দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগও কমে আসে। শুধু মান্নাদার গান মনে ভেসে ওঠে, প্রতিটি গানের প্রতিটি ছত্র যেন সত্যি হয়ে জীবনে ফুটে উঠছে। ক্রমে রইলাম আমি—একক আর মান্নাদার গান।

মান্নাদাকে দেখার সুযোগ আবার এল অনেক বছর পর — সেটা বোধহয় ২০০৪, মান্নাদার ৮৫তম জন্মদিনে দিল্লিতে বিজনদার সৌজন্যে একটা গানের আসরে। ওই বয়সেও কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর। যাকে বলে ''পাগল তোমার জন্য যে''।

প্রথম যেদিন দেশের মাটি ছাড়লাম—বুকের ভিতর যেন এক অব্যক্ত বেদনা, এক জ্বালা, অন্তর গেয়ে উঠল, ''ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো'' চোখ হয়ে উঠল অশ্রুসজল।

মান্নাদা, আজও প্রতিটি ক্ষণে তোমায় অনুভব করি। তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পার না, তুমি আমাদের মাঝেই বেঁচে আছ ও থাকবে অমর হয়ে, ''আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, নিশুতি রাত যেমন কাঁদে...''।

অচেনা চার্লি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চার্লি চ্যাপলিন (1889-1977)। কে না চেনে? বড় হলে পাগলা দাশু নির্ঘাত চার্লির মতো হতো (ভালো করে ইংরিজি শিখবে বলে দাশু একবার বেঢপ কোট-প্যান্ট পরে ইশ্‌কুলে এসেছিল—মনে আছে নিশ্চয়ই?)। স্বভাবেও দুজনে একই রকম। লোকের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। গা-জোয়ারি চালিয়াতি বড়মানুষি একদম সইতে পারে না। বরং তেমন লোকদের নাকাল করেই আনন্দ।

কিন্তু চালি কি শুধুই হাসির রাজা? লরেল-হার্ডির সঙ্গে কোথাও তাঁর একটা তফাত থাকেই। শুধুই দমফাটা ফুর্তি নয়। হাসি-কান্নার রামধনুও তাঁর ছবিতে দেখা যায়। জীবনে যে-সব খারাপ জিনিস থাকে, সেগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেননি চার্লি। বরং সবকিছুই তুলে ধরেছেন করুণভাবে। তবু ছোটো মাপের মানুষজনের ওপর তাঁর আস্থা থাকে অটুট।

যে-চরিত্রে অভিনয় করে তিনি তামাম দুনিয়ার হৃদয় জয় করেছিলেন, সেও তো ছিল ছোটো মাপের মানুষ। বেকার, ভবঘুরে, চালচুলো নেই, বিশেষ কোনো গুণও নেই। তবে মনটা ভালো। নিজের কথা খুব একটা ভাবে না, পরের ভালো করার চেষ্টা করে। সাধ্য অবশ্য খুবই কম। ঘা খায়ও প্রচুর। ফিরে পাল্‌টা মার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে-চেষ্টাও করে না। তবু মত বা মন কোনোটাই পাল্‌টায় না। আর — কী আশ্চর্য! শেষ অবধি সে-ই কিনা জেতে!

এ রকম একটা চরিত্র চার্লি ভাবতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন ছোটো মাপের মানুষ। জ্ঞান বা ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু হৃদয়টা ছিল ঠিক জায়গায় আর বুদ্ধিটা ছিল সাফ। এই দুটো মিললে যে মানুষ তৈরি হয়, চার্লি ছিলেন তা-ই। লম্বায় খাটো হলে কী হবে, আসল মাপে হিমালয়ের মতো উঁচু।

চার্লির জীবন আর চার্লির কাজ — দুটো আলাদা ব্যাপার নয়। খুবই গরিব অবস্থায় কেটেছিল তাঁর ছোটোবেলা। বাবা তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনাহারে অপুষ্টিতে দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মা-র! বহু চিকিৎসা হয়েছিল, তবু সেরে ওঠেন নি। লেখাপড়া ছেড়ে চার্লিকে ঘুরতে হয়েছিল নানা নাট্য কোম্পানি-র সঙ্গে, ইংল্যান্ডের মফস্বলে! হঠাৎ ডাক পেয়ে গেলেন সিনেমায়। তার কিছুদিন পর থেকেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু।

ইংরেজ লেখক সমারসেট মম একবার লিখেছিলেন, ছেলেবেলার জীবন সম্পর্কে চার্লি-র একটা ফেলে-আসার বেদনা আছে। ধারণাটা একেবারেই ভুল। মম-কে চার্লি তাই বলেছিলেন, আপনার কোনো উপন্যাসের চরিত্রের বেলায় এই ভুলটা করবেন না। গরিবের ছেলে তার দুরবস্থা জয় করতে চায়, সুখের মুখ দেখতে চায় — তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় না। খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, খানিকটা জ্ঞানীগুণী লোকদের সঙ্গে মিশে তিনি বুঝেছিলেন: সমাজ ও রাষ্ট্রের খোল-নলচে না পাল্‌টালে গরিব মানুষের হাল ফিরবে না।

সব ধরণের অত্যাচার আর শোষণের বিরোধী ছিলেন চালি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর সহানুভূতি ছিল অগাধ। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল-এর চেলা চামুণ্ডারা একবার বলেছিল, গান্ধী অনশন করুক আর না করুক, ওকে জেলে পুরে রাখা দরকার। আমরা যদি শক্ত না হই, তবে ভারতকে হারাতে হবে। — উত্তরে চার্লি বলেছিলেন, 'যদি জেলে পুরে রাখলে কাজ হতো, তবে সমাধান ছিল খুবই সহজ। কিন্তু এক গান্ধীকে জেলে পুরলে আর-এক গান্ধী জাগবে। ভারতীয় জনগণ যা চান গান্ধী তারই প্রতীক। তাঁরা যা চান তা যতদিন না পাচ্ছেন, ততদিন একের পর এক গান্ধী তৈরি হবে।'

মডার্ন টাইমস্ ছবিতে চার্লি দেখিয়েছিলেন, পুঁজিপতিদের লোভ মানুষকে কেমন ভেড়ার পাল করে ছেড়ে দেয়। মুনাফার তাড়নায় প্রতিটি শ্রমিককে করে তোলে যন্ত্র। আর *দ গ্রেট ডিক্‌টেটর* ছবিতে সরাসরি বিদ্রূপ করা হলো জার্মানি ও ইতালির দুই একনায়ক, হিটলার আর মুসোলিনিকে। বিশ্বপতি হওয়ার খোয়াব দেখছে হিটলার — খেলা করছে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা বেলুন নিয়ে। হঠাৎ সেটা ফেটে গেল! এমন একটা দৃশ্য দশ হাজার বক্তৃতার বাড়া।

এতেই চার্লির কাল হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে। 'কমরেড' বলে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম ভাষণ! তাঁর বিরুদ্ধে এক এক করে জড়ো হলো ধর্মান্ধ ক্যাথলিক, নাৎসি, ফ্যাসিবাদী, শেষে খোদ মার্কিন সরকার। *মঁসিয় ভেরদু* মুক্তি পাওয়ার সময়ে ফেস্টুন নিয়ে পিকেট করল তার বিরোধীরা। *লাইম লাইট* শুরু হওয়ার দিন তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল বাঁধাকপি আর টমাটো। 'অ-মার্কিনি কার্যকলাপে'র অভিযোগ তাঁকে নিয়ে তদন্ত করল মার্কিন সিনেট-এর এক কমিটি (এই কমিটির সভাপতিই পরে তহবিল তছরুপের দায়ে কয়েদ খেটেছিলেন)! একটা মিথ্যে মামলায় জড়ানো হলো চার্লিকে।

তাঁর পেছনে ফেউ-এর মতো লেগে থাকল মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর (এফ বি আই)। তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথার হদিশ রাখত তারা। তাঁর নামে যে-ফাইলটা খোলা হয়েছিল তার পাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 1900! এর জ্বালায় শেষে আমেরিকা ছাড়তে হলো চার্লিকে। বাকি জীবন কাটল সুইট্সারল্যান্ডে।

তবু কোনো আপস করেননি চার্লি। বরাবর জোর গলায় বলে গেছেন:

> আমার সবচেয়ে বড় পাপ হয়েছিল, এবং এখনও তা এই যে, আমি কোনো বাঁধা মতের তাঁবেদার নই (নন্-কনফর্মিস্ট)। যদিও আমি কমিউনিস্ট নই, তবুও তাদের ঘৃণা করার সারিতে দাঁড়াতে আমি গররাজি হয়েছিলুম।

চাঁচাছোলা ভাষায় অপ্রিয় সত্য বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না। চার্লির ছিল। হলিউড ছেড়ে যাওয়ার অনেক আগেই (1947) তিনি বলেছিলেন:

> আমি, চার্লি চ্যাপলিন ঘোষণা করছি যে হলিউড মরে যাচ্ছে। যে চলচ্চিত্রকে শিল্প বলা হয়, তার সঙ্গে হলিউড-এর আর কোনো সম্পর্ক নেই। হলিউড শুধু মাইলের পর মাইল সেলুলয়েড উগরে যাচ্ছে। একথা বলতে পারি যে, সকলের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে যদি কেউ শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র তৈরির চেষ্টা করেন, যদি কেউ চলচ্চিত্রের বড় ব্যবসার সতর্কবাণী না শুনে দুঃসাহসের পরিচয় দেন, তবে তাঁর পক্ষে সফল হওয়া অসম্ভব।

এই চার্লি, বিদ্রোহী চার্লি — এর কথা লোকে বেশি জানে না। অথচ তিনি এ যুগের সব সেরা শিল্পীদের একজন, সেরা মানুষদের একজন।

ঊনতিরিশ বছর বয়েসে, তাঁর বান্ধবী হেটি কেলি-কে একটি চিঠিতে চার্লি যা লিখেছিলেন সেই কথাগুলি দিয়েই এই লেখায় দাঁড়ি টানা যাক:

> তোমার মনে আছে হেটি, একদিন তোমায় বলেছিলুম যে টাকা আর সাফল্যটাই সব নয়। দু'টোর কোনোটার সম্বন্ধেই তখন আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু ঐ কথাই আমার মনে হয়েছিল। দুটোর অভিজ্ঞতাই এখন আমার হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি সুখের সন্ধান শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যে আর অন্যদের মঙ্গলের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এই ছিল আমরণ চার্লির জীবনদর্শন। যে-কোনো সৎ মানুষের জীবনদর্শন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও অধ্যয়ন

স্বপন দত্ত

''জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ ক'রে তাতে সকলের সমান অধিকার।..... তাই গ্রন্থাকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগৎকে তাঁরা মহাঋণ পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।''

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশ্ববরেণ্য বাঙালী বিজ্ঞানসাধক ও বাংলাদেশে শিল্পস্থাপনার ভগীরথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। পেটেন্ট-সংস্কৃতির যুগে তাঁর উচ্চারণ—''ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মাণী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি।''

আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রথম দুই চরিত্রের নাম জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। দুজনেই ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তাঁদের প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর প্রমুখ। জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মেনে নিজের গবেষণাকর্মকে প্রকাশ করেছেন। এদিকে ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা, গবেষণা ও শিল্প-পরিকাঠামো প্রসারে অনন্য কৃতিত্ব রয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনি মনে করতেন, 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে না।' কাজেই, তিনি এক ভিন্ন চোখে ভারতীয় বিজ্ঞান কাঠামোর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।

১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করলেন 'মারকিউরাস নাইট্রাইট', যা ভারতীয় রসায়নের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এছাড়াও, দেশি ও বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত শতাধিক গবেষণাপত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কাজগুলি শতাব্দী পার হলেও আজও সমান মূল্যবান ও সমকালীন মানদণ্ডে অতুলনীয়। সাঙ্গে রসায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চমানের প্রশংসিত আরও কত গবেষণার কাজ। এক কথায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানাচার্য স্যার পি. সি. রায় ছিলেন আধুনিক রসায়নের মৌলিক গবেষণার পথিকৃৎ। অথচ শতবর্ষের আগের পরীক্ষাগারে না ছিল আধুনিক যন্ত্রপাতি, না ছিল আধুনিক উদ্ভাবন পদ্ধতি আর সুযোগ-সুবিধা। এ হেন স্বল্প পরিসরে যৎসামান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে প্রেসিডেন্সির ল্যাবরেটরিতে প্রফুল্লচন্দ্রের এইসব উচ্চমানের গবেষণা বর্তমান গবেষকদের কাছে অকল্পনীয়।

বিজ্ঞানচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট খুলনা জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে। পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন ধনবান, শিক্ষক ও উদার চরিত্রের মানুষ। মাতা ভুবনমোহিনীও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হন। ১৮৮২ সালে কলেজের পড়ার শেষে অপরিসীম অধ্যবসায়ে তিনি 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' লাভ করেন। সেই অর্থে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

দেশে ফিরে এসে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ অধ্যাপক। যেমন সুন্দর তিনি পড়াতেন, তেমন সহজেই ছাত্রদের আপন করে নিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, ''তিনি ছিলেন বিশেষভাবে ছাত্র বৎসল—তবে গুণেরই কদর ছিল তাঁর কাছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও ছাত্ররা তাঁর কাছে গবেষণা করার সুযোগ পেত এবং যদি তিনি দেখতেন, তারা তাতে অসুলভ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তবে অনেক সময় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতেন। তাদেরও নানাভাবে সাহায্য করে যেতেন।'' শুধু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ছাত্ররা নন, পরোক্ষ ছাত্রদলে পড়েন স্বনামধন্য শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, যিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে 'কিমিয়া বিজ্ঞানের পিতামহ' বলেন সম্বোধন করেছিলেন। শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে লিখেছিলেন ধ্রুপদী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস'। সেই গ্রন্থে তিনি দেখান, কায়িক শ্রম বৌদ্ধিক শ্রমের কাছে কেমন অবহেলিত হচ্ছে। অথচ এই দুই শ্রমসংস্কৃতির সার্থক সম্মিলন ছাড়া কোনও দেশের বিজ্ঞানন ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। যে দর্শনজাত ভাবনায় জারিত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, বলা যায়, ছাত্রদের মধ্যেও তা সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পড়াবার অবসরে চলত তাঁর গবেষণা।

ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'সি. আই.ই' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মান জানান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধুমাত্র বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং সফল ও ছাত্রবৎসল শিক্ষকই ছিলেন না; তিনি ছিলেন দার্শনিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, স্বদেশভক্ত, শিল্পোদ্যোগী, দেশসেবক, ভারতীয় কৃষ্টির প্রচারক। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়—বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সাফল্যের পেছনে ছিল তাঁর সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা, মিতব্যয়িতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, উদার মনন আর সর্বোপরি তীব্র জ্ঞানপিপাসা।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ তিরাশি বছরের জীবনে গবেষণা ও শিল্পস্থাপনার বাইরেও প্রচুর লেখালেখি করেছেন। সত্যি বলতে কী, সার্থক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তালিকায় অত সংখ্যক লেখা আর কারও বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানেও জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধনীরা সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি আমাদের দেশের লজ্জাজনক চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর কথায়—''যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়বার ইচ্ছে আছে তার কেনবার পয়সা জোটে না।'' আরেক শ্রেণির ক্ষেত্রে তাঁর খেদোক্তি—''বাঙালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিনবে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়।'' অন্য একটি বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। এখানে ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুকের বাইরে বই পড়ার একান্তই অনীহা। সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসা নেই। পরীক্ষা পাশই বরাবরের লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য—''প্রায় কোনো গভীর চিন্তাপ্রত ফল হয়নি এই লেখাপড়ায়; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।'' তাঁর ভাবনায়, এসব কিছুর সমাধান হল পাঠাগার স্থাপন, তবে সেখানকার সমস্যাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি দেখেছেন—দেশে একে তো লাইব্রেরির অভাব, অন্যদিকে লাইব্রেরি যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িকপত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ—''সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কী গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হয়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মসগুল হয়ে থাকেন।'' বর্তমান বঙ্গের পটভূমিকায়ও এ ছবি সমান প্রাসঙ্গিক নয় কি!

একটি পাঠাগারে কেমন বই থাকলে ভাল হয়, এ বিষয়েও প্রফুল্লচন্দ্র অভিমত দিয়েছেন। নির্বাচিত উপন্যাস থাকা দরকার, যা খুশি নয়। আর থাকা চাই—''মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক।''

তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন গবেষণার কাজে ছাত্রদের উদ্যমের অভাব দেখে। তাঁর মন্তব্য—''যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ল্যাবোরেটরীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার।'' তিনি দেখেছেন, বিশেষভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন করবার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যেই নেই; দু-একজনের মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

তবে তিনি সবচেয়ে শ্লেষাত্মক 'বিশেষজ্ঞ'দের ব্যাপারে। তাঁর দৃষ্টিতে, এঁরা নিজেদের বিষয়ের বাইরে কিছু জানেন না। তাঁর মন্তব্য—''ঘোড়া যেমন চলে তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে চালান, দুনিয়ার আর কোন দিকে চেয়ে দেখেন না। দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন রসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল।'' অবশ্য এর দায় তিনি চাপিয়েছেন তাঁদের ওপর, যাঁরা স্কুল-কলেজের পাঠক্রম তৈরি করেন।

সবশেষে আসা যাক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সেই দর্শনে, যার জন্য বাঙালী তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। তিনিই বাঙালিকে পরামর্শ দেন অর্থাগমের নতুন পথ খুলতে বলেন—''আমরা কি পাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না? লেখাপড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না?'' এর দিশাও তিনি দেখিয়েছেন—''উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকিল, ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেকে না।....এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিতে হবে।'' নইলে তা কেবল 'শিক্ষার অপব্যবহার'-ই হয়ে উঠবে।

এ-কথা নিজেই তিনি কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামে কলকাতায় একটি বিখ্যাত রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যা আজও বিদ্যমান। মনেপ্রাণে স্বদেশের হিতসাধনে তিনি আজীবন আত্মনিয়োগ করেছেন। 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি' তাঁরই হাতে গড়ে ওঠা। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিজ্ঞান গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন।

১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই এই নিরলস কর্মবীর আমাদের ছেড়ে অমরলোকে যাত্রা করেন।

Remembering General VO Nguyen Giap And Dien Bien Phu

Pathik Mitra*

Few battles have had more influence on events of the past half-century or been studied more than Dien Bien Phu — which ended 50 years ago this week. The fall of the French garrison at Dien Bien Phu on May 7, 1954, was a landmark in the history of decolonisation of South-East Asia. It was a battle that changed the political face of the world and set the scene for America's Vietnam War.

Never before had a modern, well-equipped Western army been so decisively defeated by poorly supplied guerilla troops who lacked nearly all advantages of advanced weaponry and other modern technologies that the French relied on to maintain their military predominance.

For 56 days in early 1954, this tranquil valley was the scene of a battle that transfixed, then changed the world. Lured to the area in the hope of staunching communist infiltration of neighbouring Laos, and of drawing Ho Chi Minh's elusive Vietminh guerillas into a decisive conventional battle, France fell into a deadly trap. (Vietminh was the name then commonly used for the communist party dominated by Vietnamese Independence League). Today, at first sight there is little to identify the vast natural amphitheatre ringed by low-lying hills as the brutal stage where the death knell was sounded for French colonialism in Asia — and where the prelude was written to the humiliation of world's greatest military power.

"In France, when the news came, the whole nation went into mourning. All theatres and cinemas were shut. The Berlioz Requem and other solemn music were played all day on the radio. The same day in Geneva, they started to discuss the future of Indo-China." — Peter Macdonald, "Giap: The Victor in Vietnam".

It was a brilliant victory for General Vo Nguyen Giap, commander of the Vietminh armies and now in his 90s. And the magnitude of the French defeat brought to an abrupt end, a nine- year effort to retain their Asian colonies by sheer brute force against the Vietnamese nationalists battling for independence in the First Indochina War.

And even more fatefully, it led directly to the disastrously destructive 20-year phase of US aggression to stem the tide of communism in Vietnam, the Second Indochina War.

That second effort ultimately proved as unsuccessful as the French war — and for much the same reasons: persistent underestimation of the Vietnamese nationalists under the leadership of Ho Chi Minh's communist party, their capabilities and determination; naïve trust in superior technology as the ultimate arbiter; the constant failures to comprehend the mind of the enemy. (Do we see the forebodings of Iraq and Afghanistan there?)

How did it come about? Most historians believe Giap's decision to change tactics early in the campaign — abandoning plans for a swift attack in favour of slowly tightening the noose around his adversary and severing their supply lines as a series of set piece attacks were launched — was the most important factor in the Vietnamese success.

"That was his decision and that was the key. If he had stuck to the original plan and attacked while the French were strong, it could well have ended in defeat", says Le Van Lan, a professor of history at Hanoi University. Le was 18 years old and living in Hanoi under French rule at the time of Dien Bien Phu. He had three brothers who fought with the Vietminh. Two were killed and third was captured and imprisoned. He says the victory that stunned France and the Western world came as no surprise to ordinary Vietnamese.

"Most of their soldiers were just mercenaries — Algerians, Moroccans, even Germans. The French were arrogant and looked down on our people. They did not understand that the will of our people to be independent was an irresistible force."

*** Compiled it in 2004, 50 yrs of Dien Bien Phu victory**

At Christmas in 1952, Le remembers watching a drunken German soldier — one of many veterans of Hitler's Wehrmarcht who signed up with the French in Indochina — staggering through a red light district near his home weeping as he sang Silent Night. "I knew then these men could not defeat us and that it was only a matter of time before we would be liberated," he said. "Why did the French come back to Vietnam after World War II? They were defeated in the war and they were liberated, but they could not consider our right to be liberated."

"De Gaulle and his generals dreamed of recovering their empire, They thought that the Vietnamese could be easily conquered again because we were poor and illiterate, and we had just been through a terrible famine, in which two million people died. But the French made a fatal mistake."

Nong Van Khau, one of the most decorated Vietnamese survivors of the battle, was a 22-year old platoon commander when he joined to fight at Dien Bien Phu with the Vietminh's 316 Division.

"The French fought hard, but day after day we broke their spirit", he says. "Our army came from the people, and we were fighting for our country. We had nothing to lose and everything to gain. Ho Chi Minh told us it was better to fight and die than to live as slaves, and we were ready to fight to the last man."

Nong, who eventually rose to the rank of colonel, took part in the attack on the final French stronghold of Hill A1. "After we captured a French officer, we discovered there was a big bunker system dug deep inside the hill. So we dug for 23 days to get to the edge of their bunkers. We placed 1000 kilograms of explosives inside the tunnel, then we surrounded the hill to stop anyone escaping. Once we blew the hill, that was the end of it", says Nong, who was seriously wounded in the assault on May 6.

The fighting in Vietnam had reached a stalemate in 1953, with the French controlling much of the south and the Red River Delta around Hanoi, but the Vietminh dominating the mountainous interior in the north, with neither side able to reduce the other's base areas. The lightly armed highly mobile Vietminh guerrilla forces were very cautious in main-force attacks on French strongholds.

But in mid-1953 general Henri Navarre, newly appointed French commander for Indochina, decided to occupy the valley surrounding the tiny village of Dien Bien Phu, deep in the mountains of Northwestern Vietnam near the border with Laos, about 300 km from Hanoi, to prevent Vietminh movement into newly independent Laos and to use it as a base for offensive operations into the mountainous northwest. The French commander in Dien Bien Phu was Colonel Christian de Castries.

This enabled Giap to capture a rare chance to prevail in a main-force battle in a situation geographically favourable for his guerilla forces. But for that he had to overcome enormous logistical problems to move four of his experienced divisions, along with their ammunition and supplies, along hidden, mountainous jungle tracks — including dismantled artillery pieces being brought in from China. Giap said later: our troops razed hills, cut roads into the mountainsides and open roads for the artillery ….. hundreds of thousands of dan cong (civilian porters), women as well as men, surmounted perils and difficulties." A secret weapon was the use of thousands of bicycles, specially adopted to carry 250 kg of supplies.

The French did not believe it could be done — and by the time they realized it had been, they were caught in a trap of their own making.

The battle developed through three distinct stages. The first began quietly with the French occupation of the valley in November 1953, after paratroops landed to secure the airstrip and enable aircraft to fly in 5000 troops, their equipment and tanks over the weeks following.

Navarre initially expected no serious resistance. Even when he became aware that Giap was mustering substantial forces, he was still confident that if the Vietminh tried to attack in strength the French would be able to destroy them and then assail the Vietminh from the rear in their mountain heartland.

In the second stage, between December and March the gradual build up of large Vietminh forces resulted in a siege of Dien Bien Phu that had the effect of closing the trap, leaving the French no possibility of withdrawal. That

compelled them to increase their forces to more than 15,000 men and strengthen their fortress in anticipation of mainforce battle. Navarre was still sure he could win, despite the increasingly obvious disadvantages of the location, with its long supply lines and soggy terrain.

Finally, Giap "switched from siege to assault" on March 13, the start of 56 days of fierce fighting and entirely unexpected Vietminh artillery bombardments from well-camouflaged gun emplacements in the surrounding hills, which wreaked havoc on the airstrips and French strongholds. In addition to the advantage in troop numbers, Giap's troops were building an amazing network of trenches and interconnecting tunnels around the main fortress, several hundred kilometers in total, which brought them in places to within few meters of French dugouts.

When it began clear in April that the garrison was in dire peril, the French government made inquiries in Washington about the possibilities of air strikes on the Vietminh forces from two US aircraft carriers stationed in the Gulf of Tonkin. Admiral Arthur Radford the chairman of the US joint chiefs of staff, who feared loss of all South-East Asia to communism, even suggested the use of tactical nuclear weapons. But President Dwight Eisenhower ruled out direct US involvement.

The final assault on the French positions began on May 1 and within a week they were overrun. The French had no choice but to surrender unconditionally. By then they had lost more than 7000 men killed and 20,000 wounded, while more than 6000 prisoners were taken during the fighting. Another 11,000 or so were taken prisoner after the fall. Vietminh losses were estimated at roughly 8000 killed and 15,000 wounded.

The French troops fought bravely and tenaciously right until the end. But so did the Vietnamese soldiers, very much as they later did against the Americans after 1964.

It was the strategy and tactics of the two commanders, Giap and Navarre, that primarily determined the course of the battle and its outcome. Giap's approach was cautious and patient, Navarre's almost the opposite. "If we wanted to win swiftly" wrote Giap later, "success would not be assured. So we resolutely chose to strike and advance surely .... and strike to win only where success is certain. If it is not, then do not strike." Navarre from his air-conditioned headquarters in distant Saigon, knowing little about the conditions of jungle warfare, relied far too much on European strategic principles imbibed in French war colleges, and too little on the information about Vietminh capacities coming from his own intelligence in the field.

The political consequences of the disaster were immediate and far-reaching. A conference in Geneva of the major powers, the Soviet Union, US, Britain, France - and also the communist China, for the first time — had previously been planned for May 8, the day after the fall of Dien Bien Phu, as fate had it, to work out a political settlement to Korea and Indochina war.

In Paris, the French were almost desperate after the defeat at Dien Bien Phu to find an acceptable formula to end the fighting. The shaky Laniel government had already been hovering on the brink of collapse because of its inability to win the war or negotiate a political settlement in Vietnam. A long time critic of the war in Indochina, Pierre Mendes-France, waiting in the wings and steadily gaining support in the National Assembly for a policy of negotiations. He became prime minister when Laniel government fell a few weeks after the Dien Bien Phu surrender, promising to reach an agreement within a month or resign.

After tough negotiations he succeeded at the 11th hour, on the basis of an agreement to partition Vietnam at the 17th parallel between the communist dominated north and the "pro-French, anticommunist" south. Within two years, Ho Chi Minh was in power in Hanoi. Also, both Laos and Cambodia were freed of French rule, and both eventually became communist states. The partition of Vietnam was supposed to be temporary, subject to nationwide elections within two years, but US backing of a new southern leader, Ngo Dinh Diem, ensured that the elections never took place.

The result was to be a further 20 years of war before the Americans finally gave up the fighting entirely. Giap's forces swept south victoriously in 1975 to reunite Vietnam under communist flag.

শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ

মৌমিতা বাসু (দশম শ্রেণী)

সঙ্গীতা পাল (পঞ্চম শ্রেণী)

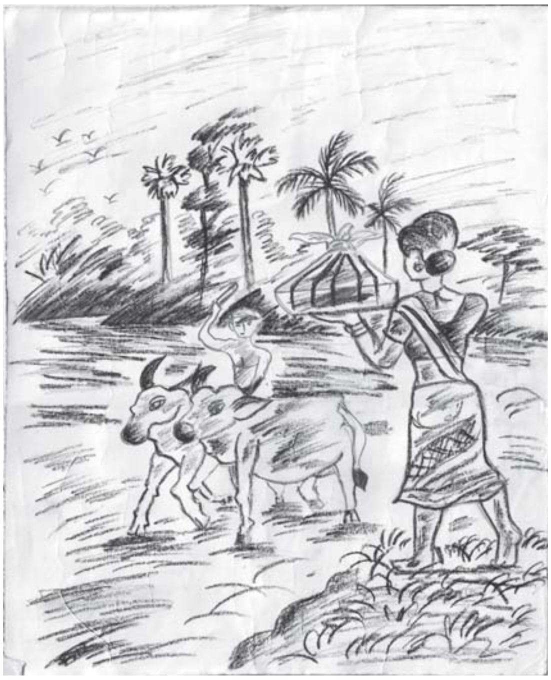

অনন্যা কর (পঞ্চম শ্রেণী)

রোহক পাল (দ্বিতীয় শ্রেণী)

হলুদ বৃষ্টি

অনুপম দাশশর্মা

কৈফিয়ৎ নয়, জিজ্ঞাসার দরবারেও নয় হেঁটমুন্ড
অকৃতদার শব্দ জানে দায় তার সর্বত্রগামী
জীবন কোলাজে ওঠানামার সচ্ছল সিঁড়িগুলো
বিভক্ত হয় না সব বিভক্তিতে,
তবু হেঁটে যেতে হবে সরু সুতোর টালমাটাল
সমাজ শৃঙ্খলে।

কুয়াশার স্তর ভেঙ্গে আলোর ফোটনকণা উদ্ভিন্ন
চেতনায় বাসা বাঁধে
ফোটে না যাঁদের চোখে প্রত্যাশার ফুল
তাঁদের ঘরে ঘরে পৌঁছতে হবেই লড়াইয়ের ওম।

অপছন্দের দৃষ্টিতে হতেই পারে
সবই শব্দের অপভ্রংশ, পছন্দের বাক্য কারোর
'না-কবিতা'...

অবাধ্য উৎসাহ হেঁটে যাবেই হলুদ বৃষ্টিতেও।

বাঁক ফেরা

দীপায়ন নন্দী

যে হাঁটে, যে একলা হাঁটে
সে জানে, সে-ই জানে
ভুলের কোনো মাসুল নেই
ঋণের কোনো উসুল নেই
সে সুখী, সে-ই সুখী

সে সুখী! সে অতলান্ত দুখী
উদাস তার অবগাহন
বিসর্জনেই তার আবাহন
সে কাঁদে, সে পোড়ে
একটা পিছুটানের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ঘোরে

সে হাঁটে
পাগল বেদুইনের মতো হাঁটে
দুঃখ সুখের নিক্তি মেপে
আঁক কষে, বাঁক ফেরে
আবার একটা শুরুর ইচ্ছে তীব্র ঝাঁকি মারে
বাঁক ফেরে, ফের ভোরে.....

আনমনে গান

দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী

ক

প্রায় বিলুপ্ত এই বংশের ছায়াপুরুষেরা
বাজ-এ আধপোড়া পেয়ারা গাছটা ধরে
দোল খায়...
যদি কোন মধুবালা বা ওয়াহিদা ভুলবশতঃ ও বলে ওঠে 'ভালোবাসি'
হয়তো বা জল পাবে
এই কোঠাবাড়ি দরদালান এতগুলো অশরীরী পুরুষ...
ভিটের এক কোণে পদ্মিনী কুলনারী, এবংশেরই
কোন এক পুরাকালে, জপের আসনে যার
ভুরু-যুগলের তলে ঝলসে উঠে মিলিয়ে যেত
রাধা-শ্যাম ঝুলনদোলায়,
ভিজে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়
কায়াহীন পূর্বজদের পায়ু-সঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখে...
ঠাকুরদাদা পেয়ারা খান...
আনমনে...
পেয়ারা খান...

খ

এভাবেই ...
তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে...
এ ওর হাত ধরে চলে যায়...
প্রাচীন লাল ইস্কুলবাড়িটার মাথায়
আশ্বিনের শেষ বিকেল ছুঁয়ে
প্রাথমিকের কৃষ্ণাদির কণ্ঠে - বাদল মেঘে মাদল বাজে
যারা শুনেছিল, কেউ আর নেই...
শীত করে
হয়তো জ্বর আসবে...
চোখ লাল
ইস্কুলবাড়িটার আর আমার...
বিশ্বাস না হলেও
উদ্বোধনী সঙ্গীতে কৃষ্ণাদি...
শেষ বিকেল ছুঁয়ে
কায়াহীন গোলাপী জ্বর...

ফিরে পাওয়া বন্ধুত্ব

ভাস্বতি চক্রবর্তী

আজ মনে পড়ে সে দিন
যেদিন প্রথম দেখেছি তোমায়
ইংরেজি কোচিং
আজ মনে পড়ে সেদিন

সেদিন গ্রামারের ফাঁকে ফাঁকে করেছিলাম হাসি-মজা
চিলেকোটার স্বল্প পরিসরে
মেতে উঠেছিলাম গল্পে আনন্দে
কিন্তু জীবন তো বাঁধাগতে চলে না
এসেছিল ঝড় কালবৈশাখী—
করেছিল ভেঙে টুকরো টুকরো তোমার আমার বন্ধুত্ব
দূরে সরে গিয়েছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে
কিন্তু দিয়া, জীবন তো একহাতে নেয় আরেক হাতে দেয়
আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছিল তোমায়—
ফিরিয়ে দিল যখন...
তখন আর তা শুধু চিলেকোঠার সংকীর্ণতায় নয়
কেবল বন্ধুরূপেই নয়
প্রিয় বন্ধুরূপে, সীমাহীন আকাশের বিস্তৃত পরিসরে।
স্কুলের বারান্দায় টিফিন ব্রেকে
অনর্গল জোড়া শালিকের মতো কিচিরমিচির
করেছি, মান-অভিমান ভারাক্রান্ত হৃদয়ে
যখনই জোড়হীন হয়েছি—তখনই
একটা হাত পেয়েছি পিঠের উপর...
যে হাত সহৃদয় বন্ধুত্বের হাত,
সারা জীবন পাশে থাকার আশ্বাস,
যে হাত দুর্দিন সুদিনে সর্বদা ভরসা দেয়,
জোগায় আদি অকৃত্রিম বিশ্বাস।
মনে পড়ে দিয়া... সেদিনের কথা...
গগনে কালো মেঘের ঘনঘটা,
গর্জনে ফেটে পড়ছে বারিদ,
গগনভেদী বজ্রপাতে মাঝে মধ্যে—
ঝলসে উঠছে যেন স্কুল বিল্ডিংটা।
তখন প্রকৃতির রূদ্ররূপ প্রত্যক্ষ করতে করতে
একইসাথে হারিয়ে গিয়েছিলাম
টিফিনের সেই চল্লিশটা মিনিট
কি তাড়াতাড়ি-ই না শেষ হয়েছিল...দিয়া মনে পড়ে?
জান দিয়া, মনে হতো ওই তিনতলার বারান্দাটা
শুধুই তোমার আর আমার জন্য...
দুজন দুজনের হাত ধরে
বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে, বা ঝোড়ো হাওয়ার দোলায়
একসাথে হারিয়ে যাবার জন্য
স্কুল চলাকালীন টিফিনের সময় বৃষ্টি হলে
বা ছুটির পরও একসাথে বাড়ি ফেরার সময়
প্রকৃতিটা বড় মনোরম হয়ে উঠত
কিছুটা নিজ গুণে, কিছুটা—
তোমার আমার রসায়নের জন্য হয়তো বা।
আজও আকাশটা মুখভার করে আছে
গাছের একটা পাতাও যেন নড়ছে না
স্থির হয়ে আছে যেন সমগ্র প্রকৃতি
দিয়া, আজ আমাদের মতো ওরাও শঙ্কিত—
কারণ ওরা জানে, আমাদের স্কুলজীবন শেষ,
ওরা জানে, আজ আমরা
একসাথে তিনতলায় দাঁড়াব না
শুধু আজ কেন
আর হয়তো কোনোদিন
ঐ তিনতলার বারান্দাটায় একসাথে থাকা হবে না।
তবে কি তোমার-আমার বন্ধুত্ব চোরাস্রোতে তলিয়ে যাবে?
না দিয়া না, তা হয় না, তা হতে পারে না।
চল না দিয়া,
আজ আমরা একসাথে সব ভয়কে মিথ্যা প্রমাণ করে দিই
আজ একসাথে বিশ্বাস করতে শুরু করি
পরিস্থিতিকে হার মানিয়ে
আমরা আবার একসাথে থাকব
এই বারান্দায় না হলেও অন্য কোথাও
চিরদিন পরস্পরের পারিবারিক, সাংসারিক
বিপদে, ভাগ করে নেব দুঃখ
আনন্দে ভাগ করে নেব সুখ, যাতে
চিরন্তন হয়ে থাকবে তোমার-আমার বন্ধুত্ব
প্রকৃতি অবাক চোখে দেখবে
দিয়া আর প্রথমা দুজন দুজনের হাত ধরে
হেঁটে চলেছে জীবনপথে
স্থির হয়ে যাওয়া গাছের পাতাগুলো নড়ছে বৃষ্টির তালে
মুখভার করা মেঘের দল হাসছে...নাচছে...গাইছে
তুমি দেখতে পাচ্ছো না দিয়া?
দেখো দিয়া—
কি সুন্দর রোদ উঠেছে...
বৃষ্টির পর ... সোনারোদ।

চোরাবালি

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

একমুঠো কিশলয় চেয়ে বাড়িয়েছি হাত—
স্বপ্নরাজ্যের দুয়োরে ঘোরা হয়েছে বৃথা।
অবাস্তব স্বপ্নময়তায় প্রতারিত আমি,
মরীচিকার নেশায় মত্ত আকাঙ্খিত চিত্ত।

১০ই মে তোমার অপ্রত্যাশিত সম্মতি
মোর মনফাগুনে রং দিয়েছিল ঢেলে;
ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাই কী হঠাৎ—
আমাদের এই মিথ্যে ছন্দের হল বহিঃপ্রকাশ।

বহুকাল হেঁটে এসেছি একা, শুধু একা
গোলাপের চারা বুনে ভেবেছি মোর সঙ্গী হবে তুমি।
আজ সে চারা আমাদের সত্তা ছেড়েছে
করেছে মোর স্বপ্নকে লণ্ডভণ্ড, কেড়েছে মোর ছন্দ; তবু—
তারার মিটিমিটি উজ্জ্বল আশা মোর মনপ্রদীপের শিখা হয়ে
ধরা দেয় অবাধ মনবাগিচার সকল ফুলের মাঝে।

সাঁকো

মুদ্রা

সাঁকোর জন্য কিছু একটা লিখব আমি এবার
গদ্য হোক পদ্য হোক পড়ার মত সবার।
কত কথাই মনে আসে কোনটা যে বাছি
বুঝতে ঠিক পারছি না যে কি আছে মনের কাছাকাছি।
সাঁকোর যে সাঁকোটা এটাই ভাল বুঝি
সবার চলার পথের দিকে কেবল আমি খুঁজি।

এমন একটা সাঁকো যদি মনে মনেতে থাকে
তবে কিন্তু কথাই নেই সবাইকে খুশী রাখে।

মাঝে মাঝে ভাবি আমি সাঁকোর এক একটা পাতা
কত জনের হাসি কান্না সুখ দুঃখ ব্যাথা।

সাঁকো তুমি ভালোই থাকো ভালোবাসা নিয়ে
আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আশার পরশ দিয়ে,
দেখতে দেখতে দশটা বছর বয়স হল তোমার
এবার সময় আরোও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার।
তবে তুমি ভয় পেয়োনা আমরা সবাই মিলেমিশে
একই সাথে দিন কাটাব সবাই তোমায় ভালোবেসে।।

LIVING THINGS

Raddur (Samaddar)

Let the memories, race back to me;
Let the little flower, bloom back a smile,—
When memories torn bring back but sorrow...
Let the diamond spark, its elegance
Where friendship is the only meaning;
Where rejection has no dwelling;
And that is where I start my day—
Let those matured thoughts, come back to me;
Let the ruptured dseams, fly back to me;
when there is no more sorrow in my life—
Only an array of happiness in Nature
and within every sphere of it.
The cute cloud welcome me, the puny
grass give me space, the brightness
of the sky, come running to define
My sorrows, my lost hopes, my
lost days, my unwanted moments
and establish the cacophony
of tunes of happiness gradually
conquering my Heart.

This is where I live my life,
Amidst you and everyone.

আতসকাঁচের অন্তরালে

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

ছন্দ মিলিয়ে, বেশ গালভরা, ইংরাজীতে বলতে গেলে কিছুটা Alliterative নামকরণের একটি মস্ত বড় সুবিধা হল অনেক ক্ষেত্রেই কোনো রচনার ভূমিকার কাজটা নামকরণের মধ্য দিয়েই কিছুটা সারা হয়ে যায়। বিশেষ করে এক সাধারণ লেখক বা বলা ভাল এক গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে যাঁদের সম্পর্কে প্রবন্ধটি লিখব বলে মনস্থির করেছি তাদের নিয়ে বাঙালীর কাছে ভূমিকার অবতারণা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁরা হলেন—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায়, বা বলা ভাল তাঁদের দুই মহান গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী এবং ফেলুদা। এমন কোনো বাঙালী পরিবার পাওয়া বোধহয় দুষ্কর হবে যারা নিজেরা কোনোদিন ব্যোমকেশ গল্পের রসাস্বাদন করেননি অথবা সন্তান-সমা বালক-বালিকা কেন্দ্রিক নানাবিধ অনুষ্ঠান বাড়িতে ফেলুদা-র বই উপহার দেননি। বিশেষ করে বর্তমান যুগে সন্দীপ রায় এবং অঞ্জন দত্ত-র কল্যাণে ফেলুদা ও ব্যোমকেশের গোয়েন্দাগিরি হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত আরো আকর্ষণীয়।

কিন্তু গোয়েন্দা গল্প এবং চরিত্রের সার্থকতা কি শুধুমাত্র অপরাধ, অপরাধী এবং গোয়েন্দাকে কেন্দ্র করেই? যদি আমরা প্রচলিত চিন্তাভাবনার একটু বাইরে বেরিয়ে এসে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি তাহলে কিন্তু নেতিবাচক উত্তর পাওয়ার সম্ভবনাই অত্যন্ত বেশী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায়—উভয়েই তাঁদের সমকালীন সমাজকে অদ্ভুত পারদর্শীতার সঙ্গে গোয়েন্দা গল্পের মোড়কে মুড়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন যেটা আপাত দৃষ্টিতে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অবচেতন মনে হয়তো সেই সামাজিক প্রেক্ষাপট ও একাত্মতা-ই উভয় চরিত্রকে আমাদের কাছে এতটা জনপ্রিয় ও কালজয়ী করে তোলে।

১৯৩০-এর দশক — প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতোই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দামতার আড়ালে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল কিছু ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি ও যেমন পারস্পরিক হিংসা, অবিশ্বাস, কালোবাজারি, গোপন নেশার দ্রব্য চালান চক্র। এমনই এক সময়ে, ১৯৩২ সালে *বসুমতী* পত্রিকায় আবির্ভাব ঘটল বাংলার প্রথম পরিণত গোয়েন্দা চরিত্রের—ব্যোমকেশ বক্সী, শুরু হল তার দৃপ্ত পথচলা। কিন্তু একা না, সমাজকে সঙ্গে নিয়েই তাই 'সত্যান্বেষী'তে আমরা পাই ড্রাগ চোরাচালান চক্রের হদিশ, 'আদিম রিপু' ইঙ্গিত দিয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও কালোবাজারি টাকার প্রভাবের দিকে তেমনই 'দুর্গরহস্য' ফুটিয়ে তোলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের অসহায়তা। এর প্রায় তিরিশ বছর পরে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে আবির্ভাব ঘটে আরেক বাঙালী গোয়েন্দা চরিত্রের প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা (১৯৬৫)। ততদিনে ভেঙে গেছে স্বাধীনতার স্বপ্নসৌধ, গড়ে উঠেছে হতাশা, বেকারত্ব, জন্ম নিয়েছে আন্দোলন—বাঙালী যুবক দিশাভ্রষ্ট। এই সাধারণ হতাশাগ্রস্ত অমল, কমল, বিমলদের মধ্য থেকেই সত্যজিৎ ফেলুদাকে তুলে আনলেন এক ইন্দ্রজিত হিসাবে—যে এই সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, যার মধ্য দিয়ে বাঙালী খুঁজে পাবে তার যথার্থ যৌবনকে—বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীনচেতা, নির্লোভ, চিন্তাশীল।

এই বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে ব্যোমকেশ এবং ফেলুদা কাহিনী হয়ে উঠেছে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান এবং তাদের চিরন্তন সামাজিক ও মনস্তাত্বিক টানাপোড়েনের এক জীবন্ত দলিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় নবজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের যে প্রভাব ভারতীয় সমাজে এসে পড়েছিল তারই আদলে গড়ে ওঠে ব্যোমকেশের দীপার মতো চরিত্র ('সজারুর কাঁটা')। সে সাধারণ মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতার বাইরে বেরিয়ে এসে বিবাহের প্রথম রাত্রে তার সদ্যবিবাহিত স্বামী দেবাশিসকে তার অসহায়তা এবং পূর্ব প্রণয়ের কথা বলে এবং তার সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অসম্মত হয়। সত্যবতী সম্পর্কে অজিতের শ্রদ্ধামিশ্রিত মন্তব্যের "ঘোর বিপদের সময় সমস্ত শঙ্কা সঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া সে যে আমাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারে, ইহা যেমন অচিন্ত্যনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। বিপদ উপস্থিত হইলে অধিকাংশ বাঙালী মেয়েই জড়বস্তু হইয়া পড়ে। তাই এই কৃশাঙ্গী, কালো মেয়েটি আমার চক্ষে যেন সহসা একটা অপূর্ব অসামান্যতা লইয়া দেখা দিল।" ('অর্থমনর্থম') মধ্যে দিয়েই আমরা সেই নারী স্বাধীনতারই প্রতিফলন পাই। যদিও ফেলুদা-এ নারী চরিত্রের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম তবুও 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' গল্পের মেরী শীলা বিশ্বাস সামান্য পরিসরেই তার বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার ছাপ রাখে। তাই বর্তমানের এই 'Feminism'-এর যুগে বাঙালী নারীদের ক্রমান্বয়ে অসামান্যা হয়ে ওঠার প্রতিফলনকে কি আমরা অবহেলা

করতে পারি তারা শুধুমাত্র এক পুরুষকেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্পের অংশ বলে?!

আবার এই পুরুষকেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্পের মধ্যেও আমরা পাই অন্য এক পুরুষতন্ত্রের ইঙ্গিত যেখানে পুরুষরা নিজেরাই নিজেদের তৈরী করা সামাজিক জালে অসহায় ভাবে জড়িত। অনেকটা সেই ফরাসী দার্শনিক ফুকো (Foucault)-র কথা অনুযায়ী, সমাজে শক্তিশালীরা যে শুধুমাত্র শক্তির উৎস হয় তাই না, অনেক ক্ষেত্রে সেই শক্তির বেড়াজাল তাদেরই অসহায় করে দেয়। ফেলুদার 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' গল্পে ঠিক সেইরকমই এক পরিস্থিতি তৈরী হয় জমিদার মহীতোষ সিংহরায়ের ক্ষেত্রে যিনি শারীরিকভাবে বাঘ শিকারে অক্ষম হলেও শুধুমাত্র জমিদার ও জমিদারের সুনাম অক্ষত রাখতে বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেন। আবার তেমনভাবেই ব্যোমকেশ বক্সীর 'রক্তের দাগ' গল্পে ঊষাপতিবাবু নিজের অজান্তেই নিজের মালিকের গর্ভবতী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে লোভ ও ভয়ের যৌথ উদ্যোগে তা মেনে নিতে বাধ্য হন।

এইসব নানাবিধ চরিত্রচিত্রণ ছাড়াও যদি আমরা গোয়েন্দা গল্পের আরেকটি খুব আকর্ষণীয় দিক—অপরাধের কারণকে, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় motif of crime; যদি একটু আলাদাভাবে দেখি, সেখানেও কিন্তু আমরা গোয়েন্দা কাহিনী, চরিত্র নির্বিশেষে খুঁজে পাব এমন কিছু সামাজিক অবক্ষয়ের নিদর্শন। যা শুধুমাত্র আজ থেকে আশি বা পঞ্চাশ বছর আগে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই নয়, আজও খবরের কাগজের শিরোনামগুলি তাদের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। প্রেম ও প্রেম-জনিত ঈর্ষা যদি ব্যোমকেশ কাহিনীর মুখ্য criminal motif হয়, তাহলে ফেলুদার গল্পে সেটি হল লোভ—আরো চাওয়া ও পাওয়া-র লোভ। তাই সমাজের অন্যতম বিত্তশালী ব্যক্তি মগনলাল মেঘরাজ আরো বিত্ত ও ক্ষমতার লোভে হয়ে ওঠেন নিষ্ঠুর অপরাধী। বনবিহারীবাবু ('বাদশাহী আঙটি'), 'নীলমণি সান্যাল ('শেয়াল-দেবতা রহস্য') এনারা প্রত্যেকেই সেই শ্রেণীর মানুষ যারা যত বেশী পায়, তত বেশী চায়। একইভাবে ব্যোমকেশ গল্পে প্রেম যেমন সুন্দর, তেমনই ভয়ংকর। 'অচিন পাখী' গল্পে পুলিশ ইনস্পেক্টর নীলমণিবাবু যেমন তার মেয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেন না, তেমনই 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পের রতিকাণ্ড নিজেকে বাঁচানোর দায়ে তার বাল্য প্রেমিক শকুন্তলার কণ্ঠরোধ করতেও পিছপা হয় না। আর তৎকালীন সমাজের উত্তরাধিকার, বিশেষ করে কন্যা সন্তান সম্পর্কিত উত্তরাধিকার, বিশেষ করে কন্যা সন্তান সম্পর্কিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতা এবং কুটিলতার পরিচয় আমরা পাই 'অর্থমনর্থম', 'খুঁজি খুঁজি নারি' ইত্যাদি গল্পগুলির মধ্য দিয়ে। এইভাবে অপরাধগুলি গোয়েন্দা কাহিনীর রহস্য বুননের মূল উপকরণ ছাড়াও হয়ে উঠেছে তৎকালীন এবং সমকালীন সমাজের বড্ড চেনা এক জলছবি।

'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই/মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্যরতন'—কবির এই কথাটি তাই গোয়েন্দা কাহিনীর প্রধান গোয়েন্দা চরিত্রের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, তেমনই সত্য আমার, আপনাদের মত পাঠকদের ক্ষেত্রেও। গোয়েন্দা গল্পকে শুধুমাত্র রহস্য-রোমাঞ্চর মোড়ক থেকে বের করে এনে তার অন্তর্নিহিত সামাজিক চিত্র, চরিত্র ও মননকে উপলব্ধি করার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে 'অমূল্যরতন'। তখনই গোয়েন্দা গল্প শুধুমাত্র সাময়িক আনন্দের উৎসের বাইরে বেরিয়ে হয়ে উঠবে ভাবনার উৎস। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষিতে। আর তখনই হয়তো আমরা বাঙালী হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায়ের কাছে কেবলমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরে ঋণী হয়ে থাকব না, ঋণী হয়ে থাকব তাদের বাঙালী সমাজ ও চরিত্র গঠনের ভাবনার ক্ষেত্রেও।

'বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা, টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ঈশ্বর শব্দটা আমার কাছে মানুষের দুর্বলতা সমূহের এক অভিব্যক্তি ও ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আলবার্ট আইনস্টাইন।

হলুদ পাখি

পৃথা তা

অনেকগুলো লাল নীল আলোর কিছু নাচানাচি করছে। নাচতে নাচতে জড়ো হতে লাগল। ওমা! ওটা কি তৈরী হচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক দেখেছে নাড়ু, এটা আর কিচ্ছু নয়, একটা ইলিশ মাছ। চক্চকে রূপোর পাতের মত কাটা কাটা বুক পিঠ। ঘোলাটে লাল চোখ। ভাসছে - ভাসছে। ভাসতে ভাসতে এক গোঁৎ খেয়ে নাড়ুর দিকে তাক করল। এবার ছুঁচলো মুখটার আড়ালে ঢেকে গেছে গোটা দেহটা। ঠোঁট দুটো আস্তে আস্তে খুলছে। ওরে বাবা। বিশাল হাঁ। একি! এত বড় বড় দাঁত থাকে নাকি ইলিশের? দুপাশে আবার দুটো গজদন্ত। হাঁ মুখে সাঁই সাঁই করে জল কেটে এগিয়ে আসছে নাড়ুর দিকে। এইবার টুক্ করে তাকে গোলকুলের মত মুখে পুড়ল বলে।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল নাড়ু। আহ্!! এতক্ষণ ওটা স্বপ্ন ছিল তবে। গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেছে। পাশে পড়ার টেবিলের দিকে চোখ চলে গেল। ইস্! ছটা বেজে গেছে। এমনিতে সে যে খুব ভোরে ওঠে তা নয়। বরং রাতে পড়লে অনেকদিনই খুব দেরি হয় তার ঘুম থেকে উঠতে। কিন্তু আজ তার পড়তে যাওয়া। ইংরিজি স্যার যদিও পাড়ার কাছেই থাকেন, তবুও সাড়ে ছ'টার মধ্যে ঢুকতে হয়। ম্যাচে এমন শোচনীয় হার তার ওপর এই স্বপ্ন সব মিলিয়ে সকালে তার মেজাজটা বিগড়েই ছিল, এরপর রেডি হয়ে বেরোবার সময় দেখল ঠাম্ এক গ্লাস দুধ-বর্নভিটা গুলে হাসি মুখে বসে আছে খাবার টেবিলে। এ বিষয়ে তার অনিচ্ছার কথা বাড়ি শুদ্ধ সবাই জানে এবং হেসে উড়িয়েও দেয়। আচ্ছা, এরা কি কোনদিন বুঝবে না, যে সে অনেক বড় হয়ে গেছে। ক্লাস টুয়েল্ভ শেষ হতে চলল। সামনের বার এ সময় সে কলেজে পড়বে। কথা না বাড়িয়ে বিরক্ত মুখে গ্লাস খালি করে বেরিয়ে পড়ল সে।

নভেম্বর মাস। পুজো শেষের হাল্কা ফাঁকা লাগাটা যেন গুমরোতে থাকে এসময় মনের মধ্যে। শীতের প্রথম বার্তা আসতে থাকে প্রকৃতিতে। হাওয়ায় রুক্ষু টান। গাছপালায় সন্ত্রস্তভাব। সামনে ক'মাস বাদেই পরীক্ষা। স্কুল জীবন শেষের ইঙ্গিত। পুরনো মুহূর্তরা, পুরনো স্মৃতি, বই সব যেন কেমন ভীড় করে একটা অদ্ভুত মন-কেমন করা তৈরী করে। এটা ছড়িয়ে পড়ে মাথার থেকে হাতের আঙুলে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই প্যাডেল ঘোরাতে যাবে নাড়ু, এমন সময় শুনতে পেল —''এই দিদি, নাড়ু গোপাল চিনির নাড়ু খায় না গুড়ের নাড়ু রে?'' দুধ খাওয়ার রাগটা মন কেমন করা দিয়ে ঢাকা পড়ছিল ক্রমশ। আবার সেটা মাথাচাড়া দিল নতুন উদ্যোগে। আরে! পেয়েছোটা কি এরা? এবার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কোন দিকে না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে এগোতে এগোতে সে শুনতে পেল, পিছনে একজোড়া রিনরিনে হাসির শব্দ।

ব্যাপারটা গুছিয়ে বলা যাক তবে, হয়েছে কি, নাড়ুর বাবা ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পরেই কলকাতা লাগোয়া মফঃস্বলে তাদের তিন কামড়ার একতলা এই বাড়িটা তৈরি করেন। সে আজ বিশ বছর হয়ে গেল। নাড়ু জন্ম থেকেই এখানে। বাবা, মা, সে আর ক্লাস সিক্সে তার দাদু মারা যাবার পর থেকে তার ঠাম্মা, এই চারজনের দিব্যি কেটে যাচ্ছিল দিন। এই আকালের বাজারেও শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, পাড়াটায় ঘটি পরিবারের সংখ্যাই ছিল বেশি। বাঙাল-বাড়ি যে দু-চারটে ছিল না তা নয়। কিন্তু তারা স্বভাবগুণেই হোক্ আর জনবল কম থাকার গুনেই হোক্, বেশ মিলেমিশেই থাকত। এমন সময় ঘটল উৎপাতের সূচনা।

নাড়ুদের বাড়ির একদম সামনে রাস্তার ওপারের ফাঁকা জায়গায় জড়ো হল বালি, ইট, স্টোনচিপস্। বাবা খোঁজ নিয়ে জানলেন এক স্কুলের মাস্টারমশাই বাড়ি করছেন। বাবা তো আহ্লাদে আটখানা। এমনিতেই এ পাড়াটা বেশ ভালো। তার আবার সামনেই বাড়ি করছেন এক মাস্টারমশাই। কয়েকমাস পর স্ত্রী, বৃদ্ধা মা তার দুই মেয়েকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করলেন বিশ্বাসবাবু। নাড়ুদের সবার নেমন্তন্ন ছিল সেদিন। বাড়ি তৈরির সময় তার বাবা হবু পড়শি হওয়ার সুবাদে বেশ কিছু সাহায্যও করেছিলেন বিশ্বাসবাবুকে। সেদিন-ই নাড়ুর সঙ্গে আলাপ হয় তুতুল ও মিতুল-এর। তুতুল ক্লাস সেভেনে পড়ে, আর মিতুল মাধ্যমিক দিয়েছে। তার মা-ই মিতুলের মা-কে জানাল নাড়ুর স্যারেদের কথা। হপ্তাখানেকের মধ্যে তার স্যারেদের ইলেভেনের ব্যাচে ভর্তিও হয়ে গেল মিতুল। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এরপরই অশান্তির ক্রমশ শুরু। ব্রণগুলো ফোঁড়ার আকার নিতে শুরু করল। ওরা পাড়ায় একটু গুছিয়ে বসতেই শুরু হয়ে গেল পদ্মাপাড়ের গোষ্ঠী তৈরীর প্রবল চেষ্টা। বাঙালরা আগেও তাদের পাড়ায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়েই থাকত। কিন্তু বাঙালত্বের গৌরবে মাতোয়ারা হয়ে এমন হৈ হৈ কাণ্ডটা আগে ছিল না। বাকি বাঙাল বাড়িগুলোও বর্ষার জল পেয়ে ছেলে-বুড়ো সমেত চাগিয়ে উঠল। ওদের এই এককাট্টা হয়ে ওঠা দেখে বাকি পাড়া ওদের নাম দিল পদ্মাপাড়ের গ্রুপ। কারণটা হল—প্রথমত, বাঙাল না বলে এটা বলা, অনেকটা বগলকে আন্ডারআর্ম বলার মতো। শুনতে কুচ্ছিত লাগে না। দ্বিতীয়ত, ওদের সামনে ওদের বাঙাল না বলা গেলেও পদ্মাপাড়ের বাসিন্দা বলা যায়। ক্রমশঃ ওরা নিজেরাও এটাকে নিজেদের পরিচয় বানিয়ে ফেলল।

বিশ্বাসবাবুর মত নিপাট ভালো মানুষ পর্যন্ত নাড়ুর বাবাকে বললেন—''যা-ই বলুন না কেন দাদা, সৌরভ গাঙ্গুলী বাঙালের ঘরের ছেলে বলেই না এমন ক্ষমতা। ঘটি হলে কিন্তু .. .. ..'' কিন্তু যে কি তা তিনি না শেষ করেই চুমুক দিলেন সান্ধ্য আড্ডার চায়ে। মৃদু প্রতিবাদের সুরে নাড়ুর বাবা বোসবাবু জানালেন — ''তাই কি আর? ওর জন্ম, বড় হওয়া সবই তো এখানে।'' বিশ্বাসবাবু জানালেন — ''আরে মশাই রক্ত যাবে কোথায়? দেশ পাড়া গাঁয়ের প্রভাব বলে একটা কথা আছে মানবেন তো?'' আর কথা এগোয়নি। মিতুলের ঠাম্মা একদিন নাড়ুর ঠাম্‌কে লাল ডাঁটা বাছতে দেখে বললেন — ''দিদি সরু কর‍্যা আলু কাইট্যা, কলোজিরা আর কাঁচালঙ্কা চিঁইরা হেইডা দিয়া একখানা পদ করেন। একবেলা বাসি হইলে আরো সোয়াদ লাগব।'' নাড়ুর ঠাম্ উত্তর দিয়েছিলেন, ''আপনাদের ভাই সবেতেই ওই কালোজিরে আর কাঁচালঙ্কা। আর আমাদের বাড়িতে আসলে কেউই বাসি খেতে চায় না একদম।'' কথাটার মধ্যে যে হাল্‌কা ঠেস্ ছিল না তা নয়, তবে বলেছিলেন মিষ্টি করে। প্রত্যুত্তর এলো — ''ও হ্যাঁ, আপনারা তো গুড়-গোলা কইর‍্যা ব্যান্‌জোন বানান। বাসি কইরে খাইতে যাইলে তো পইচ্যা যাইব!'' একথাটাও বেশ মিষ্টি করেই বলে ছিলেন।

মিতুলের সাথে প্রথম আলাপে বেশ লেগেছিল নাড়ুর। শ্যামলা গোলগাল মুখ। প্রায় সবসময়ই জোড়া ভুরুর উপরে একটা ছোট্ট টিপ উকি দেয়। তাদের গৃহপ্রবেশের দিন নাড়ুকে জানিয়েছিল — ''আমার নাম মৈত্রী। বাড়িতে মিতুল বলে ডাকে। তুমিও মিতুল-ই বলো।'' কথাটা শেষ হয়েছিল একমুখ হাসি দিয়ে। নাড়ু অবাক হয়ে দেখেছিল, হাসলে তার মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে যায়। দু'পাশে দু'খানা গজদন্ত। হাসি কি প্রসাধন হয় কোন কোন মানুষের?

নাড়ু বলেছিল — ''আমার নাম নির্ঝর বসু।'' উত্তর এল — ''ও, তোমায় তো আবার ডাকনামে ডাকা যাবে না। যা ছিরি নামটার। হি হি হি হি।'' সাওস্ দেক একবার! ওইটুকুনি মেয়ে, এক ইয়ারের সিনিয়ারের প্রতি কোনো সম্ভ্রম নেই। আর, তার ঠাম্ আর মাকেও বলিহারি। সবার সামনে, চেঁচাবে নাড়ু নাড়ু করে। কতবার বারণ করেছে সে। ভাবতেই কষ্ট হয় যে, তার অমন ভালো নামের এমন বিচ্ছিরি ছোট সংস্করণ। ডাকনাম নিয়ে সে বহুদিন হল খুব সংকুচিত আছে। তাদের সময়ে ডাকনামের মুল বৈশিষ্ট্য ছিল তা হবে অর্থহীন — চিন্টু, পিন্টু, তাতান, পাপান, বাবাই, রাণা, বিট্টু এইসব। এখন আবার ডাকনামেরও মানে থাকছে। শঙ্খ, বিহান, ঋষি, মৌনী এসব হচ্ছে ডাকনাম। ভালো নামগুলো আরো খটমট। যার যত শক্ত নাম, সে তত স্পেশাল। আর তার ডাকনামখানা দেখ। শুনলে মনে হয় গল্পগুচ্ছের কোন শিশুচরিত্র। কালসিটে পড়া জায়গায় জোর চিমটি কাটল মেয়েটা। তারপর থেকে ওদের একটু সমঝে চলত সে।

হৈ হৈ করে চলল শুঁটকি নিয়ে মাতামাতি। দু'সপ্তাহে চার পাঁচ দিন এই রান্না হওয়ার ফলে বাড়ির সামনে টেকা দায় হল। একদিন বিকালে কাপড় তুলতে গিয়ে দু'বাড়ির ছাদ থেকে মায়েদের কথা হচ্ছিল। বোস গিন্নি একটু সম্ভ্রমের সুরেই জানতে চাইলেন—''আমাদের মায়ের তো আবার শ্বাসকষ্ট আছে কি না, তাই বলছিলাম, আপনাদের তো প্রায়ই শুঁটকি মাছ রান্না হয়, তা নিজেদের কোনো অসুবিধা হয় না?'' বিশ্বাস গিন্নি সোজা কথা সোজা করে বলতেই ভালোবাসেন। স্পষ্ট পাল্টা দিলেন — ''তোমাদের কি গাঁধাল পাতার বড়া ভাজতে বাগানে তোলা — উনুন ধরাতে হয় ভাই? হয় না তো। এটাও তেমনি''।

আগে আগে ডার্বি ম্যাচে সারা পাড়া থেকে একটা লজঝড়ে টেম্পো ভাড়া করে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে যেত। লাল-হলুদরা টুকটাক বাসে ট্রেনেই চলে যেত। এবার ডার্বি ম্যাচের আগে ওদের একটা চকচকে টেম্পো ভাড়া করা হল। থার্মোকলের ইলিশ আর লাল হলুদ বেলুনে সেজে উঠল ছোট হাতি। তুতুলের গায়ে লাল-হলুদ জার্সি, নীল জিন্স। মিতুলের লাল কুর্তি, হলুদ লেগিন্স। হৈ হৈ করে আবির, পতাকা বগলদাবা করে রওনা দিল সবাই। ম্যাচ নিয়ে প্রায় ঝাগড়াই হয়ে গেছিল কোচিং-এ রাণার সাথে। ম্যাচে গো-হারা হয়ে অনেক সন্ধ্যে করে উল্টো রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল নাড়ু।

রাতেই তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল হলুদ পাখি নামে কেউ একজন। প্রোফাইল পিকচারে সত্যিই একটা হলুদ রংয়ের পাখির ছবি ছিল। মনটা এত খারাপ ছিল যে প্রোফাইল খুলে দেখাও হয়নি। পরদিন সকালে নোটিফিকেশনে জানা গেল কিছু না ভেবে গতকাল রাতে অ্যাকসেপ্ট করা 'হলুদ পাখি' তার ওয়ালে একটা বড় ইলিশ মাছের ছবি পোষ্ট করেছে! প্রোফাইলটা খুলতেই দেখা গেল প্রোফাইল পিকচারে হলুদ পাখিটা তেমনি বসেই আছে, তবে কভার ফটো জুড়ে একটা নিটোল শ্যামলা মুখ। জোড়া ভুরুর উপর একটা ছোট টিপ, একজোড়া গজদন্তওলা একমুখ হাসিওলা একটা ছবি। প্রথমে সে ভাবল আনফ্রেন্ড করে দেবে। তারপর মনে হল, দেখাই যাক্ না, কত বাড়তে পারে ঐ পুঁচকে মেয়েটা। সাথে হলুদ পাখি একটা মেসেজও পাঠিয়েছে—''আমার পোষ্ট করা ছবিটা কেমন লাগল জানিও কিন্তু।'' সঙ্গে একটা স্মাইলি। সেই রাতেই ঐ ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখল নাড়ু।

স্যার সকালে টুয়েল্‌ভের ব্যাচকে ইলেভেনের আগে পড়িয়ে দেন। সেদিন সকালে পড়া শেষ করে বেরিয়ে সে অঙ্কনের সাথে অনেকক্ষণ গল্প করছিল কোচিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে। আলোচনার বিষয় ছিল সবুজ-মেরুনের এত অবনতি রোধ করা যায় কি করে। তারা অনেক সম্ভাবনা বার করল।

সামনে দিয়ে ইলেভেনের ব্যাচ ঢুকে যাচ্ছিল স্যারের বাড়ির ভিতরে। নাড়ু আগে মিতুলকে দেখলে কথা বলত। ইদানিং আর বলে না। তাকে দেখেও না দেখার ভান করে আলোচনায় মন দিল। তাদের কথা যে বেণীর বাঁধন-জোড়া কাটিয়ে অপর কোনো কানে গিয়ে পৌঁছেচে তা বুঝল রাতে।

তখন আরো মিনিট পনেরো অঙ্কনের সঙ্গে নানা কথা বলে বাড়ি চলে আসে নাড়ু। আজ প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের জন্য স্কুলে যেতে হয়েছিল। বিকেলেও পড়া ছিল। রাত দশটা নাগাদ অনলাইন হয়েই চক্ষুস্থির। দুপুর বারোটা-দশে তার ওয়ালে হলুদ পাখি লিখে গেছে — ''যতবার ডার্বি / ততবার হারবি।'' সারাদিন ধরে তার নানা বাঙাল বন্ধু তাতে প্রচুর ঠাট্টা-তামাশার কমেন্ট করেছে। তার মোহনবাগান প্রীতির কথা বন্ধুরা সবাই জানে। সবশুদ্ধ পোস্টটা সে তক্ষুণি উড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ইনবক্সে হানা দিল মেসেজ — ''আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার দেখো দেখি ভিতরের ছবিটা মানুষের না কানকুটারির। এত ভয় পাও কেন আমাদের? বকচ্ছপ কোথাকার!''

অসহ্য। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। অবিলম্বে একটা হেস্তনেস্ত চাই। রিপ্লাই দিল। তর্ক চলতে থাকল—

— ''এসবের মানে কি?''

— ''কেন, খুব তো শুনি, আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসা, লেজ ছাড়া বাঁদর। এখন তো বাঁদরদের কাছেই হারতে হচ্ছে।''

— বাইরের প্লেয়ার খেলিয়ে ওসব ছল্-চাতুরি বন্ধ করো।

— ওহোঃ। বাইরের প্লেয়ার আমরা একা খেলাচ্ছি। আর আমরা জিতলেই তোমাদের যত কারচুপির কথা মনে পড়ে। ঘোড়াও হাসবে এবার।

—সবাই ঠিকই বলে। ''মরে বাঙাল জলে ভাসে / কাক বলে কোন ছলে ভাসে।''

— ''নির্গুণ পুরুষের চার-গুন ঝাল পরনে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল।''

—পূর্বপুরুষ নিয়ে তোমরা গর্ব করো না, কথায় কথায় তো শুনি, ওদেশে এন্তার জমি, পুকুর, সুপুরি বাগান ছিল।

— বেশ করি গর্ব করি। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সত্যিই যে আভিজাত্য ছিল তা আমরা এদেশে এসেও প্রমাণ করেছি। নানা বিষয়ে যেসব বাঙালী দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে তার শতকরা আশিভাগ-ই বাঙাল। নিজেরা অলসভাবে সময় কাটাবে পরিশ্রম করবে না, আর আমাদের উন্নতি দেখে বলবে—''বাঙালদের জন্য দেশটা উচ্ছন্নে গেল।'' হাস্যকর। আমরা কি তোমাদের বুদ্ধি কেড়ে নিয়ে পড়াশুনো করি? তোমাদের পরিশ্রম করতে আটকাচ্ছে কে? বেশ কাবু হয়ে গিয়ে নাড়ু রিপ্লাই দিল — ''দেশভাগটা অবশ্যই খুব মর্মস্পর্শী ঘটনা। কিন্তু এটা তো মানবে যে, সে সময় আমরাও তোমাদের পাশে ছিলাম। মানে জ্যোতিবাবু যদি—

— জ্যোতিবাবু নিজেই বাঙাল ছিলেন।

আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না নাড়ুর। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লগ্-আউট করে দিল। আজই স্কুলে অর্ণব তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সৌমিককে বলেছিল —''হ্যাঁরে, ঘটিগুলো কোন বছর জিতেছিল যেন?'' সৌমিকও মনে করার ঢঙে মাথা চুলকে বলছিল — ''উঃ .. .. .., ঠিক মনে পড়ছে না।'' হেসে অস্থির ওদের সাঙ্গপাঙ্গরা। সত্যিই আর ভালো লাগছে না। ফেসবুকে পদ্মাপাড়ের গ্রুপ বলে একটা গ্রুপ তৈরী হল। এখন আর ব্যাপারটা পাড়াতুতো রইল না। দুনিয়ার বাঙাল দুদ্দার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল তাতে। নাড়ুকেও তাতে অ্যাড করা হল শয়তানি করে।

সে, পাড়ায় বলতে গেলে একরকম কোণঠাসাই হয়ে গেছে। চিন্টুই হল এখন তার সবেধন নীলমণি। তার মা বাঙাল হলেও বাবা ঘটি। এখনও সে সবুজ-মেরুন সমর্থনে মাঠে যায়। হাজার হোক হাফ-ঘটি তো। যদিও তার বোন, মানে কাকার মেয়ে পিকু আবার মিতুলের বন্ধু।

তাদের পাড়ার বলাইদার সিঙ্গারার খুব নাম। নাড়ুরও বেশ লাগে খেতে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক করে ফেরার পথে চিন্টু আর সে দুটো সিঙ্গারা কিনে খেতে খেতে ফিরছিল। তাদের বাড়ির গলিটা ঘুরতেই সাইকেলে একটা তাদেরই বয়সি ছেলে পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। পাড়ায় অচেনা ছেলেটা কে? এই ঝাপসা রাস্তার আলোতেও নাড়ু বুঝতে পারল সাইকেলটা বেশ দামী, আর রংটা কাঁচা হলুদ। চিন্টুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল — ছেলেটার নাম অনমিত। মিতুলের সঙ্গে বাংলার ব্যাচ-এ পড়ে। এর সঙ্গে চিন্টু আরো দুটো বিশেষ দ্রষ্টব্য যোগ করে দিল। এক, অনমিতের বেশ টনটনে একটা 'ব্যথা' আছে মিতুলের ওপর, যদিও সেটা অপ্রকাশিত। দুই, ইদানিং প্রায়ই সে বাংলার প্রশ্ন-উত্তর, সাহিত্যের ইতিহাস, রচনা স্যারের কাছে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। ফলে প্রায়ই আসতে হচ্ছে মিতুলের বাড়ি। সিঙ্গারা আজ তিতো লাগছে কেন নাড়ুর?

এভাবেই হপ্তাখানেক কাটল। পাড়ার অবস্থা একরকম তো আছে-ই, বরং ওদের জ্বালায় অনলাইন হওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে স্যারেরা সারপ্রাইজ টেস্ট নিতে শুরু করলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়দিনের ছুটির দিন ফিজিক্স স্যার এগারোটা থেকে দিনের বেলা পড়ালেন। সেদিনও পরীক্ষা। পড়ে বেরোতে প্রায় পৌনে একটা হয়ে গেছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের দুটো তিন নম্বরের সোজা অঙ্ক সময়ের জন্য ছেড়ে দিতে হল। যদিও তাদের স্পিড বাড়ানোর জন্য নম্বর অনুপাতে সময় একটু কমই দিয়েছিলেন স্যার তবু তার এমন হবার কথা নয়। এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিল সে। হঠাৎ তার পা দুটো কেমন যেন ভারী লাগতে লাগল। মনে হচ্ছে আর যেন

এগোতে পারছে না, টানতে পারছে না সাইকেলটা। চোখদুটো আটকে গেছে সামনে। বেশ কিছুটা দূরে পুকুর পাড়ের বাড়িটার কাঁঠাল গাছটা পাঁচিলের শাসন না মেনে ছায়া ছড়িয়েছে রাস্তায়। ছায়ার নীচে তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে, তার সামান্য দূরে একটা ছেলে তার সামনে। মেয়েটা কি যেন বলছে। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে, তার মুখের অর্ধেকটা টুপিতে ঢাকা। ছেলেটোর সাইকেলের রং কাঁচা হলুদ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা চিন্টুর মারফত নাড়ু জানল যে অনমিতির রঙিন ফানুস ফুটো হয়ে গেছে। মিতুল জানিয়েছে যে, সে অন্য একজনকে পছন্দ করে। চিন্টু পিকুর কাছে আরো জেনেছে যে, মিতুলকে নাকি 'সে' বাটারস্কচ আইসক্রিম খাওয়াবে আর মিতুল 'তাকে' দেবে ওর খুব প্রিয় একটা বই। অ্যাঁ। ছেলেটা বলে কি। এই আরেকজনটা আবার কে? যাক্‌গে যাক্‌। তার কি? যে পছন্দ করে সে বুঝে করুক্‌।

ইদানিং প্রায়-ই সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই একটা খারাপ লাগা বিরক্তি ভাব ঘিরে থাকে তাকে। ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। কেন এটা হচ্ছে? আগে তো এমনটা হত না। এটাকে যত জোর করে দূরে সরিয়ে কাজ করছে, পড়তে বসছে ততই যেন এটা চোরা স্রোতের মত ভিতরে ভিতরে বইছে। প্রত্যেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটা তীব্র অস্বস্থির কাঁটা যেন খিচ্‌খিচ্‌ করছে মনে। দুপুরে খাওয়ার পর পড়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে এসবের কারণ খুঁজছিল নাড়ু। এই জানালাটা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। এমন মনে হওয়ার কোনো জুতসই কারণ তো পাচ্ছে না হাতের কাছে, এমনি যেসব ঝামেলা বা চাপ তা তো বেশ ছোটখাটো। তবে কি ---? নাহ্‌। উফ্‌ ভগবান। আচ্ছা ভগবান কি ঘটি না কি তিনিও--। ধুর্‌ এসব বাদ দিতে হবে। সামনেই পরীক্ষা, আর কিচ্ছু নেই।

সামনেই বইমেলা। এবার আবার তার থিম্‌ বাংলাদেশ। যাই হোক্‌। সারাদিন এখন বাড়িতে বসে পড়া। টিউশনি গুলোও বন্ধ। তেমন গল্প করতে আর বেরোনো হয় না। রাতে অফ্‌লাইন থেকে একটু গ্লোবাল হওয়ার চেষ্টা এই নিয়ে বড্ড একঘেয়ে ভাবে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। হঠাৎ ২১শে জানুয়ারি তার ওয়ালে আসা একটা লিঙ্ক দেখে তার চারপাশের ঝামেলা থেকে মনটা চলে গেলো অনেকটা দূরে। খবরের বিষয়বস্তু মোটের উপর এই—''বাংলাদেশে ২০০৯ সালে সংশোধিত আইনের (মূল আইন ১৯৭৩-এর) আওতায় ২০১০-এ গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় বেরল আজ। এই রায়ে ১৯৭১-এর ২৫ ও ২৬শে মার্চ সারা রাত ধরে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের নরমেধযোজ্ঞ করার অপরাধে আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু) রাজাকারকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। বাংলাদেশ সমস্ত রাজাকারদের ফাঁসির হুকুম শোনার জন্য একাত্তরের আগুন বুকে চেপে অপেক্ষা করছে।''

ব্যাপারটা আবছা ছিল নাড়ুর কাছেও। কিন্তু এতো হেলাফেলা করার জিনিস নয়। সুতরাং বই, পুরনো ম্যাগাজিন, পুরনো পেপারের ধুলো ঝেড়ে, গুগুল ঘেঁটে বিষয়টা নিয়ে একটু জানা গেল। প্রায় দিনই পড়ার ফাঁকে বিশ্রামের সময় থেকে কিছুটা করে সময় ঠিক জুটে গেল অতীতটা খোঁড়ার জন্য। কিন্তু একী! দুই রাতে খুন হয়ে গেছে প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ! দানবিক অত্যাচারের মুখে পড়ে অগুন্তি নারী! এ কোন বাংলাদেশের কথা? আর পাশেই তার দেশে এখনও কিছু জায়গায় রয়ে গেছে তীব্র মুসলমান বিরোধিতা, গর্ভস্থ ভ্রূণের তলোয়ারের ডগায় চেপে উন্মুক্ত আকাশের নীচে নাচ। বহু দেশে ধর্ম ও রাজনীতি প্রায় সমার্থক এখনও। এ কী চলছে আমাদের চারপাশে। এটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী জেহাদ নয়, একাত্তরের বিপক্ষে তেরো নয়, অস্তিকের বিরুদ্ধে নাস্তিক নয়, কোনো ইতিহাসের বিরুদ্ধে মেকী স্বদেশপ্রেম নয়, এটা দুনিয়ার সমস্ত মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। মৌলবাদ — যার স্থান কাল পাত্র হয় না। তা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় যে প্রকারই হোক না কেন। নতুন প্রজন্ম নতুন সিস্টেমের দাবীতে মুখর হচ্ছে — ''জামাত নিষিদ্ধ হোক্‌।'' কেমন করে চুপ থাকবে নাড়ু। কেমন করে চুপ থাকবে হুগলী নদী? আবার ভাঙল কাঁটাতার।

শুরু হল বইমেলা। এবার দুই পাড়ে দুই ইন্দ্রপতন হয়ে গেছে। কলকাতা বইমেলা হচ্ছে — হুমায়ুন আহ্‌মেদ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নেই। চারপাশের পরিবেশ বার বার মনে করাচ্ছে তাঁদের। তবু ঘুরে ফিরে আলোচনা জুড়ে আসছে একাত্তর। নাড়ু প্রতিবার বেশিরভাগ দিনই যায় বইমেলা; এবার আর পরীক্ষার জন্য হবে না।

এর মধ্যে পাঁচ-ই ফেব্রুয়ারী বেরল ট্রাইবুনালের দ্বিতীয় রায়। রাজাকার কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনা ছুটি গুরুতর অভিযোগের মধ্যে পাঁচটি প্রমাণিত। তিনটি অপরাধের জন্য পনেরো বছর ও দুটির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল।

যেন হাইড্রোজেন বোমা ফাটল বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞকারীর এই সাজা! মা-ঠাকুমার কান্নার হিসাব চাইতে রাস্তায় নামল মানুষের ঢল। রাজাকারের ফাঁসী, জামাত নিষিদ্ধ করার মতো দাবী নিয়ে বিভিন্ন স্যোসাল নেটওয়ার্কিং সাইট, ব্লগ খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লাখ মানুষের সম্মতি পাওয়া যায় এখানে। এসব কেন্দ্র করেই জোট বেঁধে পথে নামল মানুষ। যন্ত্র সমাজবিমুখ করায়, সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ভোগ্যপন্যের খবর ও হাসিঠাট্টার কথা ছাড়া কিছু হয় না—যন্ত্র নিয়ে এসব হিপোক্রেটিক নাক সিঁটকানো ব্যাপারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নতুন প্রজন্ম নতুন মাধ্যমকেই করল প্রতিবাদের হাতিয়ার। সহজেই যুক্ত হল বহুমানুষ, বার্তা ছড়াল বিশ্বজুড়ে। আসলে মানুষ হল চক্‌মকি পাথরের মত। ঠোকা

লাগলে আগুন বিশ্বজুড়ে। আসলে মানুষ হল চক্মকি পাথরের মত। ঠোকা লাগলে আগুন জ্বলবেই। তা দাবানলও হতে পারে ঠোকা—তা সে যেমন করেই লাগুক না কেন। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের সঙ্গে যোগ ছিল অধ্যাপক, মন্ত্রী সহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ। হু হু করে আন্দোলন কদিনেই ছড়িয়ে পড়ল দেশজুড়ে। সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বরিশালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বগুড়ার সাতমাথা থেকে কুমিল্লার কান্দিপাড়া, যশোরের চিত্রামোড় থেকে চট্টগ্রামের প্রেসক্লাব চত্তর। মানুষ জড়ো হল কাতারে কাতারে। মূল জনস্রোত বাঁধনহারা হয়ে ধাবমান হল প্রতীকী গণআদালত সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের খুব কাছে শাহবাগ চত্বরে। অগুন্তি মানুষের মধ্যে তরুণ প্রজন্ম ছিল সবথেকে বেশি। শাহবাগের নাম হয়ে গেল প্রজন্ম চত্বর। গান, স্লোগান, কবিতা, নাটকে মুখর হল বাংলার আকাশ। এই দ্রুততার যুগেও নিজেকে ভুলে, অতীতের হিসাবকেই কানাকড়ি ছাড়বে না — বার্তা দিল প্রজন্ম চত্বর। মনে পড়ল আমাদের পূর্বসুরিদের কয়েকটা নাম হল — সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। শাহবাগ ঘোষণা করল — ''এটা পালন করার কর্মসূচী নয়। এটা আন্দোলন। তাই সব রাজাকারের ফাঁসি ও জামাত নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ বিদ্রোহ চলবে। নিজেদের জোগাড় করা খাবার ভাগ করে খেয়ে, রোদে পুড়ে, শিশিরে ভিজে, রাতের পর রাত আবাল বৃদ্ধবণিতা আন্দোলন টিকিয়ে রাখল শাহবাগে। ছবিতে, আবিরে, ব্যঙ্গচিত্রে, পোষ্টারে, পতাকায় রঙিন হয়ে উঠল শাহবাগ। বিভিন্ন বাম-ছাত্রসংগঠনের ডাকে যোগ দিল প্রচুর ছাত্রছাত্রী। চিৎকার করল — ''জয় বাংলা''। পুড়ল রাজাকারের কুশপুতুল। মিলিত কণ্ঠ গাইল — ''তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।'' শিল্পী প্রীতম আহমেদের গলায় শোনা গেল — ''এই প্রজন্ম গড়তে জানে জনস্রোত/নেবেই নেবে একাত্তরের প্রতিশোধ।'' ব্যান্ড চিরকুট সহ বহু প্রবাসী বাঙালী কথায় সুরে এক হলেন। কবীর সুমনের গিটার গর্জে উঠল 'গণদাবী' নিয়ে। শুভাপ্রসাদ নন্দী মজুমদার গাইলেন — ''ভীনদেশেতে বাড়ি আর একভাষাতে ঘর/তোমার লড়াই আমার লড়াই আমরা সহোদর।'' রচনা হল হাজারো গান কবিতা সাহিত্য। ছড়িয়ে পড়ল ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবে। ভারত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, নরওয়েতে পড়ল আন্দোলনের প্রভাব। বাংলাদেশে জামাত ও দু-একটি রাজনৈতিক দল বাদে পুরায় সবাই-ই আন্দোলনের পক্ষ নিল।

আন্দোলনের এই জনপ্রিয়তা অস্থির করল জামাত শিবির। লাঠি-সোঁটা অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়ল বিরুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত হল শাহবাগ। আরো জোরালো হল ফাঁসির দাবী। ঝামেলা সামলাতে হিমসিম খেল রাষ্ট্র। বিদেশেও বাধার মুখে পড়ল আন্দোলন।

পেপার, টিভি বেয়ে আসা খবরে এককাট্টা হয়ে উঠল — ঠাম্মারা, মায়েরা, বাবারাও। এমনকি খাবার নিয়ে বাটিপ্রেমও শুরু হল। মিতুল-তুতুলের পাতে পড়ল-পোস্ত, মাছের টক্, বিউলি-ডালের বড়া। নাড়ুর পাতে পড়ল মান-বাটা, মাছের মাথার শুক্তো, কচুর লতি। বোস গিন্নীকে এ-ও বলতে শোনা গেল — ''আমাদের ঝগড়া কি আর ঝগড়া, ওটা তো খুনসুটি!''

রাতে শাহবাগ সংক্রান্ত একটি গ্রুপের হয়ে প্রায় দেড়শোজন ইনভাইট কল নাড়ু। বেশিরভাগ জন জয়েনও করল। গ্রুপটার মালিক ছিল 'হলুদ পাখি'। মেসেজ বক্সে একটা ছোট থ্যাঙ্কস্ও এল এই না চেয়ে পাওয়া উপকারের জন্য। থ্যাঙ্কস্টা চট্পট্ ফেরৎ দিয়ে নাড়ু জানাল — শাহবাগ চত্বরটা তারও, কাজেই একাজ তার ডিউটি। উত্তরে একটা ছোট্ট স্মাইলি এল। মনে হল স্মাইলিটারও দুটো মিষ্টি গজদাঁত আছে। আজকাল নাড়ু ও 'হলুদ-পাখির' টাইম-লাইনে শাহবাগ ও মৌলবাদ বিরোধীতা সংক্রান্ত নানা ছবি ও পোষ্টে লাইক ও কমেন্ট পড়তে লাগল। সেই আড়মোড়া ভাঙা মনখারাপটা যেন কদিন কেটে গেছে নাড়ুর। নাহ্! মেয়েটাকে যতটা ইয়ে ভাবত সে ততটা বোধহয় নয়। মানে আয়নার কাছে আজকাল নাড়ুর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই — ''মেয়েটা বড্ড ভাল''।

এর মধ্যেও মোহনবাগান যথারীতি হেরেছে। হাল্কা হাসি-ঠাট্টা যে হয়নি তা নয়। তবে এটুকু তো চলতেই পারে। পাড়ার বাকী বাঙাল ছেলে পুলেদেরও তার বেশ লাগছে আজকাল। হলটা কী?

শাহবাগকে কেন্দ্র করেই বেশ ক'টা দিন গল্প হল নাড়ুর সাথে মিতুলের। দুজনেই অপরের বেশ কিছু পছন্দ-অপছন্দ, স্বভাব জেনে গেছে। বেশ একটা বন্ধুত্বের ব্যাপারও তৈরী হচ্ছে। এমনিতে বেশ ভালই মেয়েটা। তবে রাগ আর অভিমানটা একটু বেশি। নাড়ু চুপিচুপি তার একটা নামও দিয়েছে — 'অ্যংরি বার্ড'।

এসবের মধ্যে দিয়েই মোটামুটি ঠিক্ ভাবেই কেটে গেল পরীক্ষার দিন কটা। এ কদিন শাহবাগ নিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ হয়নি নাড়ুর। পরীক্ষা শেষ হতেই শুরু হল সেসব, জোরকদমে।

তিরিশে মার্চ আন্দোলনের সমর্থনে দুপুর দুটোয় কলেজ স্কোয়ারে ছিল বড় জমায়েত। ঠিক্ ছিল তারা একসঙ্গেই যাবে। সাদা পাঞ্জাবি আর হলুদ সাদা চুড়িদারে দুজন বেরিয়েও পড়ল সময়মত। কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান গুলো পেরিয়ে গিয়েই ফুটপাতে একটা আপাত ফাঁকা জায়গায় ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল মিতুল। থতমত খাওয়া নাড়ুকে কড়া গলায় জানাল এখান থেকে ফেরার পথে তাকে একটা বাটারস্কচের কাপ কিনে দিতে। আর কাঁধে ঝোলানো কড়ি বসানো চটের ব্যাগ থেকে বের করল একটা বই। নাড়ু দেখল — সেটা - ''হিমুর দ্বিতীয় প্রহর।''

চোখমুখ লাল হয়ে গেছে নাড়ুর। শুনল অ্যাংরি বার্ডও

মুখ লাল করে বলছে — ''চিন্টুকে দিয়ে তো খুব আমার খবর নেওয়া হয়।'' এই রে, নাড়ুর কথা আটকে যাচ্ছে কেন?! — ''না মানে, বলেছিলে যে অন্য কেউ, তাই মানে ---।'' আবার কড়া গলার ঝংকার — ''অত মানে বোঝার কি আছে তোমার? বেশি মানে বুঝেই তো যত গণ্ডগোল পাকাও। বইটা তোমার কাছেই যত্ন করে রেখো পোড়ো কিন্তু।''

একটা গিঁট খুলতেই, একগোলা পাকানো উল্ যেন খুলে গেল। সবটা বুঝতে চেষ্টা করছিল নাড়ু। আর বুঝেই বা কি হবে? তাকে তো বারণ করা হয়েছে বুঝতে।

দুজনেই এগিয়ে চলল প্রজন্ম চত্বরের সমর্থনে। দুজন এগিয়ে চলল ভাবী প্রজন্মের জন্য এক সকাল ভর্তি রোদ্দুর আনতে।

বুড়ো কলকাতা খুব চেনা দৃশ্য দেখে মুচ্‌কি হাসছে সে কি তবে সবটা বুঝতে পেরেছে?

ভয়, ভয় ... নেই, নেই

অপর্ণা চক্রবর্ত্তী

বেশ রেগেমেগেই বাবা আজ ঘর থেকে বেরোলেন। দরকারী বইটা বোধহয় হারাল...।

মেঘনা বরাবরই খুব ভীতু। অল্পতেই খুব ভয় পেয়ে যায়। ওর বন্ধুরা এই নিয়ে কম হাসাহাসি করে না! এমনকি ওর প্রিয় বন্ধু মহুয়াও ওকে প্রায়ই ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। এই তো সেদিন মহুয়ার বাড়ি গিয়েছিল ও। মহুয়া বাড়ি ছিল না। দোকানে ছিল। মেঘনা তাই মহুয়ার ঘরে বসে একমনে গল্পের বই পড়ছিল। হঠাৎ ঘর অন্ধকার! মেঘনা চমকে দরজার দিকে তাকাতেই দেখে সাদা রঙের একটা কিছু এগিয়ে আসছে তারই দিকে! মেঘনা তো ভয় পেয়ে কেঁদেই ফেলল। তখন মহুয়া সাদা কাপড় মুখ থেকে সরিয়ে হা হা করে হাসছে। এরকম প্রায়ই হয়। তাই দুই বন্ধুর ঝগড়াও কম হয় না।

আজ মেঘনা বাড়িতে একা। বাবা তো অফিসে। মাও স্কুল থেকে ফেরেননি। ফোনে জানিয়েছেন ট্রেনে গন্ডগোলের জন্য ফিরতে রাত হবে। মেঘনা আর কি করে, পড়তে বসে গেল। মেঘনা বাবা মায়ের সঙ্গে খড়দায় থাকে। মা অনুশ্রী দত্ত নৈহাটির এক স্কুলের অংকের শিক্ষিকা। বাবা প্রতাপ দত্তর অফিস শিয়ালদাতে। মেঘনা খড়দারই এক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। অংক করতে করতে হঠাৎ মেঘনার চোখ গেল ঘড়ির দিকে। চমকে উঠলও। সাতটা বেজে গেছে! এদিকে ঘুমও পাচ্ছে খুব। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। বাবা, মা এলে দরজা খুলে দিতে হবে। হঠাৎ বেল বেজে উঠল। তড়াক্ করে উঠে দরজা খুলল ও। খুলেই থম্‌কে দাঁড়াল। দরজায় দাঁড়িয়ে এক মানুষ। একে মেঘনা আগে কোনোদিন দেখেনি। চোখে চশমা, গায়ে লাল জামা, চুল গুলো উস্কো খুস্কো। 'কাকে চাই?' ভয়ার্ত গলায় জিগ্যেস করে মেঘনা। 'প্রতাপ বাবু বাড়ি আছেন?' 'না, বাবাকে চাই কেন?' কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে লোকটি বলে, 'আমি তোমার বাবার অফিসেই কাজ করি।' 'ও' এবার মেঘনা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটিকে ঘরে ঢুকতে বলে। লোকটিকে বসতে বলে ঘরে গিয়ে বই খাতা বন্ধ করে আসে। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা। বসার ঘরে ঢুকে আবার চমক! টেবিলে একটা বই পড়ে! বইটা আগেও বাবার কাছে দেখেছে বটে। কিন্তু বইটা এখানে ছিল না। হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, 'আমিই বইটা রেখেছি। আমার নাম অনল মিত্র। প্রতাপদার কাছ থেকে বইটা নিয়েছিলাম। ফেরত দিয়ে গেলাম। আজ উঠিছি।' দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ করে ঘুরে তাকাল অনল মিত্র, 'তোমার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে আমায় বলতে পারো।' বলব না, বলব না করেও মেঘনার মুখ থেকে তার অনেক দিনের ইচ্ছেটা বেরিয়ে গেল, 'কাকু আমি তো সব বিষয়ে খুব ভয় পাই। আমি যেন আর ভয় না পাই।' অনল মিত্র 'তাই হবে' বলে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল। মেঘনা তো অবাক। কারো ভয় আবার কমানো যায় নাকি? তারপরেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোথায় সেই অনল মিত্র! কেউ কোত্থাও নেই! শুধু টেবিলে পড়ে আছে বাবার বই। অগত্যা দরজা দিতে এগোল মেঘনা। দরজা দিতে গিয়ে পাথর হয়ে গেল মেঘনা! দরজা যেমন ভাবে বন্ধ ছিল তেমন ভাবেই বন্ধ। ঘটনাগুলোর কারণ খুঁজতে খুঁজতে ঘরের দিকে এগোল মেঘনা। সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল বেজে উঠল, আবার! ...

না! এবার আর ভুতুড়ে কেউ নয়। ঘরে ঢুকল বাবা ও মা। বাবার মুখটা থমথমে। কি হয়েছে জিগ্যেস না করে পারল না মেঘনা। প্রতাপবাবু বললেন, 'একটা বাজে খবর পেলাম আজকে।' 'আবার কি হল?' মা জিগ্যেস করল। 'অনল আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মারা গেছে। অ্যাক্সিডেন্টে। আমার বইটা ফেরত দিতেই নাকি এখানে আসছিল। বইটা হারিয়েই গেল' 'ইস!' মা বলে উঠল। মেঘনা কিছুই বুঝছে না। ওর সঙ্গে সাড়ে সাতটায় কে দেখা করল? মেঘনা তাকিয়ে রইল বাবার বইটার দিকে। যেটা এখনও বাবা দেখেনি।

এত কিছুর মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার কেউ লক্ষ্য করল না। মেঘনা আজ আর ভয় পাচ্ছে না। বই পাওয়া গেল, ভয় গেল হারিয়ে!

মানুষ

ধীমান দত্ত

ক্রিকেটার নই। বিশেষজ্ঞও নই। আপাদমস্তক সাংবাদিক ছাড়া আর একটা পরিচয় সগর্বেই ঘোষণা করতে চাই। নিখাদ ক্রিকেট অনুরাগী। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এতদিনের দেখা এবং ধারনা থেকে দুটো ব্যক্তিগত মত শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই।

ভারতের চিরশ্রেষ্ঠ (বিশ্বেরও সর্বকালের অন্যতম সেরা) ব্যাটসম্যান কে? এক, সুনীল গাভাসকার। দুই, সুনীল গাভাসকার। তিন, সুনীল গাভাসকার।

পৃথিবীর চিরশ্রেষ্ঠ আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান কে? এক, ভিভিয়ান রিচার্ডস। দুই, ভিভিয়ান রিচার্ডস। তিন, ভিভিয়ান রিচার্ডস।

হ্যাঁ, সানি আর ভিভের ব্যাপারে আমার পাগলামিটাকে রীতিমতো ভয়ঙ্করই বলা যায়। ব্যাটিং নিয়ে এই দুজনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, কত সকাল-রাত যে তর্ক-ঝগড়ায় উত্তপ্ত হয়েছে। বয়সটা এখন নেহাতই বেড়ে গেছে, বছর দশ-পনের আগেও 'বিরোধী পক্ষ'কে মারতে-টারতেও গেছি, এই দুজনের প্রতিই ভালবাসা, আর শ্রদ্ধা থেকেই। এই ভালবাসারই নাম পাগলামি। প্রায় সবাই বলেন, অসুখ। আহা, সুখের অসুখ। গর্বের অসুখ। কোনও ওযুধেই সারার নয়। কে সারাতে চায়? গাভাসকার-রিচার্ডদের হয়ে লড়ে যাওয়ার সুখ আর অহঙ্কার থেকে বঞ্চিত হতে চাইব কোন দুঃখে?

না, ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকারকে নিয়ে আমার এমন কোনও অসুখ নেই। চব্বিশ বছর ধরে প্রায় সব ব্যাটিং রেকর্ডের মালা তাঁর গলায় ওঠা সত্ত্বেও নেই। স্যার নেভিল কার্ডাস কি সাধে স্কোরবোর্ডকে গাধা বলেছিলেন!

ব্যাটিংয়ের মূল চারটে ব্যাপার কী? নিশ্ছিদ্র বয়স। প্রয়োজনে নির্দয় আক্রমণ। চাপ, প্রতিকূলতার রুদ্ধদ্বার চূর্ণ করার লড়াই। এবং বিদেশে সাফল্য। প্রথম ও চতুর্থ ক্ষেত্রে আবার সেই সানিকেই স্মরণ করতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেটকে যখন পাতে দেওয়া যায় না, দলে দুই-একজনের বেশি যোগ্য সঙ্গী নেই, সেই অবস্থায় সতেরো বছর তিনি দুরন্ত ব্যাটেই শাসন করেছেন পৃথিবীর বাঘা বাঘা ফাস্ট ও স্পিন বোলারদের। সিংহের ডেরায় ঢুকে রান শিকার করেছেন। নিখুঁত রক্ষণ দেখেছি জিওফ বয়কটেরও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অদ্বিতীয় ভিভ। টেস্টে সবথেকে কম বলে সেঞ্চুরিটাও তাঁরই ব্যাট থেকে আসা। বিদেশি উদাহরণ বাদ দিলে এদেশেও সাম্প্রতিক অতীতে বীরেন্দ্র শেহবাগের দাপট দেখেছি। আর তৃতীয় ব্যাপারটা? দল কোণঠাসা, চাপ নিয়ে লড়াই? ভারতীয় ক্রিকেটে শুধু গাভাসকরই নন, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, রাহুল দ্রাবিড়, ভি ভি এস লক্ষ্মণদের নামও আসবে। বিশ্ব ক্রিকেটে স্টিভ ওয়া, ব্রায়ান লারাতেও একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

শচীনকে এই চারটে ব্যাপারের কোথাও এক নম্বরে রাখতে পারছি না। একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই, তাঁর অনেক আগেই খেলাটা ছাড়া উচিত ছিল। পারছেন না, কেন এখনও খেলছেন, আর কবে ছাড়বেন, এমন নির্মম প্রশ্নগুলো শোনার কোনও দরকার ছিল না। সময় জ্ঞানেও ভুল হয়ে গেল, সানি-ভিভরা এসব প্রশ্ন ওঠার সুযোগই দেননি।

তাহলে শচীনের ব্যাটিংয়ের 'অসম্ভব ভক্ত' না হওয়া সত্ত্বেও ক্রিকেট মাঠ থেকে তাঁর চিরবিদায় এই সাংবাদিককেও এত কষ্ট দিচ্ছে কেন? কী সেই জাদু, যাতে বুঁদ হয়ে থাকেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রজার ফেডেরার, উসাইন্ বোল্টও? যা সুধীর, গৌতমের মতো অখ্যাত পাগলকেও শরীরে জাতীয় পতাকা এঁকে সব মাঠে ছুটিয়ে বেড়ায়? ভেবে দেখেছি, অনেক ভেবে দেখেছি, জাদুটার নাম মনুষ্যত্ব। ক্রিকেটার নন, একজন মানুষ যাঁর হাতের ব্যাটের চেয়েও অনেক চওড়া একটা হৃদয় আছে। এখন বুঝতে পারছি, নিজের প্রিয় বিচারক্ষেত্র থেকে এমন একজন মানুষ সরে দাঁড়ালে কতটা কষ্ট হয়।

নিষ্ঠা। সাধনা। আন্তরিকতা। পরিশ্রম। সততা। দেশপ্রেম। বহু ব্যবহারে মলিন, জীর্ণ এই শব্দগুলোর আজও কোনও বিকল্প নেই, শচীনকে বুঝতে গেলে। এই একটা লোক, চল্লিশ পেরিয়েও যাঁর জীবনে ক্রিকেট ছাড়া কিছু নেই। মোটেই চব্বিশ বছর নয়, ক্রিকেটকেই দিয়ে গেলেন প্রায় গোটাটাই। ওয়াংখেড়েতে দাঁড়িয়ে চোখে জল আনা বিদায়ী ভাষণে যতই অঞ্জলিকে জীবনের সেরা পার্টনার বলুন, কোনও সন্দেহ নেই, তিনি শচীনের দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী? ক্রিকেট, নিশ্চিত। আর এই প্রথম বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল একেবারে শৈশবেই। সেই সাহিত্য সহবাস, শিবাজী পার্ক, রোমাঞ্চকর শৈশব-কৈশোরের অন্য সব আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে শুধুই আচরেকারের ট্রেনিংয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা। অসংখ্য শব্দে লেখা হয়েছে তাঁর এই 'জীবন' নিয়ে, বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ক্রিকেটের বাইরে যিনি শচীনের প্রিয়তম ক্রীড়ানায়ক, ছোটবেলা থেকেই যাঁর অন্ধ ভক্ত, সেই বিখ্যাত টেনিস তারকা জন মাকেনরোর একটা কথা শুধু সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই : 'লোকে আমার খ্যাতির আলোটা দেখে। এর পেছনের কাহিনীটা দেখতে পায় না। যে বয়সে ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে,

সিনেমা দেখে, বেড়াতে যায়, সেই বয়সে আমাকে কোর্টেই পড়ে থাকতে হয়েছে রোজ, ১৮ ঘণ্টা! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।' শচীন পড়ে থেকেছেন ক্রিকেট মাঠে। এতদিন। শুধু খেলাই নয়, নিবিড় অনুশীলন। সব রেকর্ড পকেটে নিয়েও এক মিনিটও ফাঁকি দেননি। ব্যক্তিগত সব সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছেন অনায়াসে। তাঁরও কি ইচ্ছে করেনি মুম্বইয়ের মনোরম সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভেলপুরি খেতে? হঠাৎ একটা সিনেমা হলে ঢুকে পড়তে? পারেননি। ইচ্ছেটাকে কঠোর শাসনে দমন করতে হয়েছে। খ্যাতির শুধু আলো নয়, জ্বালাও থাকে।

সুনীল গাভাসকার একবার আড্ডার মাঝে আমাকে বলেছিলেন, যতদিন ভারতের হয়ে খেলেছেন, 'চাল' খাননি। ফ্রায়েড রাইস, বিরিয়ানির প্রশ্নই নেই, সাদা ভাতও নয়! মেদবৃদ্ধির ভয়ে। কলকাতার অভিজাত হোটেলের পার্টিতে একটা দুর্দান্ত চিকেন ফ্রাইয়ের অর্ধেকেরও কম চামচ দিয়ে কেটে মুখে নেবার পর কপিলদেবকে আক্ষেপ করতে শুনেছি: এত সুস্বাদু ফ্রাইও গোটাটা খাওয়া গেল না, দু-দিন পর যে ইডেনে টেস্ট। শচীনকেও এমন অনেক ইচ্ছেকেই ছক্কা মেরে মাঠের বাইরে পাঠাতে হয়েছে।

এখন 'আই পি এল' নামক একটা সার্কাস বাজারে এসেছে। না, কিছুতেই সেটা ক্রিকেট নয়, আমার মতে। এই সার্কাসে অনেক টাকা রোজগার করা যাচ্ছে। অনেকেই দেখছি, এখানে একটু নাম করেই কলার তুলে ঘুরছেন, ফাঁকি দিচ্ছেন অনুশীলন। আর শচীন সব ক্রিকেট মাতিয়েও থেকে গেছেন একইরকম অক্লান্ত। এত মাটির মানুষ। ঔদ্ধত্য নামক কোন ডেলিভারি তাঁর উইকেট নিতে পারেনি। মনে করেছেন দেশের হয়ে খেলাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। রোজগারের কথাটাও উঠল যখন, আর একটা দিক ভেবে দেখুন। কি অর্থ উপার্জন করেছেন, ভারতের আর কোনও ক্রিকেটারের ৯০০ কোটির সম্পদ নেই। প্রচুর হাতছানি, প্রলোভন ছিল, সেও অন্য অনেকের মতো অর্থের অনর্থে নিজেকে ভাসিয়ে যেতে দেননি।

সততা। এটাই শচীনকে বর্ণনা করার সবথেকে উপযুক্ত শব্দ। মহম্মদ আজহারউদ্দিনদের মতো দেশের সম্মান জুয়াড়িদের হাতে বেচে দেননি। তাঁর মাধ্যমে ভারতমাতাকে ধর্ষিত হতে দেননি। তাঁর ব্যাটে সবসময়ই বাধা রয়েছে অদৃশ্য তেরঙা। ক্রিকেট জুয়া, স্পট ফিক্সিং, গড়াপেটার তীব্র বিষে ক্রিকেট তখন নীল, সাদা পোশাকেই তাকে শুদ্ধ করার যুদ্ধ চালিয়েছেন। মাত্র তিনটে অস্ত্র নিয়ে। এক চোখে আগুন, অন্য চোখে স্বপ্ন, আর ওই ছোট্ট বুকটার বিশাল হৃদয়ে জমে থাকা একরাশ পবিত্র ঘৃণা। আমাদের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিলদেবও নিজেকে সন্দেহ এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেননি, সেই সময় তাঁর বাড়ি এবং অফিসে সি বি আই তল্লাসির কথা আমরা ভুলিনি। কিন্তু শচীন এমন একটা ভাবমূর্তি সযত্নে তৈরি করেছিলেন, জুয়াড়িদের সাহসই হয়নি তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষার। ওরা সবথেকে ভাল জানে, কার কাছে টাকার থলি নিয়ে গেলে কাজটা হয়ে যাবে। বিশ্বকাপে দেশ হেরে গেলে যে যন্ত্রণা-কাতর মানুষটা মধ্যরাত পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই বসে থাকেন মাঠের পোশাকেই, খাবার তো দূরের কথা, চা-বিস্কুটও মুখে তোলেন না, জুয়াড়িদের সাধ্য কী তাঁর কাছে ঘেঁষার?

এই পবিত্র দুঃখ, ঘৃণা বাঁচিয়ে রেখেছেন চিরকাল, মরতে দেননি আগুন আর স্বপ্নটাকে। আজ তাই নতমস্তকে কুর্নিশ, এক উচুতলার ক্রিকেটারকে। ভুল লেখা হল, মানুষকে।

'আমরা আমাদের আয়ু বাড়াতে পারি, কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছে তাঁদের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো অনেক বেশি জরুরি।'

স্টিফেন হকিং।

অ্যাডভেঞ্চার

দীপমালা গঙ্গোপাধ্যায়

রূপালী ছিল আমার স্কুলের আর পুতুল খেলার বন্ধু আগেই বলেছি। ওদের 'দেশের বাড়ি' ছিল শ্রীহট্টে আমরা যাকে চলতি কথায় বলি সিলেট। সিলেটের বাঙালীরা যখন তাদের নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করেন তখন আপনার আমার মতো অর্বাচীনেরা, (আপনাকেও দলে নিলাম বলে রাগ করবেন না প্লীজ, কত আর একলা জগাই হয়ে থাকবো বলুন!) যাঁরা জার্মানীর কথা শুধু ছাপার অক্ষরে পড়েছি, অনায়াসে লুক্সেমব্যুর্গে বসে আছি ভাবতে পারতাম। এহেন সিলেটত্বর সঙ্গে মিশে ছিলো নির্ভেজাল অসমীয়া সংস্কৃতি, কারণ ওদের ছোটবেলা কেটেছিল বাঙালীহীন আসামের কোন জায়গায়। ওর দুই দাদা অসমীয়া মিডিয়ামে পড়ে, অসমীয়া কালচারে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছিল। ওর বাবা মায়ের ইচ্ছেতে শেষের দুটির ওপর চলল বঙ্গ সংস্কৃতির স্টীম রোলার। সিলাইট্যা আর অসইম্যা (এর একটাও কিন্তু হতচ্ছেদ্দার উচ্চারণ নয়, ওঠাই ছিলো স্বাভাবিক টার্ম)-র মিশেলের সঙ্গে ওরা যখন প্রচলিত ঢাকাইয়্যা মিশিয়ে কথা বলার চেষ্টা করত সে যে কি বেদনাদায়ক হত জাস্ট ভাবা যাবে না। রূপালীর বড়ো দাদা তার অকাল এবং অটুট গাম্ভীর্য নিয়ে আলাদা একটা সৌরমণ্ডলে বিরাজ করতো এবং স্কুলে ফার্স্ট হত। মেজোদাদা টুটু ছিল রেলপুলিশের প্রবল প্রতাপান্বিত মেজোবাবুর জীবনে সৌরকলঙ্ক। যতসব হতে পারে ভবিষ্যৎ আসামীর সঙ্গী ছিল সে। এত বছর পরে ভাবি দাদাকে নিয়ে বাবা মায়ের আদিখ্যেতার প্রতিবাদ বোধহয় ও করেছিল এইভাবেই। আমার মা কেবল স্বাতী কাকিমাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন যা শুনে শুনে কাকিমা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়তেন। তখন শীতের ছুটি চলছে। দিনের বেলা মাথায় দেওয়া নারকোল তেল রাতে জমে চুল শক্ত দড়ির মতো হয়ে উঠত, আর তাকে গলাবার জন্য রোদে বসাটা আবশ্যিক ছিল। বাগানের বেড়াটাকে মাঝখানে রেখে পাশের বাড়ির ছোড়দার সঙ্গে ওরই দেওয়া কমলালেবু খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময়ে রূপালী এসে বলল মাকে নিয়ে তক্ষুনি ওদের বাড়ি যেতে কারণ টুটু নাকি টাকা পয়সা গয়নাগাটি নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। তখন সদ্য ফেলুদা ধরেছি। রহস্যের গন্ধ পেয়ে কমলালেবুর খোসাটা ছোড়দার হাতেই ধরিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মা-ও তক্ষুণি আসবে বলল। গিয়ে দেখি যে-ঘটনাটা অত্যন্ত গোপনীয় বলে রূপালী আমাকে নিয়ে এল সেখানে অন্তত জনা কুড়ি আর ওর মা একটা সাংঘাতিক রকম বিলাপ করছেন। ছেলে আর গয়নার মধ্যে কার শোকটা বেশি জানতে চাইলে আমি কিন্তু টেনশনে পড়ে যাব। দেখা গেল একটা বিরাট কাঠের বাক্সে কাকিমার গয়নার কৌটোটা যেখানে থাকতো সে জায়গাটা ফাঁকা আর গাদাগুচ্ছের লেপ-কম্বল ওলট-পালট করা। ওই ছেলেকে হাতে পেলে কি করা উচিৎ তার এত রকম পরামর্শ চারদিক থেকে আসতে লাগল যে আমার মনে হয় রেল-পুলিসের মেজবাবুর নিজের বহু 'থার্ড ডিগ্রী' প্রদানের অভিজ্ঞতা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করেছিল। একটা সময় কাকিমা কাঁদতে কাঁদতে আর আমার মা সান্ত্বনা দিতে দিতে ক্লান্ত হওয়াতে মা চলে এল এর পরেও ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে এবং এক মাথা চিন্তা নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে রূপালী আবার এল টুটুর ফিরে আসার খবর নিয়ে। ওর বাবা কারুর কাছ থেকে খবর পেয়ে পাশের স্টেশন বালিপাড়ার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখেন একটা বটগাছের নীচের বেদীতে টুটু বসে আছে (তখন ওর মুখ দেখে ওর উদ্দেশ্য ওর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার তখনো ছিল না, আজও নয়)। উনি নাকি কোন কথা না বলে টুটুর ঘোঁটিটা ধরে বলেছিলেন 'চল্' এবং টুটু বিনা বাক্যব্যয়ে পিতৃবাক্য পালনকরতঃ বম্বে না গিয়ে বাড়িতে ফিরেছিল। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কাকিমা ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন গয়নার বাক্সর কথা। ও বিনা দ্বিধায় সেই কাঠের বাক্সর অনেকটা নীচ থেকে গয়নার বাক্স বের করে দিয়েছিল। ক'দিন পরে টুটুকে বাক্সরহস্যের কথা জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল যে, ও ভেবেছিল যতক্ষণ ওর মা-বাবা মন দিয়ে গয়নার বাক্স খুঁজবেন ও ততক্ষণে পগার পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ওদের যে এটুকুও ধৈর্য নেই আর সেইজন্য ওকে আবার ফিরে আসতে হল!

এতটা পড়ে আপনাদের মনে নিশ্চয়ই চিন্তা হচ্ছে সেদিন বাবা টুটুকে কত ডিগ্রী দিয়েছিলেন? ওর বাবা নাকি সেদিন ওর গায়ে হাত তোলেননি, শুধু ওর হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। টুটু আর কোনদিন দুষ্টুমি করেনি বলেই জানি। ওর যত উগ্রতা আর অবাধ্যপনা বাবার চোখের জলে সঙ্গে কোথাও একটা ভেসে গিয়েছিল।

সুশীলবাবুর আংটি

মল্লার দাশগুপ্ত

উত্তর কলকাতার এক পুরনো বনেদী পাড়ায় বাস সুশীলবাবুর অর্থাৎ সুশীল ঘোষালের। অকৃতদার এই সুশীলবাবুর একমাত্র ভরসা তার বহু পুরনো ভৃত্য নিমাই। এছাড়া রাঁধুনী জয়দেব ধর ও চৌকিদার রহিম শেখের রাত দশটায় কাজ সেরে বাড়ি ফেরা অভ্যাস। সুশীলবাবুর পেশা ও নেশা হল ওকালতি করা। ওখানকার মস্ত বড় উকিল তিনি। তার পিতা সুবোধ ঘোষালও ছিলেন নামজাদা উকিল, লোকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। তার সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল দুর্গবাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব সুশীলবাবুরই। দ্বাররক্ষকেরও দরকার পরে বাড়ির দেখাশোনার কাজে। ওকালতি ছাড়াও এক বিশেষ বিষয়ে সুশীলবাবুর অসীম আগ্রহ আছে, সেটা হল ইতিহাস। তিনি বহুদিন ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন যা তার ভৃত্য নিমাই ছাড়া আর কেউই বিশেষ জানে না। অথচ এই সকলের শ্রদ্ধেয় ষাট বছর বয়সের সুশীলবাবু যিনি এতকাল ধরে আদালতে বহু আসামীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, একবার ইতিহাসের প্রকোপে পড়েই তার জীবন বিপন্ন হচ্ছিল। সেদিন তার কেন জানি না নিলাম বাজারটা ঘুরে দেখার ইচ্ছা জাগল। সেদিন নিলাম বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গণেশজীর মূর্তি, মহীশূরের কোনো এক রাজার ব্যবহৃত পিস্তল, ইত্যাদি, যার প্রতি সুশীলবাবুর বিশেষ আগ্রহ নেই। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর দোকানদারের হাতে এল কোনো এক কালেক্টর সাহেবের সাধের সোনার আংটি। এই আংটি দেখে সুশীলবাবুর মন চাইল আংটিটা পেতে এবং ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলেন সে আংটি তিনি। বাড়ি ফিরে অত্যন্ত সাবধানে তিনি তার শোকেসে আংটিটা সাজিয়ে রেখে দিলেন। যদিও আংটিটা এক ঝলক দেখেই বোঝা যায় যে আংটিটা সোনার, তবুও নিমাই, জয়দেব বা রহিম খুবই বিশ্বস্ত, এবং কারোরই ঐতিহাসিক জিনিস সম্পর্কে তেমন আগ্রহ নেই। চৌকিদার রহিমের উপস্থিতিতে এ জিনিস চুরি করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন কোর্ট থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল সুশীলবাবুর। ফেরবার পথে শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। বাড়ির সামনে তার এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যদিও সাহেব সম্পূর্ণ এক অচেনা অজানা ব্যক্তি, তবুও সাহেবের শোচনীয় অবস্থা দেখে তার অত্যন্ত দয়া হল। তাকে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে এলেন। বসার ঘরে বসে শোকেসে সাজানো আংটিটার দিকে চোখ পড়তেই সাহেব উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং বলল ওটি তার অত্যন্ত চেনা। সুশীলবাবু ভাবলেন, ভালই হবে, আংটিটার সঙ্গে যে ইতিহাস জড়িত তাও জানা হয়ে যাবে। সাহেব বললেন যে, তার বেশ ভালোভাবেই ইতিহাসটা জানা আছে। নিমাইকে ডেকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বেশ করে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সাহেবকে অফার করতেই তিনি বললেন যে, তার ওসব চলে না। এবার শুরু হল গল্প। সাহেবের মুখে তিনি শুনলেন যে তার আংটির সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনকার সময়ে কালেক্টর সাহেব ছিলেন এক মস্ত ধনী ব্যক্তি। তার পিতার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি রেখে দিয়েছিলেন সে আংটি। সেই আংটি যার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল সেই ড্যান ব্রাভোর সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেওয়ায় সেই আংটির প্রতি তার লোভ জন্মেছিল। তাই তা হাতানোর চেষ্টায় সে কালেক্টর সাহেবকে খুন করে আংটি হাতানোর সময় ধরা পড়ে যায় এবং এক নির্দোষ ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সত্যিই তো, সোনালী রঙের আংটির ভিতরে খোদাই করা ড্যান ব্রাভোর নামটা তার আগেই চোখে পড়েছিল। যাওয়ার সময় সুশীলবাবুর হঠাৎ মনে হল সাহেবের নামটা তো জানা হল না। যদিও পরিচয়ের শেষে নাম জিগ্যেস করা অত্যন্ত লজ্জাজনক, তবুও সুশীলবাবু জিগ্যেস করে বসলেন, 'আপনার নামটা কী?' উত্তরে সাহেবটি বলল, 'কেন, ড্যান ব্রাভো''। দপ্ করে ঘরের বাতিটা নিভে গেল।

'বিশ্বজগৎটাকে যে বোঝা যায়, সেটাই তো তার সবচেয়ে বড়ো রহস্য।'

আলবার্ট আইনস্টাইন।

আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের সূত্রপাত : বেকন ও দেকার্ত

আশীষ লাহিড়ী

ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) আর রনে দেকার্ত (René Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০) সেই লড়াইয়ের দুই পুরোধা পুরুষ। দুজনের পদ্ধতি আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। কী করলে আহরিত জ্ঞানকে একটা শক্তপোক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপন করা যায়; কী করলে তা এলোমেলো, নিয়মহারা দূরকল্পনার সাপেক্ষে নিজের নিশ্ছিদ্র স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে; কী করলে অন্ধ কুসংস্কার কিংবা অমূলক কল্পনার বিপরীতে তা অকাট্য এবং অবশ্যগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হবে।

দেকার্তের কালজয়ী গ্রন্থ পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা (ফরাসি থেকে অনুবাদ: লোকনাথ ভট্টাচার্য) থেকে একটুখানি উদ্ধৃতি দিলে আপ্তবাদী দর্শনের আওতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানের এই লড়াইয়ের মূল সুরটি চেনা যাবে। দেকার্ত বলছেন:

> যখন দেখি বহু শতাব্দী ধরে অসাধারণ চিন্তাবিদদের চর্চা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত (১৬৩৭) দর্শন কোনো বিষয়েই বিতর্কের অবকাশ তুলতে পারল না, অর্থাৎ দর্শনে এমন কিছুই নেই যার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা চলে, তখন সে ক্ষেত্রেও কোনো সাফল্যের আশা করার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার থাকে না। শুধু তাই নয়, যখন দেখি একই বিষয়ে কত মুনির কত মত, যদিও তার একটিও কখনো সত্য নয়, তখন যা কিছু সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, তাকে প্রায় মিথ্যাই বলতে হবে আমাকে।[১]

বেশ চমকে দেওয়ার মতো কথা বললেন দেকার্ত। এতদিন ধরে অপ্রমাণিত কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বলে পরিগণিত কিছু ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে আসছিল দর্শন। ফলে, এক একটি বিষয় নিয়ে 'মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ' রচিত হলেও সত্যিকারের কোনো বিতর্ক তুলতে পারেনি দর্শন, বিশেষত খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন। সংশয় বা সন্দেহের প্রবেশ যেখানে নিষেধ, সেখানে প্রকৃত বিতর্ক উঠবে কী করে?

দেকার্ত আরো বলেন—

> অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি যেহেতু দর্শন থেকেই তাদের তত্ত্বসমূহ আহরণ করেছে, এত দুর্বল ভিত্তি দিয়ে মজবুত কিছু খাড়া করা তাদের পক্ষেও তাই সম্ভব নয় বলে মনে করি।...
>
> তাই... শপথ নিলাম কেমাত্র সেই বিজ্ঞানের পিছনে ছুটব এবার যার হদিস মিলতে পারে অন্যত্র নয়, আমার নিজেরই মধ্যে বা পৃথিবী নামক বৃহৎ বিরাট গ্রন্থে...।[২]

মানুষ সমেত যে কোনো প্রাণীকেই দেকার্ত নিছক মেশিন মনে করতেন। এই নির্ভেজাল যান্ত্রিক মানুষ ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র অনুসারে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে। তাই বলে তিনি ঈশ্বর বা বিশ্ব-আত্মা উড়িয়ে দিলেন না। বরং এই কথাই বললেন যে, মানুষের দেহের মধ্যেই এক চেতন শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি বিরাজ করে। মানুষের খুলির ওপরে pineal body বলে যে গ্রন্থি আছে, তারই মাধ্যমে নাকি এই বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাঁর যুক্তি এই যে ওই গ্রন্থিটি অন্য কোনা কাজ করে না। (আজ আমরা জানি, ওই pineal body আমাদের সরীসৃপ জাতীয় পূর্বপুরুষদের অধুনা-নিষ্ক্রিয় চক্ষুর থেকে-যাওয়া চিহ্ন। অতএব দেকার্তের ওই অনুমানটি নিশ্চিতভাবেই ভুল।)

দেকার্ত আমাদের দৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগে রাখলেন বস্তুগঠিত জগৎকে, অন্য ভাগে রাখলেন অনুভূতির জগৎকে। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি বলবিজ্ঞান ও জ্যামিতির আওতায় নিয়ে এলেন। আর আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম এবং ভক্তির অঙ্গনটিকে 'দিব্যজ্ঞান'-এর আওতায় ফেললেন। এই যে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ এত স্পষ্টভাবে করে দিলেন তিনি, এরই ফলে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নির্বিঘ্নে ধর্মের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন। তবে এই 'দ্বৈতবাদ' নানারকম সমস্যারও সৃষ্টি করে, বলাই বাহুল্য। তবু, ওই সময়ে এই কাজটি না করলে চার্চের দৌরাত্ম্য থেকে বিজ্ঞান রেহাই পেত না, এটা নিশ্চিত। গ্যালিলিওর দশা তো তিনি নিজেই দেখে গিয়েছিলেন।

আর বেকন? ইংরেজ-সুলভ কেজো মনোভাব নিয়ে তিনি সমস্যাটার টুটি চেপে ধরলেন। *Novum Organum* (যে-বইটিকে ক্লাসে পাঠ্য করার জন্য লড়াই করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) বইয়ের প্রথম বাক্যটিতেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

> কোনো কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়ম এমনভাবে রচনা করেন যেন তা নিয়ে আগে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে, যেন সে বিষয়ে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট, ... তাঁরা দর্শনের এবং বিজ্ঞানসমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন। কেননা, বিশ্বাস উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করে তাঁরা অন্বেষণকে পরিতৃপ্ত ও নিরস্ত করেছেন।

আর এক দল আছেন, যাঁদের মন্ত্র হল: জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। এঁদের সম্বন্ধে বেকনের অভিযোগ: এঁরা সঠিক সূত্রের ভিত্তি থেকে যুক্তি গঠন করেননি, সঠিক সিদ্ধান্তেও অবিচল থাকতে পারেননি।

উদ্দীপনা আর আবেগই এঁদের টেনে নিয়ে গেছে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তিনি বললেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যাপারটা নিছক মানসিক ব্যায়াম নয়, শুধুই যুক্তির কসরত নয়। মাটিতে নেমে দুহাতে মাটি না চটকালে কখনোই মাটির মধ্যে সত্যি সত্যি কী আছে সেটা জানা সম্ভব নয়।

বেকনের সঙ্গে দেকার্তের চিন্তাভাবনার ফারাক বিস্তর। গণিত-ভিত্তিক দর্শন, যাতে দেকার্ত ছিলেন বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে বেকনের আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রটি প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান। প্রাচীন দার্শনিকরা কোন কোন কারণে ভ্রান্তির বিচিত্র ছলনাজালে (যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'Idols') জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা বিশ্লেষণ করেন তিনি এবং তার একটি তালিকাও উপস্থিত করেন। তিনি মনে করতেন, ওই ভ্রান্তির ছলনাজাল থেকে মুক্ত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজাতে পারলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। সংগৃহীত তথ্য থেকে বিমূর্তীকরণের মারফত, এবং বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সরলীকরণের মারফত তত্ত্বে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি, যদিও গ্যালিলিও ইতিমধ্যেই ওই প্রণালীর অসাধারণ প্রয়োগের নমুনা হাজির করেছিলেন। বেকনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুসংগঠিত এবং উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত একদল গবেষকের গবেষণা থেকে যেসব তথ্য জানা যাবে, তারই সাহায্যে অবশেষে সত্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে। এক কথায়, তিনি মূলত আরোহী (inductive) পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। অপর দিকে, দেকার্ত বিশ্বাস করতেন অবরোহী (deductive) প্রণালীতে। তাঁর মতে, চিন্তাভাবনার ভিত যদি পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে যা কিছু বাস্তবে জানা সম্ভব সে সমস্তই জানা যাবে। তার জন্য প্রতি পদে পরীক্ষানিরীক্ষার আশ্রয় নেওয়ার ওপর তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে বেকন আর দেকার্ত ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। এঁদের দুজনের হাতেই আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনের সূত্রপাত ঘটে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. রনে দেকার্ত, *পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা* (অনুবাদ লোকনাথ ভট্টাচার্য্য), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬।
২. ঐ, পৃ. ২৬-২৭।

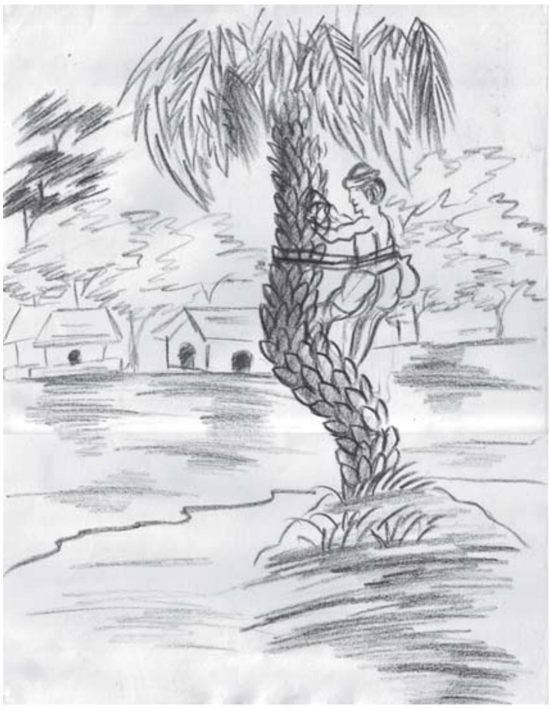

অনন্যা কর (পঞ্চম শ্রেণী)

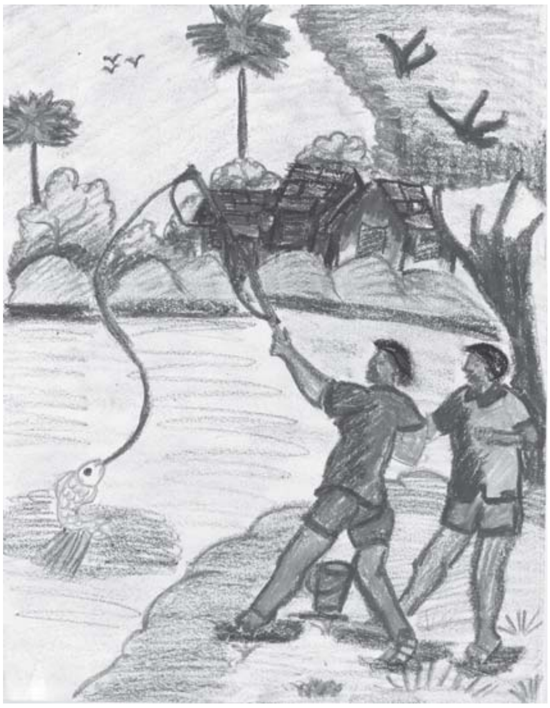

ইন্দ্রায়ুধ কুন্ডু (তৃতীয় শ্রেণী)

Technical Education

Prof. Md. Ismail

Technical Education plays a vital role in the development of a country. India is an agro-based country where nearly 70% of the population is engaged in agriculture. This is not a good sign for a country. It shows that the living standard of nearly 65% people is very low in comparison to population of developed countries. We can improve the standard of living of the people by linking the economy with the agriculture as well as the industries. The industries can provide jobs to a large number of people which will reduce the pressure of employment on agricultural sector. Agricultural production can be increased considerably by using modern methods including the use of machines and implements. India can feed its people properly if Industries and agriculture both are allowed to grow. To achieve this goal, therefore, the country requires good quality of Technical Education.

The technically qualified persons can bring the revolution in Industrial production as well as the agricultural production. It has already been identified that there should be three categories of the Technical persons for industrial growth:

(1) Engineers–Degree Holders and above.

(2) Technicians–Diploma Holders.

(3) Skilled workers–ITI and certificate courses.

The graduate and post graduate engineers should be trained to show the industries the right path so that it does not become sick in due course. As such the engineers should have the vision. The syllabi should be designed in such a manner that the engineers become conversant with the theoretical as well as practical aspects. They must be encouraged to develop entrepreneurship. The universities should design the curriculum and syllabus to produce engineers equipped with theoretical as well as practical knowledge and with vision and not just theoretically trained engineers on mass scale.

The diploma engineers passing from the polytechnics have to work between engineers and skilled workers. Hence they should have sound practical knowledge. Syllabi of polytechnics must give more emphasis on practical, and give less weightage to the theoretical subjects. But now a days, the quality of Technical Education has downward mobility which is a dangerous trend. If this trend is not arrested in time, then the Degree Engineers and Diploma Engineers from most of the colleges will become burden on the country and it will have disastrous consequence.

This trend can be arrested by–

(1) Framing and implementing the rule of minimum 75% attendance.

(2) Holding the theoretical and practical classes properly.

(3) Preventing the use of unfair means in the examinations.

(4) Closing the Degree and Diploma colleges having insufficient Infra-structure.

(5) Updating the faculty by sending them for short term training in reputed organizations.

(6) Creating the opportunity for employment.

The employment opportunity can be created by active support of the state governments and the central government to the Industrialists and the enterprisers. If the engineers are employed properly then the fate of the country will be drastically changed. The villages and cities may be developed by utilizing the services of Technically qualified persons and with proper monitoring without fear and favour.

There are 638,588 villages in India and nearly 238,054 gram panchayats and in West Bengal has 40782 villages and 3351 gram panchayats. Our villages are required to be advanced along the path of development. This can be done by appointing four types of engineers in each gram panchayat.

(1) Civil Engineer–He has to look after the Irrigation, village road construction, supervision of house financed by Central Government water preservation etc.

(2) Surveyor–His main job will be demarcation of land for different projects and measurement of land for peaceful settlement of the land disputes.

(3) Mechanical Engineer–To promote the small scale Industries and to work as a consultant and marketing Manager. He has to look after the workshops for repairing the agricultural equipments.

(4) Electrical Engineer–To keep the Infrastructure ready for supply of Electricity. In village, the electric supply remains disrupted months after months due to faulty transformer and there is none to take care of it. Electrical Engineer must be conversant in Non-Conventional Energy for handling solar energy and other forms of energy.

The Technical Education should be revamped to make our Degree and Diploma Engineers specialized in certain fields. There is no need to teach a large number of subjects which have no application in practical life. The need of the hour is the specializations. Our students are taught a number of irrelevant subjects which make the students "Jack of all trades" with very little depth. This concept has to be changed.

Let us hope that a day will come when our technical persons will become expert in their fields and will serve the nation with dedication.

INDEPENDENCE DAY

Devdoot Roy Choudhury

This is the day when many martyrs had shed their blood to bring freedom to our omnipotent Motherland sixty-six years ago in the year 1947. But the moot question is that whether we have really become independent? Are we behaving like a nation that has attained independence 66 years ago?

In this world of globalization, although India has been rescued from the hands of the tyrannic British rulers after almost 200 long years, our Motherland is still not free from numerous heinous crimes or sins. It is regrettable that even after 66 years of independence, our law enforcing authorities are unable to contain these shameful crimes. Patriots like Khudiram Bose, Prafulla Chaki , Bhagat Singh, Sukdev , Rajguru and so on to follow, have laid down their lives with a smile in their faces for the sake of their dearest Motherland. But crimes like rape, murder etc have reached their peak in this so called 'Free India'.

The recent infamous Delhi rape case is an instance of such a social evil. The position of the female folk in India is very much insecure. In the past, women such as Matongini Hazra, Rani Laxmi bai of Jhansi etc have fought for their country's freedom. Unfortunately, we notice that respect for the women folk in India has been reduced to dust over the years. Previously in the ancient ages women like Apala, Lopamudra had been given omnipotence and higher authority. If India is considered to be mother, she is no less disrespected.

We call India to be a 'developing nation'. Is a developing nation measured only at an economic scale? If we can't overcome these social perils we can not stop the downfall of our dear Motherland. If we can not perform the responsibilities bestowed on us as a son of 'Mother India' we are such a 'waste' in the true sense of the term. Therefore, hoping for the very best of our motherland, let us infuse the germ of patriotism in the hearts of every person such that we will have a better country to live in.

MALADIES OF ENGINEERING EDUCATION IN WEST BENGAL

Prof. Indra N Sinha

ABSTRACT: Over the last two decades degree level engineering colleges have mushroomed all over West Bengal. This Paper attempts to assess the present scenario of engineering education in the state against a holistic perspective. A rudimentary assessment of the causes behind its poor state is presented. General suggestions are put forward for improving the overall situation.

Keywords: Engineering Education, West Bengal, Quality Education.

1. INTRODUCTION

Breaking the prevailing unwritten protocol in the academic circle the author would begin by being personal. He got the first taste of higher technical education when he took admission in an engineering institute of West Bengal. That was way back in 1977. Ever since his completion of post graduation in 1984 from another institute, – an over-hyped Institute of National Importance, he has been in the profession of inculcating knowledge. That way he has been living in the milieu of higher technical education for the last three decades, most part of the first two in a central institute and about ten years in a state university in West Bengal.

The author returned to his parent state in December 2004, – post tsunami, to look after the registry of a fledgling technological university. The euphoria of home-coming turned into crude shocks as he realised the all pervading game of pretention going on all over West Bengal. The teachers pretended to teach the students and the students pretended to learn. Work culture took its leave and didn't bother to return to duty. Persons at every echelon took (and still take) shelter behind the cushion of protection provided by the political system, making enforcement of accountability difficult, if not impossible. What pained the author most was the ineptitude and lack of objectivity in persons of authority. Finding himself an absolute misfit in the socio-political ambience and having suffered severe ignominy for two long years, the author returned to where he belongs, - the profession of teaching.

AAt that time the author was in a pensive mood and he wrote something about prevailing academic environment in the state, in respect of higher technical education. What is presented here is an updated version of those scribbles.

2. FRESHMEN QUALITY

In West Bengal, neither the parents nor the schools are interested in education. So the order of the day is literacy, advanced literacy and more advanced literacy. Education — 'the manifestation of perfection in man' has no place in the system, so inculcation of values should better be forgotten. Most of the school-teachers are worse than clerks in writers' buildings. They lack both acumen and attitude. Persons occupying positions in the governing bodies of the Schools dance to the tunes of their political masters to whom they owe their positions. The situation is no different in 'Secondary Education Board' or in 'Higher Secondary Council'. Getting marks in Madhyamik/ Higher Secondary has become much easier. An overwhelming majority of the Schools lack basic infrastructure in sports and culture. At school level neither there is pleasure of learning nor any pressure for learning. Sub-mediocrity is nurtured by the system. For the above-par students, cracking JEE is the principal goal. With effect from 2006, WBJEE has become a joke. No attempt is made to test of a candidate's ability to think logically and resolve problems. So the inputs to higher technical education are self-centred individuals not interested in studies. Only goal is to get a degree.

Society and Environment do not help them much; people of West Bengal are more arrogant, less informed, unreasonably complacent and generally non-performers. They are only good at passing the buck. A student before and after entering an engineering

college (including JU and BESU) lives in this social surrounding. The society therefore does not teach them many a right thing.

3. INTELLECTUAL IMPOVERISHMENT

As the students enter engineering colleges (based on the circumstantial evidences available to him the author is inclined to believe that some of them enter through forgery) the teachers follow a two pronged strategy — subject them to academic impoverishment and ignore them socially. In the guise of 'ragging-prevention' a ghetto culture in encouraged to be developed. While private engineering colleges run basic course in science by teachers drawn from colleges on hourly rental basis (sorry for using a term in a different trade) in govt engineering colleges such courses are offered by juniors, - even by guest faculty. Courses of Jurassic era are offered to the students. At high profile institutes like JU and BESU, the esteemed Professors have better jobs to do; - to teach post-graduate students and to carry out researches. Some of them indulge in earning a few extra nickels-and-dimes by delivering lectures at private engineering colleges. So the students' intellect is not taxed. Cutting across the high-low profile barrier the system fails measurably in giving technical orientation to the basic science subjects. Syllabus is seldom completed. Number of classes held per semester is much less than what is desired. That is one of the reasons for which teachers do not furnish attendance records. The entire process of attendance monitoring has been reduced into a mockery. Inculcation of hard skill has taken a back seat at both JU and BESU; situations in other institutes are easily understandable. Teachers are mostly interested in paper publication, foreign trip, post-doc fellowships. Someone has rightly said *'A university is what a college becomes when its teachers lose interest in students'*.

4. TEACHING-LEARNING TAKES BACK-SEAT

Teaching is a non-priority activity. As the maxim goes — the principal job of a teacher is to '*take the horse to the water and make it thirsty*'. More often than not, the teachers forget the thirst-component and take little interest in generating academic interest in young minds. Language is another barrier. You don't expect a student to take interest in 'Engineering Mechanics' if 'Timoshenko and Young' needs to be understood with the help of a dictionary. And the dictionary too is often not of much help.

Examination is a cruel joke! There are institutes where the job responsibilities of teachers include dictating answers during examinations. For the elite institutes the situation is only marginally different. They try to maintain a semblance of order, albeit, only outwardly. Significant portions of the courseware are suitably scribbled on the desks and walls. Hard copies are dumped in toilets. Cheating is rampant. Invigilators are not interested in discharging their duties properly. Over-marking is the order of the day. In the process neither performance is rewarded nor are non-performers taken to tasks. Punitive/ deterrent measures are slackened to great extents, so-much-so that a student can appear in supplementary examination after getting caught cheating in the regular examination. People day-dream of becoming world-class institutes but refuse to be painstaking in carrying out simple academic duties.

5. SELLER'S MARKET ? NO THE EQUATION IS CHANGING

Students enter engineering colleges underprepared and they graduate half-baked. In the prevailing non-academic environment, students pass their precious four years adding little to their knowledge and acumen. They go out unemployable but yet, thanks to the prevailing seller's market, get employment in sector-V as software babus. This author has access to first hand information from numerous employers. While minor divergence of opinion exists, almost all of them have been consistent, at least in two aspect in their assessment of engineering graduates churned out from the state, – that the students have severe knowledge shortfall and they lack in basic soft skills too. But the think-tank refuses to pay any heed. Students are never encouraged to dream or to aspire. As

a result, amongst the many things missing in them is an '*urge to accomplish'*. A dignified clerk's job in the IT sector is often the goal. That will allow them 'মাছ ভাত' (rice with fish curry) and 'মার্ক্সবাদ' (Marxism).

Somehow or the other the global IT bubble burst of 2000 didn't lead to much retrenchment in India; it mostly led to continued benching. But the recession in IT sector, coupled with plummeting economic growth rate in India took its toll, the head-hunting (yes that's the term the recruiters use) is at low ebb. Many fresh graduates are unable to get placed. As the reward is less, there is consequent fall in craze for getting admissions in xyz institutes. So the admission to 'n' number of engineering colleges takes place in rounds and rounds and rounds. Situation came to such a pass that in 2012-13 even after fourth round of counselling huge number of seats remained vacant. So the hitherto profitable business of engineering education found itself in a difficult situation. The state government came to its rescue and issued notifications for admitting students through direct admission by these 'education-business' outfits. At the enticement of making their wards engineers, parents/ guardians, - many of them coming from rural Bengal and neighbouring states of Jharkhand and Bihar, get duped of their hard earned money. Below-the-table exchanges made for such 'direct' admissions are not really negligible.

6. FURTHER MALADIES

Before the start of this blooming private business, engineering colleges were mostly residential. Jadavpur was a notable exception. As engineering colleges mushroomed and men of straw found access to managing committees, myopic decisions were taken by these bodies. A blunder, for example, was the decision to convert B.E.College/ BESU to a non-residential Institute. It has taken its toll. This author came from a village and having stayed with the students from Calcutta and suburbs got a little urbanised. Although soft skill development was not considered a *sine-qua-non* during the eighties, a lot of that used to get inculcated through its environmental settings. Today soft skill is a must and the institutes are not doing much to develop the same. Hard skill gets you an interview but you require soft-skills to get a job and to retain the same.

7. HALLOWED ELITES OR THE HOLLOW ONES?

The so-called elite institutes under the state's ambit are sliding in their all India rankings. Insiders know that the Institutes are not performing to their potential, but they garner happiness from the fact that 'Biswamitra Engineering College' is perhaps worse. Establishment of WBUT had its magic-spell over JU/ BEC. The postgraduate courses are running and a few hapless lecturers of non-descript engineering colleges have enrolled as part-time PhD scholars. The problem is these scholars, even after acquiring their PhDs, will contribute little towards advancement of knowledge. The supervisors will of-course claim to have produced a number of PhDs. Dilution of standard is the name of the game.

Sub-mediocrity of the think tank has hurt these institutes hard. Take the case of BESU for example. Once it became an autonomous deemed university it entered into an thoughtless expansion spree. And then, for no obvious reason, the deemed university was transformed into a state university through an Act passed by the WB assembly. The BESU Act 2004 is an ill-conceived one. Deemed university was a much better option. At least that provided some watchdog mechanism to union Govt. But if at all it was to become a state-university it should have been made a unitary technological university. It should become a unitary university (with or without the INI tag) with the University Court (General Council), Board of Governors (Executive Council) and Academic Council (Senate) as the principal authorities. EC should discharge the functions of an executive board and let Academic Council (Senate) discharge all academic functions and responsibilities. The concept of Faculty Councils in its present form is non implementable and is bound to be a source of perpetual problem with disjointed functioning.

The General administration in these elite institutes beggars description. No serious

endeavours towards management-capacity-building are undertaken. With the change of guard in the state, the university laws were amended with the stated purpose of reducing political interference. But habits die hard and the university laws were further amended to hold the state's sway in important matters including Vice Chancellor's appointment. Taking advantage of the amended law attempt was made to remove a Vice-Chancellor by branding him dishonest. The author from his personal knowledge knows that honesty of the person is vouch-safe; he stood his ground and the politicians had rotten egg on their face. But what suffered most, was the academics. In the recent past a well intended VC thought he had enough and called it quits. There was only a feeble murmur of disappointment and no serious attempt was there to hold him back. Through their individual efforts, a Registrar here or a Controller there, tried to put in systems that work. But they could do little against an imposing inert ambience, the administrative structure in most of the govt./ autonomous institute stand fundamentally flawed and ineffective. Add to that the flock of inefficient and inept individuals and you get what administration of these institutions is.

Men of straw get promotion because of their seniority only. In the process they play decisive roles in important bodies. Composition of Faculty Councils and Executive Council are anything but well intended. Most of the persona grata at the top are essentially 'frogs in the well' put in place by the state-government at the insistence of the ruling political party. They do not understand the outside world and the opportunities and challenges offered by it. Low levels of thought lead to bad decisions. Talks are often centred around persons rather than policies.

8. CONCLUSIVE REMARKS

Thoughtless expansion has stressed the system to the point of plastic deformation. It is necessary that a long term view is taken. As of now there should be a complete moratorium on any academic expansion in any institution where infrastructure shortfall exists in relation to existing programmes. The need of the hour is to consolidate. Residential character of engineering education needs to be restored, primacy of teaching is to be brought back, academic ambience needs to be created, campus life needs to be made vibrant, open responsive administrative systems are to be put in place, syllabi need continual improvement. There is a handful of agenda. But turning the desires into reality would require dedicated team-work led by visionary academicians.

The author could go on and on. But if the reader, with all his/ her patience and forbearing, has read this far of this rather emotive article, - not too well written, he/ she has, with all probability, understood the author's views. Comments are welcome.

নিরাজ সাউ (পঞ্চম শ্রেণী)

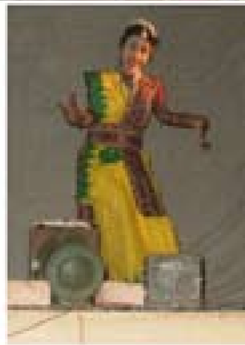

বাৎসরিক
অনুষ্ঠান
২০১২

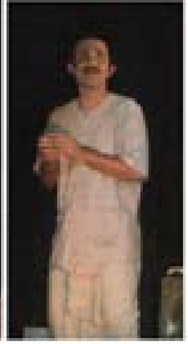

বাৎসরিক অনুষ্ঠান

২০১২

নাটক

সত্যি ভূতের গপ্পো

কবিতা

তাজমহল

ডাঃ ডি. এন. ঘোষ

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি অত্যাশ্চর্য,
যাহা সম্রাট শাজাহানের গৌরবের একান্ত ঐশ্বর্য—
তাজমহল
পাথর না, তিলোত্তমা তাজ বেগমের
আশ্চর্য সুন্দর দুটি লাজুক চোখের
ঘুমন্ত পাতার পরে জুঁই পাপড়ির
দুধ-সাদা ওড়নার মায়া—মলমল,
নরম, নির্মল, মিহি, মসৃণ, কোমল।
জোছনা-শিশিরে ভেজা ফুলের চাদর
অভ্র-পরাগ ঝরা অশ্রু-আতর।
শিলা নয়। স্বপ্নময় তুষার অক্ষরে
কি নিস্তব্ধ সঙ্গীতের ব্যথায় সজল
একটি নিটোল, স্বচ্ছ, প্রেমের গজল।
কে সেই অমর শিল্পী? রাজা শাজাহান?
রাজকোষ তাঁর বটে, এর বেশি নয়,
ঐশ্বর্য কি পারে ছুঁতে স্বর্গের হৃদয়?
ঐ যে কবর ঘিরে শিলা-চাদরের
মসৃণ পর্দাটি, দুধ গরদের
জমিনে বুটির কাজ বলে মনে হয়—
কিনারে সূক্ষ্ম কুচি, ফুল-জরি পাড়,
কোরানের শ্লোকে এই নিখুঁত বাহার।
এই শ্বেত পাথরের জালির ঝরোকা,
কি অপূর্ব কারুকাজ, কত আঁকাজোকা।
দৃষ্টি পিছলে পড়া এই মসৃণতা,
বিপুল বিরাট এই শুভ্র উজ্জ্বলতা,
নিচে নীল যমুনার শান্ত নির্জনতা।
সম্রাট শাজাহান মাথা খুঁড়লেও
আনতে কি পারতেন কল্পনাতেও
এমন ধ্যানের ভাষা শাহী মগজেতে?
এমন শিল্পবোধ, রুচির বিচার?
এ নির্ভুল মাপ-জোক রূপ ও রেখার?
শাজাহান কবি নন—কবি ছিলো তারা
মানসের কাচে এর ছায়া দেখে যারা
ডুব দিয়ে ভাষাতীত রূপের গভীরে
ছবিতে ধরেছে তারে এঁকেছে রেখায়,
নরম বাটালি ধরে নখের ডগায়।
মৌনকে দিয়েছে ভাষা, স্বর্গকে ধরেছে।
পাথরের বুকে তারে কয়েদ করেছে।
অনেক চোখের জল, অনেক বেদনা
অনেক ঘামের স্রোতে পচে গলে গলে
তাজের করেছে সৃষ্টি, তারা গেছে চলে।
ডুবে গেছে ইতিহাসে তাহাদের নাম
তাদের প্রাণের মূল্যে পেয়েছে ইনাম
বাদশাহ শাজাহান। আত্মার আকাশ
প্রেমের নির্যাসে ধুয়ে, স্বপ্নের আলোকে
তারাই গড়েছে মুক্তা তাজের নোলকে।
কুর্নিশ জানাই তাদের-ই সকলকে।।

তিনটি অণুকবিতা

সমু

১

বুকে কথা মুখে না-কথা
সকল অনীহার মাঝে
শুধু তোমারই দেখা
তবু স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর
তোমার-আমার বিভেদরেখা!

২

সন্ধ্যেবেলা
কাছে বসি স্বপ্নে ভাসি
বৃথা সব যুক্তি
শব্দ খুঁজে মরে নিজেই নিজের মুক্তি
পূর্ণ বাক্য অথচ অর্থে অর্ধ
বোঝানো দুঃসাধ্য!

৩

বুক ভরা আশা
মন ভরে ভালোবাসা
চোখ ভেজা জলে
হারিয়ে তুমি যাবেই
নিমেষ কালের অতলে!

দাঁড়াও পথিকবর

কনক কুমার ঘোষ

মূল্যবোধের চতুষ্পদ মৃতদেহ।
গাড়ী রাখার জন্য নির্দিষ্ট চব্বিশ বর্গফুট
ঘাসজমির উপর পড়েছিল কতক্ষণ।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত,
তারপর ভোরের প্রতীক্ষায়—।
সীমাহীন মমতাহীনতার মধ্যে
প্রাণিটার একক, ব্যতিক্রমী অস্তিত্বের বার্তা
বয়ে ফিরেছিল শুধু Housing-এর বিষণ্ণ বাতাস
ওর হাতেগোনা কিছু গুণগ্রাহীর জন্য—
'দাঁড়াও পথিকবর'।।

খাবার নিয়ে প্রাত্যহিক কাড়াকাড়ির সময়
ওর ক্ষুধা নিয়েও অপেক্ষা করে থাকত দূরে
যদি ওর জন্য কিছু বাঁচে সবার খাবার পর
যে আশা, বলাই বাহুল্য, সফল হয়েছে কদাচিৎ।
নিজের রসদ ও কিন্তু অকাতরে ভাগ করেছে
ক্ষুধার্ত সাথীদের সাথে;
সাগ্রহে নিয়েছে ওদের অনাহারের ভাগ
প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা কখনো না রেখে।
কে যেন ওর নাম রেখেছিল 'সাহেব'
বোধ হয় ওর unique মর্যাদাবোধের স্বীকৃতি হিসাবে।
ও আঘাত সয়েছে, কিন্তু,
নিজের মর্যাদার আসন থেকে নামেনি কখনো,
কখনো চায়নি কিছু অনিচ্ছা বা অবজ্ঞার কাছে;
ওর যা কিছু নীরব দাবি তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু স্নেহেরই দরজায়—
দুর্লভ হলেও যা-ও পেয়েছে;
অপ্রতুল হলেও পেয়েছে দুষ্প্রাপ্য সেবা ও যত্ন
হয়ত বা কিছুটা শ্রদ্ধাও—
যা ওর সমগোত্রীয়দের ছিল কল্পনার অতীত।
পথের কুকুরের পক্ষে চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো
আর যাই হোক, মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না।
তাই সভ্যতার বিষে, নীল নয়, হলুদ হয়ে
অকালে ঝরে পড়ল 'সাহেব'।
চলে গেল দায়সারা কবরের নিশ্চিন্ত আরামে।।

স্মৃতির কুয়াশা চিরে ওর পরিচয় ফুটে উঠছে—
ও এসেছিল মহাভারতের পাতা থেকে;
সারমেয়সমাজে ওর আবির্ভাব
'গল্প হলেও সত্যি'-র ধনঞ্জয়ের মতো
দুবছরের সংক্ষিপ্ত assignment - সেরে
যে ফিরে গেছে তার মহাপ্রস্থানের পথে।

'যুগান্তের কবি'-কে আর একবার ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।।

অবক্ষয়

শুভ্রা পাল

নৈঋত কোণে হেলে পড়েছে রবি
স্তব্ধ কক্ষ দাঁড়িয়ে সত্যের মুখোমুখি
হয়তো আর কিছুক্ষণ
হয়তো বা এখনই
তুফান উঠলো মনে-এর নাম জীবন?

দমকা বায়ু বেগ থমকে গিয়েছে যেন
মাথার উপর কাশফুলের আন্দোলন
সবুজ মনটা হারিয়ে গেছে জন-অরণ্যে
চিনতে কষ্ট হয় দর্পণে লাগে অন্যজন।

তবু প্রেমের জোয়ারে ভাসছে প্রকৃতি
সবুজ আনন্দে রঙিন শস্য শ্যামল
বাঁচার ছন্দে তার বাঁধন হারা গতি
সরষে ক্ষেতে পিছলে পড়েছে যৌবন।

অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে
গোটা সমাজ এখন পোঁকায় কাটা রুগি
অসর্তক মুহূর্তেরা রয়েছে ওৎ পেতে
একটু অসাবধানে সব রয়ে যাবে মুলতুবি।

ভুল করছি

অনির্বান চক্রবর্ত্তী

ফাল্গুধারার ন্যায় এই জীবন বইছে আবহমান
চলছে ঠিক বেঠিকের, আলো-আঁধারী খেলা,
কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রাত, সকাল উদীয়মান
কখনো রৌদ্রজ্জ্বল দুপুর, আপন বিকেলবেলা।

বড় অশান্ত যে পরিবেশ চারিদিক, নৈরাজ্যময় ঠিকানা
কখনো শাণিত চিৎকার, কখনো অপমানিত আর্তনাদ,
তারই মাঝে হচ্ছে যে ত্বরান্বিত—মৃত্যু পরোয়ানা
নিরুত্তাপ পরিহাস অদৃষ্টের, অবদমিত যুক্তিবাদ।

সবাই এগিয়ে চলেছে, এক অসীমের খোঁজে
যার নেই কোনো সীমা, নেই কোনো দিক,
মেতেছি আমরা এক ভয়ংকর খেলায়, পৈশাচিক ভোজে;
নিরানন্দেই আনন্দিত—ভাবছি, বুঝছি সব ঠিক।

ভুল করছি আমরা, এই সত্য, দিতে হবে খেসারত;
অশক্ত ভিতে ভারাক্রান্ত, ভেঙ্গে পড়বেই ইমারত।।

দুই কন্যা

পারমিতা

১৬ই জুলাই ২০১৩
ওদের সাথে দেখা হল স্বয়ং রাষ্ট্রপতির
এমন ছবিটাই প্রথম পাতার হেডলাইনের সঙ্গে
আমরা খুশী, পারল কতটা
সে হিসেব কারুর জানা নেই
তবু মনের আলো জালিয়ে
এগিয়ে গেল মেয়ে দুটো।
অন্যায় অপবাদ একদিকে
আর অন্য দিকে পারব এমনটাই প্রতিবাদী মন।

সদ্য-ঘটে যাওয়া কামদুনির চিত্র
গ্রামবাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ীতে
আসা দুটি মেয়ের লড়াই।
ওরা মাওবাদী, ওরা জঞ্জাল
বলতে বাধেনি সরকারপক্ষেরও
তবু হেরে না যাওয়া লক্ষ লক্ষ
মানুষের মাঝে ওরা টুম্পা মৌসুমী।

গভীর রাতে টুম্পাকে কাছে টেনে
ভয় পাওয়া স্বামী বলল
কিছু হবে না তো?
বাবা বললেন বাপেরবাড়ী
এসেছো ভালো মত ফিরে যাও শ্বশুরবাড়ী
যেন দিগন্তের শেষে নিভিয়ে দেয়
যত আগুন আছে।
টুম্পার প্রতিবাদ থামল না
কত রৌদ্রে পুড়ে গেল মৌসুমীর মন।
সবার ভয় মাঝে মাঝে
স্তিমিত করতে করতে
মৌসুমী আবার সরব।
অনেকগুলো রাত কেটে গেল
অনেক যন্ত্রণা, অনেক অবমাননা
ওরা এগিয়ে — ওরা চলছে
অনেক কিছু পাওয়ার আশ্বাস নিয়ে—
টুম্পারা, মৌসুমীরা
গোটা গ্রামটাই
মাদকতার আলিঙ্গনে ততক্ষণে
আর একটি মানবীর মৃত্যু
যন্ত্রণা সে পেয়েছে।
আর যারা সইছে
ওরা তো বুঝেছে কঠিন সমাজকে।
মৌসুমী, টুম্পারা জাগ—
ভারত জুড়ে জাগো
বিশ্ব দরবারে জাগো
অনেক দূর হেঁটে যেতে হবে...
আজ সে ক্যানভাসে
শুধু তোমাদেরই মুখগুলো...

সত্যি স্বপ্ন

গার্গী সরকার

সময় নামক যন্ত্রে চেপে
পিছন ফিরে দেখা,
হাজার হাজার ভুলের ভিতর
ঠিকটা দেখতে শেখা।
বিছানা, মাদুর বালিশ সহ
মানুষ অনেক হায়!
কখন যেন সময় থেকে,
আলাদা হয়ে যায়!
স্বপ্ন গড়ে স্বপ্ন ভাঙ্গে,
পূবের আকাশ রক্ত রঙে
নতুন নতুন পথের বাঁকে,
পথও অনেক মিশতে থাকে
টুকটুকে সেই হৃদয়টাকে
সঙ্গে রাখতে হয়...
ফেলে আসা অতীত আছে
ছটফটে এই বর্তমানে
হাজার রকম নালিশ আছে
হৃদয় নামক মালভূমিতে
অমূল্য সেই স্বপ্নটাকে
বাঁচিয়ে চলতে হয়
মতও আছে পথও আছে
স্বপ্ন তাই মাটির কাছে
আজও বাঁচে আজও বাঁচে...

মধ্যরাতের শহর

নন্দিত নন্দিনী

রাত যত বাড়ে, আমার
শহরের রাস্তাগুলোর
জটলা ততই
কমতে থাকে, শেষে একসময়
যখন
একে একে বাতিগুলো সব
নিভে যেতে শুরু করে,
তখনই শুরু হয় তার আসল গল্প।
ওই
দূরে যে ঘরটাতে এখনো টিম
টিম
করে আলো জ্বলছে, ওখানে
টেবিল—
চেয়ারে বসে মগ্ন
হয়ে পড়ছে এক কিশোরী।
কাল পরীক্ষা ওর।
পাশের বস্তিতে তখন
রিক্সাওয়ালা হামিদের বউ
তার দু'মাসের বাচ্চাটার
কান্না থামাতে ব্যস্ত।
ছেঁড়া কাঁথাটা দিয়ে ওর
শীত কমানোর
চেষ্টা করছে সে।
অনেক দূরে দুটো কুকুর অনবরত
ডেকে চলেছে, রোজই ডাকে।
ওহহ্, আর ওই যে গানের
আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওই
লোকটা প্রতিরাতেই
ছাদে বসে গান ধরে,
সুখভর্তি বোতলটা থাকে
সাথে।
ওর বৌ-বাচ্চা তখন
ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন।
ঠিক
তখনি খটমটে বাঁধানো
ফুটপাথে পাশ
ফিরে শোয় পাগলিটা। ওর
পাশে দাঁড়ানো
ছায়ামূর্তিটা তখন
কনডমের প্যাকেট ছিঁড়ছে।
ও বাড়ির ছোট্ট
মেয়েটা বালিশে মুখ
গুঁজে তখনও
সমানে কেঁদে চলেছে।
না পারছে চোখের
জল আটকাতে,
না পারছে শব্দ
করে কাঁদতে,
পাশে ঘুমিয়ে থাকা
দিদিটি যদি টের
পেয়ে যায়! আমার
কী দোষ, গাল
ফুলিয়ে ভাবে মেয়েটা,
আমি যাদের
ভালোবাসি তারা সব
এমন হয়ে যায় কেন? ওর
আবার বড্ড অভিমান!

মধ্যরাত...পাশের ফ্ল্যাটের
চল্লিশোর্ধ্ব
প্রফেসরেরও ঘুম
আসছে না তখন। ঘুমন্ত
স্ত্রীর
পাশে শুয়ে এপাশ-ওপাশ
করছেন, ক্ষণিকের
তন্দ্রায় চোখ একটু
বুজে এলেই
মনে পড়ে যাচ্ছে ক্লাসে আসা নতুন
মেয়েটার কথা। আহা,
মুখটা বড্ড...
রাতজাগা পাখিটা তখনো একই
স্বরে ডেকে চলছে।

প্রতিদিন এ সময়েই
কী যেন হয় ওর।
চারতলার ওপরে তখন
গণকযন্ত্রের
সামনে বসে আছে সদ্য
কলেজে ঢোকা ছেলেটা।
ওর চঞ্চল চোখ দুটো এখন
নিষিদ্ধ আনন্দ
উপভোগে ব্যস্ত।

ঠিক তখনই
রাস্তা দিয়ে হঠাৎ
হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে
যাওয়ার
শব্দ। আরেকটা ছিনতাই
হল বোধহয়।
শালটা গায়ে জড়িয়ে ঘর
থেকে বেরিয়ে দোতালার
বারান্দায় এসে দাঁড়াল
একটা মেয়ে।
নাহ্, আজ রাতে আর ঘুম
হবে না।
গুনগুন করে গান ধরলো ও।
বাইরে তখন কুয়াশা ঝরছে...
জীবনটাকে বড় শূন্য আর
একঘেয়ে লাগে হঠাৎ।
তখন জানালায় ঠেস
দিয়ে দাঁড়িয়ে ডুবে যাওয়া
চাঁদটার
কথা ভাবে এক
নৈরাশ্যবাদী,
সাথে নিজের
বদলে যাওয়া জীবনটার
কথা। নাহ্, জীবনটা অত
খারাপ না!
আস্তে আস্তে জ্বলে থাকা
বাতিগুলোও
নিভতে শুরু করে একটু পর,
আর ছোট এই শহর তার
গল্পে ভরা শরীরটাকে
নিয়ে নিকষ
আঁধারে ডুবে যায়।

মৌষলপর্ব

তাপস দাস

ঘর বন্দী থানের কাপড়
দরজায় জমেছে ঘাস
কতদিন আসেনি মানুষ।

এত লাশ দেখি, রক্তের ছড়াছড়ি
শোক সয়ে গেছে চোখে; গৃহস্থের ঘরে
কি জানি কবে বদলে যাবে টার্গেট।

ঈশ্বর তবু ভালো থাকেন
ভালো থাকে পাড়ার মাতব্বর;
ভালো থাকে রাস্তা, ভালো থাকে রাস্তার মোড়।

শোনো তবে বৈধব্য, অসহায় আক্রোশ
মৌষলপর্ব শেষ হবে;
আমি একদিন সেনাপতি, প্রতিশোধ।

'শিল্পের এবং কৃষির উন্নতি না হইলে ভারতীয় গ্রামবাসীদের সেই মধ্যযুগের অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নতির পথে আনা সম্ভব হইবে না।'

মেঘনাদ সাহা।

জোছনায় ক্যামোফ্লেজ

সাইদা সারমিন রুমা

মেরুদণ্ড বেয়ে বেয়ে, আমার সব দুঃখরা
বসতি পেতেছে আজ শিরায় শিরায়।
ক্রমশ দুঃখরা ছড়িয়ে পড়ে—
গ্রীবা, পাঁজর আর অস্থিমজ্জায়,
ভালো লাগে না হাইড্রোলিক শব্দের প্রসারণ।
দুঃখরা ডাকে ফণিমনসার দিঘল ইশারায়,
ওরা মেঘের ভাষায় চিঠি লিখে আমায়;
ওরা ছায়া চায়, আশ্রয় চায়, আর চায় স্থায়ী ঠিকানা।
এলোমেলো হয়ে যায় আমার স্বপ্নেরা,
কেঁপে উঠে বিমূর্ত বাতাস।
ভূ-মধ্যসাগরীয় স্রোতের মতো দুঃখরা এগিয়েই চলে,
আমার হৃদপিণ্ডের সবকটি অলিন্দ
স্বাগতম বার্তা জানায়;
সোচ্চার হয়ে উঠি পরিহাসের জন্য,
আর্কিমিডিসের মতো এরা আমায় থামিয়ে দেয়।
কোথায় হারিয়ে গেছে —
আজ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা অভিমানগুলো,
মুছে গেছে স্বপ্নের ময়দান আর, স্বর্ণালী বিকেলের আভা।
হয়নি বলা জীবনের বিষণ্ণ অঘোষিত
কিছু কথা—,
যা ভলকে উঠে উগ্র লাভার স্রোতের মতো।
আজ দুঃখরা ডালপালা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে
জংলা গাছের মতো—,
তাই আমার সাইকেডেলিক চিৎকার কাউকেই স্পর্শ করে না;
আমার দুঃখগুলো যেন নিভৃতে জমে ওঠা
সমুদ্রের লবণের মতো।
আমার কৈশোর ধীরে ধীরে —
ক্রিস্টাল দর্পন থেকে মুছে যায়,
অস্তিত্বের সিগমেন্ট বলে দেয়
আমি কতটা অস্তিত্বহীন পৃথিবীর মাঝে।
আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—
শৈশবকে ভোলার, কৈশোরকে আর সোনালী স্বপ্নগুলোকে
আমি এঁকে যাই—
বোবা জলছাপ, বাতাসের অদেখা পাতায়।
শ্রান্ত মননে আমি প্রার্থনা করি, আমি সব শূন্যতাকে
ঢেকে রাখি, এক অস্পষ্ট কালো জোছনায় ক্যামোফ্লেজে।

রণডিহা-২

দেবজিৎ চক্রবর্তী

হয়তো তেমন কোনো গ্রাম নেই
যা খুঁজছ তুমি
হয়তো তোমার কোনো গ্রাম নেই...
হয়তো বা গ্রাম আছে—নামটা তা' নয়
কিম্বা নামটা আছে,
কিন্তু তা এখন নগর
এখন তা অন্য জনপদ!

অথবা যে স্তরে আছে সে প্রস্তরীভূত
তুমি তার অন্য মাত্রায়
অন্য কোনো কালের মাত্রায় হয়তো সে জনপদ ছিল
এখন ঘুমের দেশে তার জীবাশ্ম আত্মা রয়েছে!

সে আত্মাকে সবাই ভয় পায়
সিঁদুর মাখিয়ে রাখে
কখন সে জেগে ওঠে দৈব কৃপায়—
এই ভয়ে!

তুমিও কি ভয় পাও?

এই খোঁজ, এই একলা পাগল খোঁজা...
তিনশত চৌষট্টি দিবস
নিজেকে বিস্মৃত থেকে
হঠাৎ আজকে কেন আত্ম অন্বেষণ!

খোঁজ—
তবু খোঁজ
বুভুক্ষু তৃষ্ণা নিয়ে বালি খোঁড়ো
নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে — নিজেকে উজাড় কোরে
খোঁজ ... খোঁড়ো ...

অনেক পাপের পর এই টুকরো পূণ্যের সাধ
অনাগত মৃত্যুর মাহেন্দ্রক্ষণে
তোমার শীতল শরীরে জ্যোৎস্না সিঞ্চন ক'রে দেবে।
সিঞ্চিত জ্যোৎস্নায় সন্তানের মুখ দেখে নিও...

তারপর, তোমার প্রত্ন শরীর বাহকেরা বয়ে নিয়ে যাবে
সেই খুঁজে না পাওয়া
প্রস্তরীভূত গ্রামে ...
তার আগে
তোমার সন্তানের কানে
বীজমন্ত্র উপ্ত কোরো অন্বেষণের!!

নিকট বৃত্ত

পারমিতা

একবার নিজের দিকে
চোখ তুলে তাকিয়ে
আবার ভবিষ্যতের দিকে চোখ
সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ
আষ্টেপৃষ্টে অক্টোপাসের মতো
সম্পূর্ণ হওয়ার টানাপোড়েন চলছে।
নিশ্ছিদ্র শান্তি আর সুখ...
কোথায়? কোথায়?
না তো পাশায় বাজী লড়া দ্রোপদী নয়
না রাক্ষসের সঙ্গে থাকা সীতা
না জিহ্বা কেটে ফেলা ক্ষনা
তবু সে ও যে অনন্যা।

দোলাচলের ঢেউ বয়েই চলে
একটা একটা করে
যে বহতা নদী বাঁধা পায়
বারে বারে এক অর্জুন পুরুষের
নিস্তব্ধ সহনীয় ভালোবাসায়।
বাঁধা মনের মধ্যে
বিস্ফোরক নয়তো
যে কূলে চারিদিকে বাঁকা জল
তার মধ্যেই দিন, কত রাত্তির
প্রহর আর ঘণ্টা।
মাঝে মাঝে কেমন যেন
এক পথ দূরন্ত আশা
পরক্ষণেই—
আমরন ভালোবাসার সাথে
ভীষণ কষ্ট। আর কষ্ট।
তোমার কাছে আমার ভালোবাসাকে
পেতে চাই পৃথিবী,
সারাক্ষণ, অবিরাম।
প্রতিশ্রুতি নিজের সঙ্গে
সব আলো ফিরিয়ে নিয়ে।
আমিই হয়তো সেই
তরঙ্গ তৃপ্ত নৌকার হাল
বাঁধব অস্থায়ী নোঙরে।
এ জীবন সাজাব মুক্তি স্নানে
পরমাণু শিখরে
গভীরতায় ছড়ানো আনন্দ, আশা
অজস্র ভালোবাসা, সীমাহীন সুখ
ভাসাব আমরা দুজনে।।

নতুনের ডাক

অনির্বান চক্রবর্ত্তী

মহাধ্বংসের দামামা উঠেছে বেজে
অবরুদ্ধতা করছে ক্রমশ গ্রাস,
নকলি ও নাটুকেপনার দাপটে
ওষ্ঠাগত প্রাণ, ক্ষত-বিক্ষত নাভিশ্বাস।

মিছে আধুনিকতার উজ্জ্বল মোড়কে
সংকীর্ণতার জয় জয়কার,
প্রাণহীন মনন-মরুভূমির উপর
প্রাণের হাহাকার।

অদম্য হিংসা, অবাধ যুক্তি,
মিথ্যে আস্ফালন,
অবদমিত হচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠস্বর
কলুষিত নন্দন-কানন।

লালায়িত ফূর্তির জোয়ারে ভাসছে
উন্নাসিক জনগণ,
অধঃপতন ও অগ্রগতির মাঝে
এটাই মহাসন্ধিক্ষণ।

অবলুপ্তির পথে ঈশ্বরসৃষ্ট মানবধর্ম
আসন্ন অবক্ষয়,
জরা-জীর্ণ যা সব, যাবে মুছে
আকবে সত্য অক্ষয়।

আবহমান এই পৃথিবী, গড়ে উঠুক নতুনের সাজে,
উদ্ভাসিত হোক নতুন প্রাণ।
নতুনত্বের সুবাসে মেতে উঠুক সবাই
ছড়িয়ে, মধুমিশ্রিত গান।।

কখনো

ডাঃ নির্মাল্য রায়

এতগুলো দিন কখনো রঙিন
কখনো ফ্যাকাশে বর্ণচোরা
এতগুলো কথা কখনো ব্যথা
মন উদাসের পাগলা ঝরা।।

এতগুলো রাত হাত রেখে হাত
কখনো পেয়ে ও হারিয়ে যাওয়া
তোমার আলোয় আমার আঁধারে
পরশপাথর খুঁজতে চাওয়া।।

এতগুলো ভাষা কখনো আশা
হতাশা লুকোনো রঙিন খামে
এতগুলো গান কখনো বেসুরো
মন ছুঁয়ে তবু আকাশ পানে।।

এতগুলো যদি তবুও হৃদি
ভেসে যায় ঐ মানস জলে
সঁপেছি তোমায় আমার যা কিছু
চলছে জীবন যেমন চলে।।

চোদ্দো আনা

সিদ্ধার্থ দত্ত

দুটি পথ গেছে দুপাশে তবুও,
দুজনার কথা হয়
একজন শুধু চুপ করে থাকে
অন্য যে বাঙ্‌ময়।

কী যে লাভ হয় খালি কথা বলে
বোঝে না মৌনজন
সে মনে ভাবে : বোকাটা এভাবে
করছে পণ্ডশ্রম!

লাভ-ক্ষতি যদি বোকায় বুঝত
সে তো কবে হতো রাজা
এভাবে কী আর মার খেতে হতো
পেতে হতো কি তার সাজা?

এত বোঝে তবু, কেন যে করে না
আখের গোছাতে কাজ
কেন বা নিজেকে, বৃথা বকে আজ
করে শুধু বরবাদ?

বৃথা মনে হয় যেটা তার কাছে
সেটা বোকা লাভ ভাবে
বোকার জীবনে তা-ই বড় পাওয়া
বাকিটা পুষিয়ে যাবে।

ষোলো আনা লাভ—সে কী করে হয়?
দু-আনা তো কম হবে!
হিসেবি লোকের খেরোর খাতায়
বোকা লোকসানে থাকে।

‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক বিকাশই সত্য। এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। কমও কিছু নেই।’

পিটার লিওনিদোভিচ ক্যাপিৎজা।

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

দূর নয় বেশী দূর

শর্মিষ্ঠা দাস

বর্ষার মেঘ উড়ে যেতেই আকাশে শরতের মেঘের উঁকিঝুঁকি, তাই মনেও কোথাও উড়ে যাবার ইচ্ছেটা শুরু হতে লাগল। কিন্তু কোথায় যাব? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, অনেক তো দেশে ঘোরা হল এবার বিদেশ গেলে কেমন হয়? কাছাকাছির মধ্যে বিদেশ বলতে আমাদের প্রথম মনে হল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। কিন্তু দলের সবার সম্মতি মিলল না। শেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল থাইল্যান্ডের 'ব্যাঙ্কক্' ও 'পাটায়া' গেলে কেমন হয়। এর সঙ্গে যোগ হল 'ফুকেট'। যেটা ভারত থেকে দূরও নয় আবার বিদেশও। অতএব তোড়জোড় শুরু হল। অবশেষে এক বন্ধুর সাহায্যে আমাদের পছন্দ মতো যাওয়ার জায়গাগুলো ঠিক করে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সকল বাধা পেরিয়ে অবশেষে ২৮শে অক্টোবর মাঝরাতে 'এয়ার এশিয়ার' প্লেনে চেপে চললাম ব্যাঙ্কক্। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই আমরা পৌঁছোলাম ব্যাঙ্ককের ডি.এম.কে এয়ারপোর্ট-এ। ভারতের থেকে ব্যাঙ্ককের সময় দেড় ঘন্টা এগিয়ে। এই এয়ারপোর্টটি গত বছর থেকে এয়ার এশিয়ার নিজস্ব এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ইমিগ্রেশান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ মিটিয়ে আমরা আমাদের বেরোনোর নির্দিষ্ট গেটে পৌঁছোতেই দেখি আমাদের নাম লেখা কাগজ হাতে আমাদের গাইড হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। নমস্কারের পর্ব সেরে আমারা গাড়িতে করে রওনা দিলাম ব্যাঙ্ককের আরেক এয়ারপোর্ট 'সুবর্ণভূমি'র উদ্দেশ্যে। এখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমাদের অন্য এক বন্ধুর জন্য। এখানেই আমাদের থাইল্যান্ডের মেন ট্যুর অপারেটর 'মিস্ টুকটা'র সঙ্গে আলাপ হল। ছোটখাটো সদাহাস্যময়ী মহিলা এই 'মিস্ টুকটা'। থাইল্যান্ডের সব জায়গাতেই মহিলারাই সব কাজ করে।

'সুবর্ণভূমি' এয়ারপোর্ট এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়। আর এখানেই আছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু (৪৩৪ ফুট) Control Tower। পাঁচটি তলা জুড়ে এই এয়ারপোর্টটি যেন ছোটখাটো একটা শহর। যার একমাথা থেকে অন্য মাথায় যেতে লেগে যায় বেশ খানিকটা সময়। আমাদের সকাল ৮টা থেকে ২.৩০মি. পর্যন্ত কিভাবে যে কেটে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না। দুপুর ২.৩০ মি. নাগাদ আমরা পুরো দল একত্রিত হয়ে চললাম 'পাটায়ার' উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ছোট বাজার প্রভৃতি। গাড়ী চলছে ১২০-১৪০ কি.মি. গতিতে। কিন্তু, রাস্তা এতো সুন্দর যে কিছু মনেই হচ্ছে না। চার লেনের কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা। অবশেষে বিকেল ৪.৩০মি. আমরা পৌঁছালাম 'পাটায়াতে'। খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হোটেল 'গ্রান্ডসোলে'তে আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করা ছিল।

এরপর থেকে সফরসূচির সময় মেনে চলতে হবে আমাদের। পরবর্তী সফর বিকেল ৫.৩০ মি. 'আলকাইজার শো' দেখতে যাওয়া। হোটেল থেকে গাড়ীতে ৫ মিনিটে পৌঁছে গেলাম এই শোয়ের হলে। 'আলকাইজার' শো-টি খুবই রঙিন ও সঙ্গীতময়। এখানে কলাকুশলীরা খুব উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গানের সঙ্গে নাচ করে। শো শেষ করে আমরা চললাম পাটায়ার বিখ্যাত সি-বীচে। পাটায়া সি-বীচটির দৈর্ঘ্য ৩ কি.মি.। শান্ত সমুদ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সি-বীচ এই পাটায়ার। বীচের ধারে ধারে অসংখ্য খাবার জায়গা। সেখানে অবাধে থাই খাবার তৈরী হচ্ছে। বীচের উল্টো দিকে রয়েছে বিশাল বিশাল হোটেল। অনেকক্ষণ এখানে কাটিয়ে আমরা চললাম হোটেলের পথে। এখানে দু'হাত অন্তর অন্তর 'ম্যাসাজ পার্লার' ও 'নাইট ক্লাব'। সকলে ভোররাত অবধি এখানে নাচ-গান, আনন্দ, ফূর্তি করে। কি অদ্ভুত এদের জীবনধারা!

পরদিন সকাল ৯.০০ টার সময় হোটেল থেকে গাড়ী এসে আমাদের নিয়ে গেল পাটায়ার সি-বীচে। আজ আমরা যাব 'কোরাল আইল্যান্ডে'। এখানে আমাদের গাইড আমাদের ও অন্যান্য সকল সহযাত্রীদের হাতে নম্বর লিখে দিল। যা কিনা আমাদের সেদিনের পরিচয়পত্র। ছোট স্পীড বোটে চড়ে আমরা প্রথমে গেলাম মাঝ সমুদ্রে ভাসমান একটি জেটির কাছে। এইখানে প্যারাসেলিং করা যায়। সমুদ্রের মাঝখানে প্যারাসেলিং, এ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আমরা চললাম 'কোরাল' দ্বীপের দিকে। সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে আধ ঘণ্টা চলার পর হঠাৎ একটা আইল্যান্ডের পিছন থেকে 'কোরাল' দ্বীপটি দেখা গেল। ঝকঝকে সাদা বালি বিছিয়ে, সি-বীচকে সাজিয়ে কোরাল দ্বীপ আমাদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। সি-বীচের উপর শত শত আরামকেদারা পাতা। ভ্রমণার্থীদের বসার জন্য। এখানে ২ ঘণ্টা আমরা কাটাতে পারব, তাই ছোট ছোট ঢেউ সাজানো সুন্দর সমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য সবাই ব্যস্ত। ছোটদের আর সামলানো গেল না, চোখের নিমেষে তারা নেমে গেল সমুদ্রে। বড়রাও ছোটদের থেকে কোন অংশে কম গেল না হুটোপুটিতে। শেষে পুরো সময়টাই সমুদ্রে কাটিয়ে আমরা

চললাম গ্লাসবটম বোটে করে কোরালের রাজত্বে। যদিও ২০০৪-এর সুনামির পর খুব একটা কোরাল দেখা যায় না, তবুও অল্প হলেও দেখা গেল। তারপর ফিরে যাবার পালা। ফিরে এসে প্রথমেই আমরা ইন্ডিয়ান বুফে লাঞ্চ করে চললাম জেমস্ ফ্যাক্টরী দেখতে। সে এক দেখার মতো জায়গা। চারদিকে মনিমুক্তোর ঝলকানি। তবে কিনতে হলে পকেটের অনেকটা টাকাই খসাতে হবে। তাই খালি হাতেই ফিরতে হল। ফিরে আসার পর আমাদের ছুটি। হোটেলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বের হলাম আমাদের নিজেদের মতো করে ঘুরতে।

পরদিন আমাদের পাটায়া থেকে ফেরার পালা। সকাল ৯.৩০ মি. গাড়ী আমাদের এসে নিয়ে চলল ব্যাঙ্ককের পথে। পথে যেতে যেতে আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। এখানে শহরের মধ্যে সব রাস্তাই ওয়ান ওয়ে। তাই ফেরার পথে আমরা অন্য রাস্তা ধরলাম। ব্যাঙ্কক্ শহরটা বেশীর ভাগই Flyover দিয়ে জোড়া। ব্যাঙ্কক্ আসতে আমরা একটা Flyover দিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চললাম। এছাড়া আছে Sky Train। রাস্তা অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের রাজধানীর রাস্তার মতোই যানজট। তবে Sky Train-এর যাতায়াত খুব আরামদায়ক।

সেদিন প্রথমে আমরা দেখলাম 'গ্লোডেন বুদ্ধ' মন্দির। সারা পৃথিবীর মধ্যে এরকম বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও নেই। ৭০০ বৎসর আগে, মন্দির ও মূর্তি তৈরী হয়েছিল। সাড়ে ৫ টন সোনা দিয়ে এই মূর্তি তৈরী। এখান থেকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমরা গেলাম 'রিক্লাইনিং বুদ্ধ' বা 'শায়িত বুদ্ধ' মূর্তি দেখতে। ৪৬ ফুট লম্বা এই বুদ্ধমূর্তি। সারা বিশ্বে এতবড় শায়িত বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও নেই। এখান থেকে আমরা ব্যাঙ্ককের রাজবাড়ী, প্রভৃতি দেখে, এখানকার জেমস্ ফ্যাক্টারী দেখতে গেলাম। এরপর কেনাকাটার পালা, গেলাম ব্যাঙ্ককের ইন্দ্রা বাজারে। এই বাজারটি ব্যাঙ্ককে খুবই জনপ্রিয়। এখানে সারা সন্ধ্যা কাটিয়ে আমরা রাতে হোটেলের পথ ধরলাম। ফেরাটা কিন্তু আমাদের দারুণ হয়েছিল। ইন্দ্রা বাজার থেকে বের হয়ে আমরা প্রথমেই ধরলাম টুক্টুক্। ঠিক কলকাতার অটো রিক্সা। সেটা চড়ে এলাম 'Chitlon' স্টেশনে। এটি Sky Train-এর একটি স্টেশন। এখান থেকে ট্রেনে আমরা যাব 'On-Nut' স্টেশনে। যেটা আমাদের হোটেলের একদম কাছে। এই Sky Train-এ চড়ে যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সুন্দর। ট্রেনে যথেষ্ট ভীড় কিন্তু কোন ধাক্কাধাক্কি, হৈ চৈ কিছুই নেই। সকলে রোবটের মতো নিজেদের কাজে ব্যস্ত। এখান থেকে রাতের আলো ঝলমল ব্যাঙ্কক্ দেখতে খুবই ভালো লাগে। হোটেলে ফিরতে ফিরতে আমাদের রাত প্রায় ১০টা বেজে গেল। এরপর খাওয়া দাওয়া করে সেদিনের মতো বিশ্রাম।

পরদিন সকালে আবার ৯.০০ টায় হোটেলে গাড়ী এসে হাজির। আজকে আমরা যাবো 'সাফারী ওয়ার্ল্ডে'। আশ্চর্য জায়গা এই 'সাফারী ওয়ার্ল্ড'। বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরী। সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৩.০০ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শো হয় এখানে। প্রথম শুরু হয় 'ওরাংওটাং' শো দিয়ে। এদের প্রায় মানুষের মতো আচরণ ও ব্যবহার দেখে ছোট বড় সকলেই হেসে লুটোপুটি। প্রতিটি শো এখানে ২০ মি. করে হয়। এরপর সি লায়ন, হাতী, ডলফিন ও সবশেষে স্টান্ট শো। প্রতিটি জীবজন্তুকে এতো সুন্দর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, দেখলে বোঝা যায় না যে তারা মানুষের মতো শিক্ষিত নয়। হাতিদের দিয়ে আঁকানো ছবি দেখলে মনে হয় যেন কোন বড় শিল্পী তা এঁকে দিয়েছে। সি লায়ন ও ডলফিনদের কসরৎও দেখার মতো। এদের দেখলে বোঝা যায় না তারা মানুষের ভাষা বোঝে না। শেষের স্টান্ট শো দেখতে দেখতে মনে হবে যেন আমরা জেমস্ বন্ডের কোন শুটিং-এ পৌঁছে গেছি। ছোট জায়গার মধ্যে তাদের সাবলীল স্টান্টবাজি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিটি শো শেষ করে অন্য শো-তে যাওয়ার পথে পড়ে নানা প্রজাতির পাখী, তাদের যেমন সুন্দর নাম তেমন সুন্দর রং, দেখলে চোখ ফেরানো মুশকিল। এই সাফারী ওয়ার্ল্ডে আর কি কি নেই! বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগার যেমন আছে, তেমনি সুদূর সাইবেরিয়ার মরু ভাল্লুকও আছে। এছাড়া জলহস্তী, পাইথন, নানা রঙের মাছ প্রভৃতি। এরমধ্যে সময় হল আমাদের লাঞ্চ ব্রেকের। বিশাল এক জায়গায় পরপর টেবিল সাজানো। সমস্ত টেবিলেই নম্বর দেওয়া আছে। গাইডরা সেই টেবিলে সকলের নম্বর মিলিয়ে বসতে সাহায্য করল। খাওয়া শেষ হতেই আমরা চললাম আমাদের পরের শো দেখতে। সব শেষে সাফারী পার্কে। এই পার্কে এসে মনে হল আমরা এক আশ্চর্য জগতে ঢুকে গেছি। কালো পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে মাঝখান দিয়ে। আর দুইদিকের খোলা ঘাস জমির উপর আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেব্রা, উঠ, জিরাফ, হরিণ, নানা প্রজাতির পাখি, গণ্ডার, ময়ূর, জলহস্তী। এক জায়গায় তো দেখলাম একদল সিংহ সপরিবারে রোদ পোয়াছে। আবার কোন জায়গায় হঠাৎই ৩-৪টা বাঘ রাস্তা পার হয়ে গেল। এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা সেই আশ্চর্য পার্কের ভীষণ মন ভালো করা অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে করে আমরা ফিরে চললাম শহরের দিকে। পথে পেলাম বিরক্তিকর যানজট। সন্ধ্যাবেলায় আমরা পৌঁছোলাম 'সিয়াম' বলে একটা জায়গায়। 'সিয়াম' হল ব্যাঙ্ককের অভিজাত জায়গা। বিশাল বড় বড় শপিং মল এখানে আছে। এরই মধ্যে একটাতে ঢুকে আমরা বেশ খানিকটা সময় কাটালাম। এতো সুন্দর পরিকল্পিত ভাবে

সাজানো এই মলগুলি যাদের ডেকরেশন দেখতেই অনেকটা সময় আমরা কাটিয়ে দিলাম। শেষে বেশ রাতেই আমরা সেই Sky Train-এ চড়ে ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে। আজ আমাদের ব্যাঙ্ককে ঘোরার শেষ দিন। কাল সকালেই আমরা যাব আর এক নতুন জায়গা — 'ফুকেট'।

আন্দামান সমুদ্রের উপর মুক্তোর মতো দ্বীপ এই 'ফুকেট'। ২০০৪-এ সুনামিতে প্রায় পুরোটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানকার লোকেরা এতো তাড়াতাড়ি এই দ্বীপটাকে আবার নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ব্যাঙ্কক্ থেকে সকালে এয়ার এশিয়ার বিমানে ১.৩০ ঘণ্টায় আমরা ফুকেট পৌঁছোলাম। জায়গাটা থাইল্যান্ডের একেবারে দক্ষিণ দিকে। ব্যাঙ্কক্ থেকে গাড়ীতেও এখানে যাওয়া যায় তবে সময় লাগে ১৪ ঘণ্টা। তার থেকে প্লেনে যাওয়ায় সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচে। প্লেনের জানালা দিয়ে দেখলাম আস্তে আস্তে নীল জলের মধ্যে পান্নার মতো দ্বীপটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। দেখে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। তারপর সমুদ্রের গা-ঘেঁষে তৈরী হওয়া রানওয়েতে ঝুপ করে আমাদের প্লেনটা নেমে গেল। 'ফুকেট' এয়ারপোর্টটি ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট, তবে একটা মাত্র রানওয়ে। এখানে আমাদের জন্য যে গাড়ী অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ে চললাম হোটেলের দিকে। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাবার রাস্তাটা ভারী সুন্দর। উঁচু-নীচু-আঁকাবাঁকা রাস্তা আর তার দুপাশ ছবির মতো সাজানো। প্রায় ৪৫ মি. চলার পর আমরা পৌঁছোলাম আমাদের হোটেলে। সেখানে পৌঁছে ১৫ মি. মধ্যে তৈরী হয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সি-বীচের দিকে। এখানকার বিখ্যাত বীচ হল 'প্যাটং বীচ'। এই বীচে পৌঁছোনোর রাস্তার নামটা হল বাংলা রোড। আশ্চর্য না? সুদূর ফুকেটে যেখানে বাংলার কোন নাম নিশানা নেই। সেখানে একটা রাস্তার নাম এই রকম।

'প্যাটং' বীচটি অদ্ভুত মায়াবী। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা শান্ত নীল জলের বীচ এই 'প্যাটং'। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানুষের মেলা বসেছে এই 'প্যাটং' বীচে। সারা বীচে নানা রঙের ছাতা ও মানুষ ছড়িয়ে আছে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। ছোটরা তো জল থেকে উঠতেই চায় না। শেষে অনেক চেষ্টায় তাদের জল থেকে তুলে আমরা চললাম হোটেলের পথে। আজ সারা সন্ধ্যায় নিজেদের মতো ঘুরব ঠিক করলাম। সন্ধ্যায় এখানে অনেক জায়গায় ফুড-কোর্ট আছে। এখানকার ফুড-কোর্টটি ভারি মজার। বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে এখানে পাওয়া যায় গঙ্গা ফড়িং, আরশোলা, গুটিপোকা—ভাজা ও সেদ্ধ। এইসব সুস্বাদু খাবার দেখলে আমাদের গা গুলিয়ে উঠলেও অনেকেই বেশ পরম আনন্দে সেইসব খাবার টেষ্ট করছে। সেইদিন আমরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন আমরা যাব ফি ফি আইল্যান্ড।

সকাল ৭টায় হোটেল থেকে বেড়িয়ে পরে ৮.৩০ মি. আমরা পৌঁছে গেলাম ফুকেট লঞ্চ ঘাটে। এখান থেকে ইয়ট-এ করে যাব ফি ফি আইল্যান্ড। ফুটেক থেকে ফি ফি-র দূরত্ব প্রায় ৪৮ কি.মি.। বিভিন্ন বীচ ঘুরে ফি ফি পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ২ ঘণ্টা। ইয়টের আপার ডেকে চড়ে বসলাম ফি ফি আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে।

ঠিক সকাল ৯ টায় আমাদের যাত্রা শুরু হল। তীর থেকে যত দূরে আমরা যেতে থাকলাম সমুদ্রের জল তত সবুজ থেকে গাঢ় নীল হতে লাগল। ধবধবে সাদা রাজহাঁসের মতো ইয়টটি সমুদ্রের বুক চিরে ভেসে চলল। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ আর সমুদ্রের জলের রং মিলে মিশে একাকার। যেতে যেতে আমাদের দুপাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অনেক ছোট-বড় স্পীড-বোট জলে ফেনা তুলে চলে যাচ্ছিল। লোয়ার, মিডিল, আপার এই তিনটি ডেক নিয়ে এই ইয়টটি। ইয়টটির প্রথম ডেকে এসি কেবিন। দ্বিতীয়টিতে বসার জায়গা ও ক্যান্টিন। সামনের দিকে চালকের কেবিন। আর একেবারে সামনে খোলা বসার জায়গা। আপার ডেকে সার সার চেয়ার পাতা খোলা আকাশের নীচে। বিদেশী পর্যটকদের গায়ে তেল মেখে রোদ উপভোগ করা, আর চারপাশের অপূর্ব মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারা ভেসে চলতে লাগলাম ফি ফি-র দিকে।

ফি ফি-তে যেতে যেতে বেশ কয়েকটি আইল্যান্ড আমাদের চোখে পড়ল। যদিও সেগুলি মানুষের নামার উপযুক্ত নয়। ধীরে ধীরে আমরা মায়া বীচ, ভাইকিং কেভ দেখে এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। সারাটা সময় সবাই ইয়টে ঘুরে ঘুরেই কাটালাম। মাঝে মাঝে ইয়টের নীচের ডেকের সামনের দিকে চলে আসছিলাম। সমুদ্রের জল কেটে ইয়টি এগিয়ে চলার সময় নোনা জলের ঝাপটা সারা গায়ে মাখতে বেশ ভালোই লাগছিল। তবে প্রবল হাওয়ায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যাচ্ছল না। আমরা বেলা ১১টা নাগাদ ফি ফি-তে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে প্রথমে আমাদের একটা ছোটো বোটে করে সকলকে নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রের একটু গভীরে। এখানে আমরা Snorkeling করব। অদ্ভুত সুন্দর এই অভিজ্ঞতা। ডুবরির মুখোশ পরে আমাদের নামতে হল প্রায় ৪০ ফুট গভীর জলে। স্বচ্ছ কাঁচের মতো জলে ডুব দিয়েই দেখা গেল নানা রঙের কোরাল, আর হাজার হাজার রঙিন মাছ। সমুদ্রের নীচের এই রঙিন জগৎ নিজের চোখে না

দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এ এক আশ্চর্য দুনিয়া। আমাদের জন্য বরাদ্দ ১ ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। দুপুর খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল এখানকার ফি ফি হোটেলে। বিশাল পাঁচ তারা হোটেলে আমাদের খাওয়ার জায়গার টেবিল আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। সঙ্গে যোগ হল আরও চার বিদেশি পর্যটক। বিভিন্ন রকম ইন্ডিয়ান খাবারের সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের মাঝখানে খুব সুন্দর করে সাজানো একটা সী-ফুডের ডিশ রাখা ছিল। এতে চিংড়ি, কাঁকড়া ও অক্টোপাশের সুপ রাখা ছিল। দলের কেউ কেউ অতি উৎসাহে সেই সব সুখাদ্যগুলো খেয়ে দেখতে লাগলো। অবশেষে ফেরার পালা। ফি ফি ছেড়ে আসতে সত্যিই মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু উপায় নেই ফিরতে তো হবেই। বিকেল ৪টে নাগাদ আমরা আবার ফুকেটে এসে পৌঁছালাম। সন্ধ্যায় আবার বাংলা রোডে ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফেরা।

পরদিন সকাল ৭টার মধ্যে বেড়িয়ে পড়তে হল ব্যাঙ্ককে ফিরে যাবার প্লেন ধরতে। সারাদিন ব্যাঙ্ককে ঘোরা ও কেনাকাটা করে রাতে কলকাতার প্লেনে উঠে পড়লাম বাড়ি ফেরার জন্য। প্রায় মধ্য রাতে সকলে কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছোলাম। প্রথম বিদেশ ভ্রমণের সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

দিবস এবং তারিখ

দেবকুমার মিত্র

আমরা তো এখন অনেক 'দিবস' এবং 'তারিখ'-এর উদ্‌যাপন করি। উরুগুয়ের সাংবাদিক-লেখক Eduardo Hughes Galeano হয়তো এই 'দিবস' এবং 'তারিখ'-এর ইতিহাস বর্ণনা করে বই লিখতে আকর্ষিত হতেন। কিন্তু অনেকের কাছেই এই দিনগুলি এবং তারিখগুলি বিশেষতঃ 'দিবস'গুলো একপ্রকার ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ এইগুলোর পিছনে প্রচুর অর্থ/টাকা পয়সা জড়িয়ে আছে। অনেকেই হয়ত এইগুলির ইতিহাস জানে না, এমনকি তারাও, যারা অত্যন্ত আচারনিষ্ঠার সঙ্গে এই দিনগুলি পালন করে। 'ওরাও পালন করে, তাই আমরাও উদ্‌যাপন করি'—এই খ্যাপমিতে পরিনত হয়েছে। এইটাই, বাস্তবিকই কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে।

রক্ষাবন্ধন-এর দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। গত ২০শে আগস্ট সমস্ত স্কুল এবং অফিস ছুটি ঘোষণা করেছে অথচ ভারতের লোকসভা ২১শে আগস্ট ছুটি ঘোষণা করেছে। কিছু লোকের কাছে, উভয়দিনই উৎসব উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। এছাড়া, রাখী হচ্ছে, 'সুরক্ষার বন্ধন' এবং এক বোন তার 'সাহসী বীর' ভাই-এর নিকট সুরক্ষা প্রার্থনা করে। অনেক গবেষণায় জানা যায়, এই প্রথা মধ্যযুগ থেকে রাজপুতদের মধ্যে শুরু হয়। একটি সংবাদপত্র এটাকে সংবাদের বদলে বিজ্ঞাপন হিসাবে দেখাতে খুবই গর্ববোধ করে। এবং রাখী-র উপর বিজ্ঞাপন দেয়। তাতে লেখা হয়—এই দিনে ভাইদের উচিত তাদের বোনদের উপর 'কড়া নজর' রাখা এবং তাদের উল্লেখযোগ্য গুণ এবং অবদানগুলিকে শ্রদ্ধা করা। এই সংবাদপত্রটি হয়ত এই একটি বিজ্ঞাপনের দ্বারা মহিলাদের সম্পর্কে সারাবছর ধরে লালিত যৌনগন্ধী এবং পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবকে ধুয়ে ফেলার প্রচেষ্টা। এই সুযোগে, আমাদের অনকেই ভুলে যায় যে এই পুরো প্রথাটাই পিতৃতান্ত্রিক এবং যাদের 'সুরক্ষা'র প্রয়োজন, সেই মহিলাদের 'দুর্বল' বলে চিহ্নিত করে, এটা আশ্চর্যের নয় যে, আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতারাও তাদের 'রাখী'-গুলির প্রদর্শন করতে গর্ববোধ করেন। এই আগস্ট মাসে-ই পালিত হয় আর একটি 'দিবস'—স্বাধীনতা 'দিবস'। অনেক শিশুরাই মনে রাখে না অথবা এমনকি শেখে না—স্বাধীনতা দিবস অথবা প্রজাতন্ত্র দিবস কখন হয় এবং সেটা কি। কিন্তু অনেকেই জানে বা শেখানো হয়—কখন Friendship Day, Valentine Day, Mother's Day, Father's Day ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দিবসগুলি এমনকি স্বাধীনতা দিবসকেও আমাদের 'Reliance' কোম্পানীর বিভিন্ন প্রস্তাব এবং দামে ছাড়ের ঘোষণার মাধ্যমে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও 'More', 'Big Bazar', 'Croma' এবং আরও এইরকম বড় কোম্পানী গুলো অবশ্যই আছে। আমাদের 'স্বাধীনতা'কে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।

অনেকে আছে যারা এই দিবস-গুলির বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি মাসের একটি দিন—Valentine's Day কে এইসব দিবসগুলির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিক্ষুব্ধ। এখন, কারুর এদের মতো অত্যন্ত গোঁড়া হবার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ প্রত্যেকটি দিন-ই উদ্‌যাপন করতে পারে। কারণ প্রত্যেকটি দিনের একটি ইতিহাস এবং বিশেষত্ব আছে। Galeano তার বই—*Children of Days*-এ বিষয়ে লিখেছেন। কোন ব্যক্তির অবশ্যই এই দিনগুলির প্রতি অনুরাগ থাকতে পারে এবং তা ঐ দিনের গুরুত্বের থেকেও বেশী থাকতে পারে।

অন্যান্য দিনগুলির বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা Friendship Day সম্বধে আলোচনা করি এর উৎপত্তি এবং শিক্ষা নিই এর ইতিহাস। Wikipedia অনুসারে ''১৯৩০ সালে, Hallmark Card-এর প্রতিষ্ঠাতা' Joyce Hall এই Friendship Day-র মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ২রা আগষ্টের দিনটিকেই মনস্থ করেছিলেন কারণ এইদিনটিতেই

লোকেরা কার্ড পাঠিয়ে বন্ধুত্ব পালন করত।" আরও আশ্চর্যের ঘটনা আছে—"১৯২০ সাল নাগাদ Greeting Card National Association 'Friendship Day'-র প্রচলন করে। কিন্তু এটাও তাদের বাণিজ্যিক চাটুকারিতা Greeting Cards প্রচলনের জন্য—এই অজুহাতে গ্রাহকদের কোপে পড়ে। ১৯৪০ সালের মধ্যে আমেরিকায় Friendship Card-এর প্রাপ্তি হ্রাস পেয়েছিল এবং ছুটি ও আমোদের দিনগুলি বিশালভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইউরোপে এর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যাহা হোক, এশিয়াতে এটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এবং নবদ্যোমে সক্রিয় রাখা হয়েছে।" ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া এই তিনটি দেশ বিশেষভাবে উল্লেখিত কারন, এই দেশগুলিতে এটা একটা খুব বড় আবেগে পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি, কিছু লোক এই দিনটি পালনের জন্য ছুটির দিন দাবী করছে। প্রতি বছরের আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার এই দিনটিকে চিহ্নিত করা হল, হয়ত শ্রমিকদের আর একটা ছুটির দিন দেওয়া এড়িয়ে যাবার জন্য।

'Girl Child Day', 'World Hunger Day', Earth Day', 'Poverty Day' ইত্যাদির সাথে 'Friendship Day'-র জন্য রাষ্ট্রসংঘও ছুটি ঘোষণায় যুক্ত হল এবং ৩০শে জুলাই দিনটি নির্দিষ্ট করল। Wikipedia-র প্রবন্ধে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ আছে—"১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কোফি আন্নানের স্ত্রী নানে আন্নান Friendship Day-র সম্মানে Winnie the Pooh-কে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ববন্ধুত্ব-এর দূত হিসাবে ঘোষণা করলেন। Winnie the Pooh-এর সৃষ্টিকর্তা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড Disney। অর্থাৎ, Diseney-ই হল বন্ধুত্বের রাষ্ট্রদূতের সৃষ্টিকর্তা, যেমন কোকোকোলা সান্তাক্লজের বিভিন্ন রং-এর পোষাকে সজ্জিত হয়ে। আমরা অজ্ঞানে, জ্ঞানে অথবা আনন্দের সঙ্গে এইসব পালন করে চলেছি।

আশ্চর্যজনকভাবে Friendship Day-কে Valentine Day-র মতো চরম বিরোধের মুখে পরতে হয়নি, যদিও উভয়ই একইরকমভাবে 'ভোগবাদ' এবং 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি'র উন্নতি সাধন করে। ভারতীয় ধর্ম যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও কুচেলার বন্ধুত্ব মনে করিয়ে দেয়। তেমন বিপ্লবীরা মার্কস ও এঙ্গলস-এর মহান বন্ধুত্ব অথবা ভারতীয় বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর বন্ধুত্বকে স্মরণ করার কামনা করে। যা কিছু দৃষ্টান্ত থাকুক, Friendship Day-তে মঙ্গল কামনার বিনিময় হয় (মোবাইল চালকদের গীতবাদ্য দ্বারা) এবং ফিতা বাধা হয় (প্রস্তুতকারকদের পয়সার বাক্সয় ঝুনঝুন শব্দের জন্য)। সংবাদ মাধ্যম উদ্যমী হয়, বিজ্ঞাপন দেয় এবং তারকাদের গল্প এবং তাদের 'তারকাখচিত' বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ এবং 'আলিঙ্গন ও মিটমাট'-গুলির কাহিনী তৈরী করে। আমরা এগুলিকে মাতালের মতো আকর্ষণে গবগব করে খাচ্ছি।

আরও কিছু বলার আগে, এটা দ্বিগুণভাবে স্পষ্ট করছি যে, যে কেউই 'Friendship Day' অথবা এর সমতুল্য দিবস অথবা এই ব্যাপারের কোন দিনকে পালন/বিখ্যাত করতে পারে, কারুরই এর বিরোধ করার বিষয় নয়। সবদিনগুলিই সূর্যের নীচে তার সময়কে উপভোগ করুক! কিন্তু একটা সহজ প্রশ্ন চিন্তা করা যাক—আমরা কি এইসব দিবসগুলিকে সমকক্ষরূপে গন্য করতে পারি? একটি Friendship Day কি একটি স্বাধীনতা দিবস-এর সমকক্ষ অথবা একটি Mother's Day কি Women's Day-র সমকক্ষ? যেখানে পূববর্তীর পিছনে কোন সংগ্রামের ইতিহাস নেই কিন্তু পরবর্তীরা তাদের সংগ্রামের ইতিহাসের জন্য সমৃদ্ধ। এখন কি করা হচ্ছে, এই দিনগুলিকে উন্নতি বর্ধন করা হচ্ছে এদের সংগ্রামের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে এবং দিনগুলোকে লুঠ করছে বাণিজ্যের তুলিতে রং করে, যা তাদের ঐতিহাসিক চরিত্র।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বেচাকেনায় দ্রুত জয়লাভের অভিযানে পার্থক্যগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে, 'Women's Day-র থেকে নারীর অধিকারের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। ক্লারা জেটকিন (Clara Zetkin) অথবা সেই যুগের অন্যান্য বীরোচিত যোদ্ধা যারা নারীর অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং নারীর মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পুনঃ সংকল্পের জন্য একটি দিন দাবী করেছিলেন। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিন, খ্যাতিমান ট্যুইটারের অনেকেই এ বিষয়ে অবগত নন। আজ Ponds, Lakme, La Oreal অথবা আরও কিছু বিশেষ শ্রেণীর প্রসাধনী পণ্যের প্রস্তুতকারক, যারা নারীর সুন্দর ত্বকের প্রতিশ্রুতি দেয়, নিজেদের 'Women's Day-র রক্ষক হিসাবে প্রসারিত করে। এটা করে সকলরকম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, যেন যৌনবাদী সংবাদপত্র নারীকে আমাদের সম্মান জানাবার ভবিষ্যদ্বাণী করছে।

একইরকমভাবে, স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসকে ধীরে ধীরে এমন দিবসে পরিবর্তিত করা, যাতে এই দিবসগুলিকে লোকে স্মরণ করবে—কর্পোরেট সংস্থার দ্বারা প্রস্তাবিত ভোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা এবং ছাড় প্রদানের দিবস হিসাবে। ভুলে যান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ। এমনকি, আমাদের নতুন প্রজন্মের ভারতীয়দের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামও হারিয়ে গেছে এবং তা এমন পর্যায়ে যে, কে শহীদ এই নিয়ে আলোচনা চলছে। কোন আদর্শের জন্য আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুদ্ধ

করেছিলেন এবং তার কতটা পথ আমরা যেতে পেরেছি—এটা জানা বা বোঝার চেয়ে কে শহীদ এই নিয়ে চর্চা চলছে।

লোকসভায় আমাদের বিরোধীনেত্রীর বক্তব্যের উপর প্রশ্ন করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। উনি বলেছেন—''আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হতে পারি না কারণ আমরা ১৯৪৭ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু এখন আমরা 'কংগ্রেস থেকে স্বাধীনতা'-র যুদ্ধে অংশীদার হব।'' কারুরই ওনার কংগ্রেসের থেকে 'স্বাধীনতা'-র যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য নেই। তিনি হয়ত ১৯৪৭ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'সুযোগ' থেকে 'বঞ্চিত' হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা প্রশ্ন করতে চাই, ওনার পরামর্শদাতা বরিষ্ঠ নেতারা কি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন? না, করেননি। শুধু তারাই নন, সমগ্র 'সংঘ পরিবার' স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। এছাড়াও, অনেক দৃষ্টান্ত আছে যার অনেক প্রমাণ আছে—কিভাবে তারা ব্রিটিশদের সাথে অনেক সময়েই সমঝোতাও করেছিলেন। এটাই হচ্ছে তাঁদের ইতিহাস, যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে গোপন রাখতে চাইছে। এই ইতিহাসটাই বাণিজ্যের মোড়কে লুকিয়ে থাকছে। এটা আশ্চর্যের নয় যে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি ''আভাস দিয়েছেন যে তারা ক্ষমতায় ফিরে এলে পাঠ্য পুস্তকের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করে দেবে'—*Hindustan Times*-এর ২৩শে জুন ২০১৩-র সংবাদে প্রকাশ। ইতিমধ্যেই, আমাদের ইতিহাসকে ভারসাম্যহীন করা হয়েছে কেবলমাত্র একটি ধারা এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় নেতার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর জোর দিয়ে, আর অন্য ধারাগুলি এবং নেতাদের সংগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ আড়াল করে অথবা তাদের সম্পর্কে ভুল ধারনার উপস্থাপনা করে। এই বিপদজনক ঝোঁক-কে যদি আটকানো না যায় তাহলে আমাদের ইতিহাস আরও একপেশে হবে।

সংবাদ মাধ্যম এবং বাজারেরও তাদের নিজস্ব কর্মসূচী আছে—মুনাফা সৃষ্টির স্বার্থ আছে এই দিবসগুলির বাণিজ্যিককরণে এবং প্রত্যেকটি দিনকে সরলীকরণ করে। যারা ইতিহাসকে ভয় পায় তারা এই সমস্ত প্রচেষ্টা থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য দাড়িয়ে যায়।

তাই আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায়—এই ছাইপাঁশগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের আগুনকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করা, বর্তমানের বস্তুগত মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য মানুষের কাছে পেশ করা। বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকটের সময় এটা সব থেকে প্রয়োজনীয়। আমরা যদি এটা মানি তাহলে আমরা প্রত্যেকে এই গৌরবান্বিত কাজ এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব-র জন্য উঠে দাঁড়াই।

(People Democracy, Answer-19-25-এ G. Mamatha-র লেখা ইংরাজি প্রবন্ধ 'These Days & Dates'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।)

নিবন্ধ মুক্তির শারদোৎসব-২০১৩ (ইং)

অসিত মজুমদার

সারাবিশ্বব্যাপী হিন্দু সমাজের বাঙালীর সবচেয়ে বড় মিলন উৎসব দুর্গোৎসব। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষজন এই শারদীয়া দুর্গাপূজাকে তাই জাতীয় পূজা ও উৎসব হিসাবে পালন করেন। উদযাপন করেন দেশ বিদেশের মানুষ অত্যন্ত গভীর আনন্দের সহিত এই শারদোৎসব। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে যে মলিনতা লক্ষ্য করা যায়, যে একঘেয়েমি থাকে তা থেকে মানুষ একটু মুক্তি পেতে চায়। এই শারদীয়া উৎসব চলমান জীবন থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শারদ উৎসব হল সেই মুক্তির উৎসব যেখানে প্রতিটি মানুষ তার জীবন ধারায় নিজের কর্মব্যস্ততা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এবং সামাজিক জীবনে পরিচালনায় তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। আর তাই মানুষ সাংসারিক। সংসারের নানা ঝামেলা মিটিয়ে পরিবারের প্রতিটি মানুষের মন জয় করার জন্য অর্থের রাস্তায় হাঁটতে হয়, সেখানে কেউ সফল হয়, কেউ বা হয় না। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে মানুষ বর্তমানে বিপর্যস্ত। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সকল মানুষকে বিচলিত করছে। কিন্তু তদপেক্ষাও বাঙালীর কাছে এটি এমন একটি আনন্দময় উৎসব, এখানে আপামর বাঙালী এই শারদ-উৎসবের জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকেন। একটা দুর্গাপূজা শেষ হতে না হতেই—আবার আকুল আগ্রহে পরের বছরের শারদোৎসবের দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করে। সর্বজনীন উৎসবের অর্থ সকল শ্রেণীর মানুষের এক সঙ্গে অংশগ্রহণ করা। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন হয়ে এক সঙ্গে চলা ও আনন্দ পাওয়াই উৎসবের মানে। সর্বজনীন আনন্দে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সকলের নির্মূল মুক্তধারায় মেতে ওঠাই উৎসব। এই উৎসব মানুষকে সর্বজনীন, বিশ্বজনীন করে তোলে।

বৈচিত্র আনে মুক্তধারায়, উদ্ভাসিত করে, এবং মানুষকে সর্বজনীনতা দেয় এই দুর্গোৎসব। আরাধ্য 'মা' দেবী ভবানীর কাছে আমাদের প্রার্থনা শুধুমাত্র এই পূজার কয়েকটি দিন নয় জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমরা যেন, নিজ নিজ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা, অগাধ ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে তাঁহার পূজায় নিয়োজিত থাকি এবং সমাজের সকলকে তাঁহারই জ্ঞানে আপন করে লইতে পারি।

ঢং কুরু-কুরু ঢং কুরু-কুরু ঢাক বাজছে, সঙ্গে বাজছে কাশি, তারি তালে নাচছে মানুষ, হাসছে আলোর হাসি, খেলা, সব মিলিয়ে আনন্দে তাই বাঙালীর রস মেলা। বাঙালীর এই রস মেলা চলতে থাকে বিজয় দশমীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত। 'মা'-কে বিসর্জন দিয়ে, বাঙালীর মধ্যে চলে শারদীয়ার বিদায় আলিঙ্গন—কোলা-কুলি-প্রণাম ভালবাসার আদান-প্রদান। বড়দের প্রতি ছোটদের প্রণাম এবং ছোটদের প্রতি বড়দের আশীর্বাদ পর্ব। এই রীতি চলতে থাকে বাঙালীর আর একটা গৃহপূজা লক্ষ্মী পূজা পর্যন্ত। তারপরে বাঙালীর কালিপূজার নির্ঘণ্ট বেজে ওঠে। একটা আনন্দ পেরোতে না পেরোতেই আবার আর একটা পার্বন। কথায় আছে 'বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বন'। এতসব আনন্দের পর ও যেন, বাঙালীর জীবনে হতাশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হতাশার মধ্যে বাঙালীকে গ্রাস করছে বাঙালী সমাজের অবক্ষয়। তরুণ সমাজ তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। কারণ হিসাবে বলা যায়, এত আনন্দ উৎসবের মধ্যেও বাঙালী তরুণ সমাজের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করেই চলেছে। এই হতাশা হল মানসিক বিকারের হতাশা। মানবিকতা বোধের হতাশা। আজ থেকে বিগত বেশ কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমার ছোট বেলাকার সময় দিয়ে আমি বলতে পারি তখন এবং এখন অনেক পার্থক্য। তখন দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা গভীর ভাব-ভালোবাসার আদান-প্রদান অবিরল লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু এখন 'যেন মানুষের মধ্যে সেই আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। আমরা নিউক্লিয়াস পরিবার হয়েই যেন সেটা বেশী লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ এটাই—একান্নবর্তি পরিবার আমাদের একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার মেলবন্ধন তৈরী করতে শেখায়। কিন্তু বর্তমান সমাজ তার ব্যতিক্রম। বর্তমানে আমরা বেশীরভাগ মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছি। যে যা কিছু করি সবই লোক দেখানো। আন্তরিকতার কোন বালাই নেই। 'মা' ভবানী তাই আমাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা পাঠিয়েছে যে, তুমি-আরাধ্য দেবী 'দুর্গাকে' সাদা মনে পূজা কর এবং সব কিছু সৎ মনে অর্পন কর। তবেই 'মা' আমাদের পাপ মোচনের মুক্তির রাস্তা দেখাবে। আড়ম্বরতা চাকচিক্য বর্জন করে, উদারতার মধ্যে তাঁকে বরণ করলে, তবেই আমরা আমাদের পাপক্ষলন হবে। আর তবেই বাঙালীর এই স্বার্থক দিনগুলি অর্থাৎ দুর্গাপূজার ৫ (পাঁচ) দিন আনন্দ সমারোহের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এত কিছুর মধ্যেও বর্তমান সভ্যতার আমূল পরিবর্তন আমরা প্রতিটি স্তরেই লক্ষ্য করেই চলেছি। কিন্তু তদপেক্ষা সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে, কিছু মানুষ তাদের অসভ্যতার চরমমাত্রা ঘটিয়ে চলেছে। আর তার জন্য দায়ী আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধিকারী রাজনৈতিক ছত্র-ছায়ায় থাকা কিছু মানুষ। এবং দায়ী করব যুব সমাজকেও। কারণ যুব সমাজ কোন ভালো কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে না। বলাই বাহুল্য তার পিছনে দূরবিত্তদের হাতই বড় অস্ত্র। তাই যুব সমাজ যেন অথর্ব হয়ে গেছে। তারা কোন ভালো কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে নারাজ। তারা প্রতিবাদী না হয়ে, বরং প্রতিভোগীতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষকের আসন গ্রহণ করছে। আর এটাই আমাদের বাঙালী সমাজের বড় অবক্ষয়।

আমাদের সমাজের তথা বাঙ্গালীদের মধ্যে এই অবক্ষয় বেশীরভাগ সময় মাথাচাড়া দিয়ে, সমাজের পরিবেশকে কলুষিত করছে। বলাই বাহুল্য তরুণ সমাজ তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

বর্তমান সমাজের তরুণ সমাজকে দেখলে মনে হয়, যেন তারা একটু বিভ্রান্ত। কোথায় যেন একটা না পাওয়ার যন্ত্রণা, অভাববোধ, তাদের মধ্যে কাজ করেই চলেছে। আমার ধারণা তারা যেন একটু উচ্ছশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে এবং যেটা ভারতীয় তথা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের মূলধারা তারা সেটা গ্রহণ করতে পারছে না। এটা কিন্তু একটা অসুস্থ সমাজের পরিচয় বহন করে।

কারণ হিসাবে বলা যায়—ভারতের শাশ্বতবাণী ত্যাগ ও সহজ জীবনযাত্রা। আর সেখান থেকে আমরা বিচ্যুত হচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে একটা নৈরাজ্যকর মনোভাব তাদের ও আমাদের গ্রাস করছে। সেই জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের এই বিষয়ে অবহিত হতে হবে, এই কলুষ জীবনের প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে, কলুষ জীবনের প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে সমন্বয়ের ও ত্যাগের মাধ্যমে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। যে সমাজ হবে কলুষহীন ন্যায় নিষ্ঠা সম্পূর্ণ। তাই ''মা' দুর্গাদেবীর'' কাছে এই হোক আমাদের প্রার্থনা যা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা হৃদ্যতাপূর্ণ সাত্ত্বিক জীবনবোধ ও সর্বোপরি সর্বজনীন জীবনে আমরা যেন উন্নত হতে পারি।

মন কেমন করে, মাঝে মাঝে

কিন্নর রায়

হদ্দ ছোটবেলায় (বালির) ৬৭ নম্বর গোস্বামী পাড়া রোডে দোতলার ছাদে মেয়েলি আড্ডা বসত, মূলত শীতে। ভাড়া থাকি সে বাড়ির একতলায় বাড়িওয়ালা গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। একখানি ঘর, লাগোয়া চিলতে রান্নাশালা। অনেকটা দূরে খাটা পায়খানা। সেটা ১৯৫৯-৬০। সেদ্ধ চাল এক কিলো পঞ্চাশ নয়া পয়সা। এক কিলো নুন তিন নয়া। কচ্ছপের মাংস ছ-আনা। পাঁঠার মাংস পাঁচ সিকে—মানে এক টাকা চার আনা। রুই মাছের একটা বড় মুড়ো চার আনা—পঁচিশ নয়া পয়সা। কাতলার মুড়ো ছ-আনা। রেল চাকুরে বাবা এই ঘরের মাস ভাড়া তিরিশটা টাকা দিতেই রীতিমত হাঁপিয়ে ওঠেন।

খাতায়-কলমে দশমিক হিসাব—চৌষট্টি পয়সায় পুরো এক টাকার বদলে একশো নয়া পয়সায় এক টাকার অঙ্ক চালু হলেও বাজারে তখনও পুরনো পয়সা, আনি, দোআনি, ডবল পয়সা চলে, বিশেষ করে বালি যেমন তেমন মফস্বলে। আর পুরনো পয়সাদের চলতে দেখেছি ওড়িশায়, পুরী, ভুবনেশ্বরে। যাক ওসব কথা পশ্চিমবাংলার বহু দোকানেই এমনকি শহর কলকাতাতেও চলে মণ, সের, পোয়া, ছটাক, আধ সেরি বাটখারা।

সেই যে ছাদের ওপর মেয়েলি আড্ডা, তাতে তো চটের আসনে ছুঁচের ফোঁড়ে সুতোর ডিজাইনে আসন বোনার জলপনা। ডিজাইন তোলা, তুলিয়ে দেওয়া, আসনের নানান নকশা নিয়ে গোপন অথবা প্রকাশ্য টানাপোড়েন। সেই সঙ্গে আছে উলের সাদা অথবা রঙিন বলে তিনটে সোজা, দুটো উল্টো—যার মানে তিন ঘর সোজা, দু-ঘর উল্টো—এমন ফেলা-তোলার খেলা দু-কাঁটায় খেলতে খেলতে সোয়েটার, কার্ডিগান, পুলওভার। তারপর আছে মাফলার, টুপি, মোজা। মোজা আর টুপি বোনা বেশ ফৈজতের। এইসব মেয়েলি আড্ডায় নানান গপ্‌পো, আড্ডা। ঠাট্টা-ঠিশেরা, সঙ্গে সংকেতময় বহু ধরনের অর্থ হয় এমন বাক্য।

একটু দূরে সামান্য উঁচু কার্নিশের গায়ে বসে বসে হাঁ করে সেইসব আড্ডাবাক্যি গেলার চেষ্টায় থাকি। তবে কান-মন সেদিকে থাকলেও চোখ তো আকাশে। যেন সে ঘুড়ি দেখছে। নয়ত বিদায়বেলায় চিল। ঘরে ফেরা পাখির ঝাঁকও কি চোখে আছে সেই খোকার! নয়ত ঘুড়িক্কে ঘুড়ি—ঘুড়ি দুগুণে ভোকাট্টা—প্যাঁচের টানাটানিতে কেটে যায় ঘুড়ি। গোঁত খেয়ে আবার ওঠে।

খোকাটির বয়স ছয়-সাত। বিভূতিভূষণের অপুকে কেন যে হাঁ-করা ছেলে বলা হয়েছিল, সে জানে না। কানকে অলওয়েভ সেট রেডিওর এরিয়াল করে সে সবকথা শোনার সেই সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করে। এই আড্ডাতেই 'নবকল্লোল' দেখি, সবার আগে। মাস মাস বেরয়।

মা, পাড়াতুতো মাসিমাদের এই বৈঠকি গল্পগাছা, কূটকচালি, পি এন পি সি-র মধ্যেই তো 'সিনেমাজগৎ', 'উল্টোরথ'। দুটোই মাসে মাসে বেরয়, একই বাড়ি থেকে। 'উল্টোরথ' একটু বেশি কুলিন। 'সিনেমাজগৎ' তুলনায় কম। এর আরও কয়েক বছরের মধ্যেই 'প্রসাদ'। তারপর বেশ কয়েক বছর পার করতে করতে একে একে 'মৌসুমী', 'রজনীগন্ধা' সেই সঙ্গে 'উত্তম'। এসবই সিনেমা পত্রিকা। সিনেমা আর সাহিত্য সেখানে একাকার। বিশেষ করে 'সিনেমাজগৎ', 'উল্টোরথ', 'প্রসাদ'-এ কে না লেখেন! সত্তর দশকে তাঁদের লেখক সূচিতে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবাই। সে বিমল মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু—সবাই।

আসলে বড় পুঁজি তার বিশাল খবরের কাগজ সাম্রাজ্যর যে বৃহৎ ছাতা তার নিচে তখনও নানা ধরনের, স্বাদের পত্রিকা জমিয়ে তুলতে পারেনি। ছোট পুঁজি, সাহিত্য মনস্ক কিছু মানুষ তখনও পত্রিকা—মাসিক পত্রিকা বার করার কথা ভাবছেন। একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসন তখনও পত্র-পত্রিকার জগতে সেভাবে ছায়া ফেলতে পারেনি।

একটা সময় ছিল যখন বাঙালি শিক্ষিত রুচিশীল উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় দারুণ আড্ডা ছিল। চা-মাছের কচুরি, সিঙারা অন্য অন্য খাবার-দাবারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে রসনার রসই চলকে উঠত তা নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্য, ভ্রমণ, সিনেমা, থিয়েটার, গান—সব নিয়েই কিছু কথাবার্তা হত।

এমন আড্ডা বহু সাহিত্যপত্রের জন্ম দিয়েছে। তথাকথিত বাণিজ্য ধারার কাগজ নয়, আবার ঠিক আজকের লিটিল ম্যাগাজিনও বলা যাবে না তাকে, এমন বহু পত্রিকা তখন বাজারে এসেছে। বিক্রি হয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে যাদের জন্ম, তারা যখন একটু একটু করে বালকবেলা বা বালিকাবেলা ছাড়িয়ে কিশোর-কিশোরীবেলার দিকে যাচ্ছে, তখন 'কল্লোল' নেই! 'শনিবারের চিঠি', 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' স্মৃতিমাত্র। 'মাসিক বসুমতী', 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বেরয়। 'মাসিক অথবা সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্পাদনায় জয়ন্তী সেন। তিনি তখনকার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেনের বড় ভাই সুকুমার সেনের কন্যা। অশোক সেন তখন 'বসুমতী'র মালিক।

আমরা যখন বেড়ে উঠছি বাজারে তখন 'উল্টোরথ',

'নবকল্লোল', 'প্রসাদ', 'সিনেমাজগৎ'-এর পাশাপাশি 'জলসা' আছে। 'নাচঘর' বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নামটি জড়িয়ে ছিল 'নাচঘর'-এর সঙ্গে।

'নবকল্লোল' বেরত উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুর থেকে। এখনও বেরয়। সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন মজুমদার। তিনি দৃষ্টিহীন নামে ছোটেদের-বড়দের লেখা লিখতেন। অন্ধ মধুসূদন বাবুকে দেখেছি। গলার স্বর মিহি। মিলের ফাইন ধুতি, সিল্কের শার্ট, সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ে কালো চামড়ার পা ঢাকা জুতোয় চামড়ার তৈরি ফুল, ঠিক জুতোর 'টো'-এর কাছাকাছি। খুবই সংবেদনশীল মানুষ।

যতদূর জানি উনি চমৎকার মানুষ ছিলেন। গান জানতেন। সঙ্গে লোক নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতেন নিয়মিত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় শৈলী অনুভব করতেন তাঁদের কণ্ঠ মাধুর্য।

'নবকল্লোল' তো বিনোদনে ছিল। সাহিত্যেও ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত লিখেছেন এই পত্রিকায়। দেব সাহিত্য কুটির-এর ছোটদের পত্রিকা 'শুকতারা'। বছর বছর পুজোর সময় বেরয় পুজো বার্ষিকী। 'দেবালয়', 'মনিহার', 'দেবদেউল', 'পারিজাত', 'ইন্দ্রধনু'। কি চমৎকার ছাপা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিধায়ক ভট্টাচার্য—সবাই এখানে লেখেন। কমিকস আঁকেন ময়ূখ চৌধুরী। বাঙালি তখনও কমিকস কেতাব—বেতাল-ডায়না পামার, মজবুড়ো, বেতালের ঘোড়া তুফান, কুকুর বাঘা-কে জানে সে কুকুর না নেকড়ে, নেফ্রিতিতি নামে ডলফিন, কিলাউয়ির সোনাবেলা, খুলি গুহা—সব মিলিয়ে যে চির আশ্চর্য জগৎ, তা হাতে পায়নি। কমিকস কেতাবের হিরো হিসেবে ফ্ল্যাশ গর্ডনও আসেনি তখন। কমিকস পাতার ক্ষুদে টিনটিন বহু দূরে। কেবল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দুইয়ের পাতায় ফালি কমিকসে অরণ্যদেব, তার ঘোড়া হিরো আর কুকুর (কুকুর কী, না নেকড়ে?) ডেভিল। সেই সঙ্গে গোয়েন্দা রিপ কার্বি, তার বাটলার কাম অ্যাসিসটেন্ট ডেসমন্ড। প্রতি রবিবার রবিবার জাদুকর ম্যানড্রেক, জানাডু, ম্যানড্রেকের বাবা থেরন, পরাক্রমশালী লোথার, সেই সঙ্গে রাঁধুনি হোজো—সব মিলিয়ে আশ্চর্য কোনো এক ভুবন। পরে 'মডেস্টি ব্লেজ'-এ এল বাংলা কমিকস-এ। তার পাশাপাশি নারায়ণ দেবনাথের 'হাঁদাভোদা', 'বাঁটুল দ্য গ্রেট', 'নন্টে ফন্টে'। ষাটের দশকের শেষেই বেরতে শুরু করে 'জীবন যৌবন', 'সুন্দর জীবন', 'যৌবন' নামে বাংলা পর্ণোগ্রাফি পত্রিকা। তার বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান চলে। এইসব পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়। সম্পাদক, মুদ্রকদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে থাকে। এঁদেরই কেউ কেউ পুলিশের ঝামেলা মেটার পর 'অপরাধ', 'শেষ সংকেত', 'ক্রাইম', 'উল্কা' নামে থ্রিলার-পত্রিকা বার করা শুরু করেন বাংলায়। অমিত চট্টোপাধ্যায়-রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়দের 'রোমাঞ্চ' আগেই ছিল। সেই সঙ্গে 'রহস্য', 'গোয়েন্দা'। 'রোমাঞ্চ'-তেও নামকরা লেখকরা লিখতেন। 'ক্রাইম' ভেঙে হল 'কিমিনাল'। একেবারে নতুন কাগজ। সম্পাদক সহদেব সাহা সেক্স ম্যাগাজিনে করতেন না। অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদনা করতেন 'ফ্যানটাসটিক'। তার আগে বেরত 'আশ্চর্য'। কল্প বিজ্ঞানের পত্রিকা। তার কিছুদিন পর বেরল 'বিস্ময়' সেটিও কল্পবিজ্ঞান-এর পত্রিকা। 'ফ্যানটাসি' নামে একটি সায়ফি পত্রিকারও বেরিয়েছিল মাত্র কয়েকটি সংখ্যা, সেটি সম্পাদনা করতেন 'অপরাধ' পত্রিকা সম্পাদক অশোক রায়।

'নবকল্লোল'-এ শারীরিক প্রশ্ন ও উত্তর বিভাগে প্রশ্নের জবাব দিতেন ডা. রায়। 'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগৎ'-এর ছবি তুলতেন মূলত টুলু দাস। উত্তম-সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, মাধবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী, বসন্ত চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, সন্ধ্যা রায়, সুলতা, মৌসুমী, সুনিতা সান্যাল, রবি ঘোষ, জহর রায়, ছায়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলি, তুলসী চক্রবর্তী, ভারতীদেবী অনুভা, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিত বরণ—সকলেই ধরা পড়তেন তাঁর ক্যামেরায়।

কলিন পাল, শচীন ভৌমিকরা দিতেন পাঠকদের নানা প্রশ্নের উত্তর। সেই সব প্রশ্ন-উত্তরে অ্যাডাল্ট গন্ধ থাকত বহু সময়েই। 'দাদাজি'র শিষ্য বীরেন সিমলাই বার করেন সাপ্তাহিক 'ঘরোয়া'। সত্তর দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তার বিক্রি অনেক। পাক্ষিক 'আনন্দলোক' বেরনোর পর 'ঘরোয়া' মার খেতে থাকে। তারপর ক্ষীণ হতে হতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। সত্তরের প্রায় শেষ পর্বে সত্য গুহরা দায়িত্ব নেওয়ার পরও 'ঘরোয়া' তার আগের জায়গা ধরতে পারেনি।

'স্টার ডাস্ট', 'সিনে ব্লিৎস' থেকে বহু খবর—সাধারণভাবে মুম্বাইয়া ফিল্ম জগতের গসিপ স্টোরি 'ঘরোয়া'তে আসত। ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী, যিনি মূলত অনুবাদক ছিলেন, একটা সময় সিডনি শেলডন, জেমস হেডলি চেজ, অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, হ্যারল্ড রবিন্স দশ হাতে বঙ্গায়িত করতেন। রণজিৎ সিকদার নামে একজন লেখক নিয়মিত লিখতেন 'ঘরোয়া'-তে। লিখতেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়রাও।

'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগৎ' সত্তর দশকের গোড়ায় গোড়ায় চালাতেন বিকাশ বসু। তিনি আগ্রার রাধেস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্য। পরে দিলীপবাবু, বিজয়বাবুরা 'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগৎ' চালাতেন। 'উল্টোরথ' ভেঙে 'উচ্চরথ' হল।

তার খুব বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে। বড় জোর তিন-চারটে সংখ্যা বেরল 'উচ্চরথ'-এর। তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

'সাত রং', 'জয়জয়ন্তী'—এরকম কয়েকটি সাহিত্য-সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—সব মেশান পত্রিকা বেরয়। 'জয়জয়ন্তী' বেরয় ষাট দশকের শেষে, নয়ত সত্তরের গোড়ায়। সারা কলকাতায় দেওয়ালে দেওয়ালে 'জয়জয়ন্তী'-র বড় বড় রঙিন পোস্টার। রবি বসুমশাই ছিলেন কি এই পত্রিকার অন্যতম রূপকার?

কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরত 'রূপমঞ্চ'। ষাটের দশকের গোড়াতে তার রমরমানি যথেষ্ট। পরে একটু একটু করে মরে গেল পত্রিকাটি। সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, সাহিত্য—ধারাবাহিক উপন্যাস—সবই দুই মলাটের ভেতর।

'নতুন খবর' বেরত সিনেমার কাগজ হিসেবেই। স্টুডিও পাড়ার খবর থাকত তাতে। পুজো সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস। সিনেমার স্টিল ফটো, নায়ক-নায়িকাদের ছবি।

ছোটদের পত্রিকা 'রঙমশাল', 'রামধনু', 'মৌচাক', 'শিশুসালী' একটু একটু করে রুগ্ন হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল আমাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এম.সি. সরকার থেকে বেরত 'মৌচাক'। আশুতোষ লাইব্রেরি থেকে বাজারে আসত 'শিশুসাথী'। 'রোশনাই', 'ঝুমঝুমি' বেরত এশিয়া পাবলিশিং থেকে। সম্পাদনা করতেন গীতা দত্ত। তিনি এশিয়া পাবলিশিংয়ের মালিক মৃণাল দত্তর স্ত্রী। রামধনুর সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

'তেপান্তর', 'শিশুতীর্থ' নামে দুটি পত্রিকা বেরয় কলেজস্ট্রিট থেকে। 'শিশুতীর্থ'র প্রকাশক ছিলেন 'স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স'। 'তেপান্তর' সম্পাদনা করতেন নির্মলেন্দু গৌতম। বেরত রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট থেকে।

বাংলা 'সিনে অ্যাডভান্স' বেরত প্রতি সপ্তাহে। 'সোনার কাঠি' নামে একটি ছোটদের পত্রিকা বেরত কলেজস্ট্রিট মার্কেট থেকে। 'আনন্দ' নামে বার্ষিক একটি সংকলন সম্পাদনা করতেন 'কামানের মুখে নানকিং', 'অসি বাজে ঝন ঝন'-এর লেখক ধীরেন্দ্রলাল ধরা 'ইতিকথা' নামে একটি পত্রিকা বেরত দক্ষিণ কলকাতা থেকে। সম্পাদক বিক্রম রায়চৌধুরী।

মাসিক 'শিলাদিত্য' ছিল সাহিত্য পত্রিকা। ইত্যাদি প্রকাশনী থেকে বেরত 'শিলাদিত্য'। সম্পাদক ছিলেন বিমল কর। ইত্যাদি প্রকাশনী থেকেই বেরত 'পরিবর্তন'। বাংলা ভাষার প্রথম নিউজ ম্যাগাজিন। ধীরেন দেবনাথ, সুধীর চক্রবর্তীরা ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। 'পরিবর্তন'-এ তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাওয়া বাঁক কাঁধের তীর্থযাত্রীদের নিয়ে মলাট-কাহিনি, পাশাপাশি অন্য একটি সংখ্যায় বিষ্ণুপুরে মনসা পুজো উপলক্ষে সাপের মেলা তাতে মলাট কাহিনির বিষয়, মনে আছে এখনও। 'শিলাদিত্য'-তে বিমল কর লিখেছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর থেকে কম বয়সি লেখকদের নিয়ে। নারায়ণ সান্যাল লিখেছিলেন 'তিমি তিমিঙ্গিল' নামে একটি উপন্যাস। শিলাদিত্য সম্পাদনার ব্যাপারেও কি জড়িত ছিলেন নারায়ণ সান্যাল মশাই— এখন আর মনে পড়ছে না।

ইত্যাদি প্রকাশনী থেকেই আশির দশকে বেরয় মেয়েদের পত্রিকা 'সুকন্যা'। তার কিছু আগে মায়া সিদ্ধান্তর সম্পাদনায় বেরয় 'মালিনী'। ইত্যাদি প্রকাশনী থেকেই পড়াশোনার পত্রিকা 'নবম দশম', ছোটদের কাগজ 'কিশোর মন' বেরয়। 'কিশোর মন' সম্পাদনা করতেন অদ্রীশ বর্ধন।

'আজকাল' থেকে বেরিয়েছিল টিভি পত্রিকা- 'টেলিভিশন'। মাস গেলে একখানা কাগজ। পরে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত মশাই সেই কাগজ বন্ধ করে দেন লিখিত ঘোষণা করে। 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার'ও বেরত 'আজকাল' থেকেই, তার ভাষা অবশ্য ইংরেজি। ইত্যাদি প্রকাশনী থেকেই বেরত 'খেলার আসর' খুবই পাঠকপ্রিয় হয়েছিল সেই কাগজ। পরে বেরয় 'খেলার দুনিয়া'। 'ক্রীড়া আনন্দ' বেরতে থাকে অজয় বসুর সম্পাদনায়। শ্যামদুলাল কুণ্ডু ছিলেন সেই পত্রিকার শিল্প নির্দেশক। 'খেলা' নামে খেলার পত্রিকা বেরয় এখনও আজকাল থেকে। বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল পত্রিকা গোষ্ঠীর ছোটদের কাগজ 'সকাল'। 'প্রতিক্ষণ' ছাড়ার পর পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন এর দায়িত্বে। যদিও সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত অশোক দাশগুপ্তরই নাম। 'দেয়ালা' নামে একটা ছোটদের পত্রিকা বেরত কালিঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রিট থেকে। সম্পাদনা করতেন শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমে মিনি বুক সাইজে বেরত 'দেয়ালা'। আমাদের অনেকেরই মনে আছে ষাটের দশকে মিনি বুক আন্দোলন শুরু করেছিলেন কথাকার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'বিপ্লব ও রাজমোহন' বেরিয়েছিল মিনি বুক হিসেবে। ষাট সত্তরে 'পত্রাণু', 'সেঁউতি', 'নিক্কণ', 'সম্রাজ্ঞী'—এরকম অনেক মিনি পত্রিকা বেরত। অমিয়বাবুরা করতেন 'পত্রাণু'। সত্যজিৎ রায় মশাই এঁকেছিলেন প্রচ্ছদ। 'ঝুমঝুমি'ও ছিল মিনি সাইজের।

'মাস পয়লা', 'পাঠশালা' এইসব পত্রিকা স্টলে দেখিনি। 'আগমনী' দেখেছি। এ সবই ছোটদের কাগজ। 'সন্দেশ' তো তখনও ছিল, এখনও আছে। সত্যজিৎ-উপেন্দ্রকিশোর শোভিত সেই পত্রিকার কদরই আলাদা। শীলা মজুমদার, নলিনী দাস, জীবন সর্দার, গৌরী ধর্মপাল, শিশির মজুমদার, গৌরী ধর্মপাল, মঞ্জিল সেন—এঁরা সবাই নিয়মিত সন্দেশী। আরও অনেকে ছিলেন। নলিনী দাসের 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' তো এখানেই, বারে বারে। সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য লেখা 'একশৃঙ্গ অভিযান', সেও তো 'সন্দেশ'-এর পাতায়।

সত্তর দশকে তারাদাস বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনা করতেন

একটি ছোটদের কাগজ। নাম মনে নেই। কলেজস্ট্রিট মার্কেট থেকে বেরত সেই পত্রিকা। ওভারল্যান্ড থেকে বেরত ছোটদের পত্রিকা 'সোনামানিক'।

হিন্দিতে বেরত 'চন্দামামা', এখনও বেরয় কী! ছোটদের কাগজ বলা হলেও, তাতে মূলত হিন্দু পুরাণ কাহিনি। এরই বাংলা 'চাঁদমামা' বেরতে শুরু করে মাসে মাসে, সম্ভবত সত্তরের শেষে, কি আশির দশকে। সত্তরে দেখেছি হিন্দিতে ছোটদের পত্রিকা 'নন্দন', 'পরাগ'। 'ম্যাড' ম্যাগাজিনের অনুকরণে 'লোটপোট'—নিপাট চুটকির পত্রিকা। 'শেখ চিল্লি' নামে একটি চরিত্র ছিল তাতে। সম্ভবত সত্তর দশকেই বন্ধ হয়ে যায় জে এস—'জুনিয়ার স্টেটসম্যান'। 'টার্গেট' নামে ছোটদের পত্রিকা দেখি আশির দশকে। ভাষা ইংরেজি। 'ইন্ডিয়া টুডে'-র ঘর থেকে পত্রিকার শুরুয়াত।

সাপ্তাহিক 'ধর্মযুগ', সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান', 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'—সবই ছিল ষাট-সত্তরের খবর-সাহিত্য-বিনোদন কেন্দ্রিক। প্রবাসী বাঙালিরা—ইলাহাবাদ, কাশী, কানপুর, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুরে 'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগৎ', 'প্রসাদ', 'নবকল্লোল', সাপ্তাহিক 'দেশ', সাপ্তাহিক 'অমৃত'-র পাশাপাশি এইসব পত্রিকাও কিনতেন। 'সান' নামে একটি ইংরেজি ট্যাবলয়েড বেরত সত্তর দশকে। ক্রুসলির জীবনকথা তাতে বেরয়, মনে আছে। 'সূর্য' বার করতেন মানেকা গান্ধী। 'সান', 'সূর্য' দুটোই ইংরেজিতে। 'সান' সাপ্তাহিক। 'সূর্য' মাসে মাসে। 'সূর্য'তেই জনতা সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রামের পুত্র সুরেশ কুমারের যৌন কেলেঙ্কারীর খবর ছবি সমেত বেরয়। তখন 'স্টিং অপারেশান'-এর ধারণা আমাদের জীবনে আসেনি। 'সূর্য'-তে নানা ধরনের ঐতিহাসিক তলোয়ার, ছোরা, কিরীচ নিয়ে একটি অসাধারণ মলাট কাহিনি হয়েছিল।

'আনন্দমেলা' আলাদা পত্রিকা হিসেবে বেরতে শুরু করে ষাটের দশকে। পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন শিল্প নির্দেশনার মূল পরিকল্পক। বিমল মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু, মনোজ বসু—সকলেই লিখতে আরম্ভ করলেন এই পত্রিকায়। ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করলেন বিমল মিত্র। রঙিন ছবি, চমৎকার ছাপা। 'আনন্দমেলা' পাক্ষিক হল, মাসিক হল। বড় থেকে ছোট হল। আবার বড়। মাঝে হিন্দিতে 'মেলা' বেরল। বন্ধ হয়ে গেল। 'মেলা', 'রবিবার', 'সানডে', 'মেট্রোপলিটন', 'ভূমিলক্ষ্মী', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড', 'নিউ দিল্লি'—বহু কাগজই তো বন্ধ হয়ে গেল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গ্রুপের।

খেলার মাঠ থেকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখে বাঙালি যে বাংলা ট্যাবলয়েড হাতে হাতে নিয়ে ফিরত, তাদের কারও নাম 'গড়ের মাঠ', 'খেলার মাঠ' কারও বা 'স্টেডিয়াম', 'অলিম্পিক' নয়ত 'গ্যালারি'।

'গ্যালারি' বার করতেন শিবরাম কুমার। ধুতি-শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল। কলকাতা ফুটবলের ইতিহাস নিয়েও তাঁর বই ছিল। শিবরামবাবু প্যান্ট-শার্ট পরতে শুরু করলেন হঠাৎই। কেন, এই কারণ জানতে একটু নাড়াচাড়া দিতেই জানতে পারলাম ওঁর বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তাই এই সাজবদলী 'গড়ের মাঠ' ইত্যাদি কাগজে একই ছবি, ছাপা হত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পুরনো ব্লক। কিছু করার নেই।

কলেজস্ট্রিটে পাতিরাম, রসরাজের দোকানে নানা ধরনের পত্রিকা পাওয়া যেত। মালিকানা বদল হয়ে যাওয়ার পর পাতিরাম এখনও আছে। রসরাজের মৃত্যুর পর সেই দোকান আর নেই। মনে পরে রাসবিহারী মোড়ে রমাপদ ভট্টাচার্য মশাইয়ের স্টলের কথা। রমাপদবাবু আমার একমাত্র পিসিমার আপন দেওর। ওঁদের গৃহ দেবতা গোপালের নামে এই দোকান। চেতলা থেকেই 'তুলি' নামে একটি সিনেমা পত্রিকা বেরত। মাসে মাসে প্রকাশিত সেই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জনৈক তপন। তাঁর পদবি মনে নেই। নিজের স্কুটারে 'প্রেস' স্টিকার লাগিয়ে তিনি সমস্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াতেন। রমাপতিবাবুর দোকান থেকে পুরনো 'উল্টোরথ', 'জলসা', 'সিনেমাজগৎ', 'প্রসাদ' নিয়ে গিয়ে তিনি নানা গসিপ খবর করেন সিনেমা লাইনের, এমনটি বলতেন কেউ কেউ। সত্যি মিথ্যে জানি না। তার পত্রিকাতেই দেখতাম 'তুলি' পড়ছেন বিশ্বজিৎ, 'তুলি' পড়ছেন উত্তমকুমার, নয়ত সুপ্রিয়াদেবী বা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। 'তুলি' পুরস্কারও চালু করেছিলেন তিনি। সেই পত্রিকা কবে যে বন্ধ হয়ে গেল। রমাপতিবাবুও বহু বছর নেই।

'মহানগর' বেরয় সমরেশ বসুর সম্পাদনায়। মাসে মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকার মালিক ছিলেন দিব্যেন্দু সিংহ। সত্তর দশকের প্রায় শেষ লগ্নে, বা আশির গোড়ায় বেরল 'মহানগর'। অসাধারণ ছাপা। এটা ঠিক হয়ত নিটোল বিনোদনের পত্রিকা নয়। তবে সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে লেখা থাকত। গল্প, মলাট কাহিনি। কিডস্ট্রিটে ছিল এর আপিস। দিব্যেন্দুবাবু পেশায় সিভিল এনজিনিয়ার। দাড়ি, গায়ের রং, হাইট, সব মিলিয়ে খানিকটা যেন গালে দাড়ি মণ্ডিত শাম্মি কাপুর।

'মহানগর'-এর পাশাপাশি 'সবজান্তা মজারু' নামে একটি একদম অন্যরকম ছোটদের মাসিক পত্রিকা বার করেন দিব্যেন্দুবাবু ১৯৮০-৮১ সালে। সম্পাদক হলেন অনীশ দেব। দিব্যেন্দুবাবুর স্ত্রী মণিকা সিংহ সেই পত্রিকাটি দেখাশোনা করতেন।

'সানন্দা' বেরয় আশির দশকে। 'সানন্দ' নামে সন্তোষ কুমার ঘোষের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি বেরনোর কথা ছিল। শিল্প নির্দেশক পূর্ণেন্দু পত্রী। সন্তোষবাবু মারা গেলেন গলার ক্যানসারে। পূর্ণেন্দু পত্রী আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আশির দশকে সেই ধর্মঘটের পরই রেজিগনেশান দিয়ে পুরোপুরি চলে এলেন

পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এ। তার অনেক আগেই তিনি 'প্রতিক্ষণ'-এ নিয়মিত আসেন। শিল্প নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। কভার স্টোরি কী হবে, সিদ্ধান্ত নেন সে ব্যাপারেও।

'সানন্দা'-র সম্পাদক হলেন অপর্ণা সেন। 'সানন্দা' বেরল। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনিতে নবাব পত্রৌদি ও শর্মিলা। পরের সংখ্যায় গরুকে রুটি ইত্যাদি খাওয়াবার ছবি। 'সাপ্তাহিক বর্তমান'ও বেরল আশির দশকে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনি অশোক সেনকে নিয়ে।

সত্তর দশকে 'পক্ষীরাজ' নামে একটি ছোটদের মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সেই পত্রিকার অফিস কলেজস্ট্রিটে। এই পত্রিকার মলাট করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। 'পক্ষীরাজ' চলেছিল বেশ কয়েক বছর। চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল থেকে একটি সাহিত্য-সিনেমা বিষয়ক পত্রিকা বেরয় সত্তর দশকে। অনেকে বলেন, সঞ্চয়িতা নামের চিট ফান্ডের টাকা তার পেছনে ছিল। 'বিনোদন বিচিত্রা' নামে একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল। সেখানেও সাহিত্য-সিনেমা- থিয়েটার।

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সত্তর দশকের শেষে। পত্রিকার মলাটে সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হত শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের। সাপ্তাহিক 'অমৃত' খুব কম দামে দেখেছি। বোধহয় সাঁইত্রিশ কি চল্লিশ নয়া পয়সা, সাপ্তাহিক দেশ আর একটু বেশি। 'মোহিনী আড়াল-এর কবি মণীন্দ্র রায় এক সময় দায়িত্বে ছিলেন 'অমৃত'-র। 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'অমৃত'-র দায়িত্ব নিয়ে প্রথম সংখ্যায় মলাট কাহিনি করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। পরের সংখ্যায় কলকাতার গ্রিকরা। কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনিই মল্লিক বাড়ির ওপর কভার স্টোরি করান। তখনও সঞ্জীববাবু অন্য চাকরি করেন। পরে জয়েন করেন আনন্দবাজার গ্রুপ-এ। তাঁকে 'যুগান্তর' গোষ্ঠীতে চাকরি দিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন শ্যামলবাবু। সে চেষ্টা সফল হয়নি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদনায় 'অমৃত'-তেই প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনির ব্যাপারটা নিয়ে এলেন। বাংলা পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়টি তখন ছিল না। 'অমৃত'-তে জয়েন করার পর ফুটপাথে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'-র বাঁধান বহু সংখ্যা কিনেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়মশাই।

'তথ্যকেন্দ্র' বেরতে শুরু করে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর ঘর থেকে। এক মাসে একটা। এই পত্রিকাটিও অনেক বাঙালি কেনেন আগ্রহ নিয়ে। 'কথাসাহিত্য' নিপাট সাহিত্যের পত্রিকা। প্রতি মাসে বেরয় মিত্র ও ঘোষ থেকে। ইদানীং রাশিফল থাকছে। না হলে সবটাই গল্প-কবিতা-ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রবন্ধ সাহিত্যের খবর।

'কিশোর ভারতী' বেরিয়েছিল সত্তর দশকে। সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার মলাট আঁকতেন সূর্য রায়। 'খোলা মনের মেলাতে' বলে একটি রাজনৈতিক বিতর্কের আসর বসত 'কিশোর ভারতী'র পাতায়। পরিচালক ছিলেন সুজনবন্ধু। 'কিশোর ভারতী' কিশোর-কিশোরীদের পত্রিকা। এখনও বেরয় প্রতি মাসে। সম্পাদনা করেন ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। ছোটদের জন্য 'কিশোর দুনিয়া' 'টগবগ' 'শিশুমেলা' এখনও বেরোয়। 'পাতার বাঁশী' নামে একটি পত্রিকা বেরত। মাসিক 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' বেরয় রবীন বলের পরিকল্পনায়। সমরজিৎ কর-মশাই ছিলেন পরিকল্পকদের একজন। এ পত্রিকা এখনও বেরয়। 'কিশোর বিস্ময়' বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

বিনোদন মূলক বলতে যে-ফ্রেম আমরা নির্দিষ্ট করেছি 'রঙবেরঙ' 'কল্লোল' কখনই তার মধ্যে পড়ে না। 'কালি কলম'ও না। 'কল্লোল', 'কালিকলম' সবই পঞ্চাশ বছরের চৌখপ্পির বাইরে। যদিও নবপর্যায়ে 'কালিকলম' বার করার একটা চেষ্টা হয়েছিল সত্তর দশকে, সাহিত্য পত্রিকা হিসেবেই। এর পেছনে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'সুন্দরম', 'অগ্রগতি', 'ভবিষ্যৎ' কোনোটাই কি নিছক বিনোদনী? সুভোঠাকুর ছিলেন এইসব পত্রিকার সম্পাদক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের নাতি সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প-নী' নামে একটি পত্রিকা করতে চেয়েছিলেন। তা-তে কবিতা খুব গুরুত্ব পাবে এমনটা বলেছিলেন তিনি। সেই স্বপ্নের 'প-নী'—মানে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি। আবার ফিরে আমি সেই ৬৭ নম্বর গোস্বামী পাড়া রোডের ছাদের আড্ডায়। সেই মহিলা মহলে কত যে ইশারা ছিল। গূঢ় সংকেত। মুখের আধফোটা বোলে; চোখের চাউনিতে, সামান্য কনুইয়ের খোঁচায় বলা হয়ে যেত কত কিছু। আদ্যন্ত সৎ, রেল চাকুরে বাবা খুব একটা পছন্দ করতেন না মায়ের এই আড্ডা-অভিযান। এনিয়ে বলতেনও কখনও সখনও তবে ঝগড়া, কথাকাটাকাটি হত না।

আমাদের তখন এতটাই অভাব যে বাবা দৈনিক বাংলা খবরের কাগজও কিনতে পারতেন না। ১৫ আগস্ট, ২৩ জানুয়ারি, বা ২৬ জানুয়ারি তিনি কখনও কখনও নাইট ডিউটি ফেরত একখানা বাংলা দৈনিক হাতে করে ফিরতেন। অবশ্যই 'যুগান্তর' নয় 'দৈনিক বসুমতী'। সেটা ষাটের দশক। বাঙালির এক নম্বর ডেইলি 'যুগান্তর'। তাতে উদ্বাস্তু সমস্যা, ছেড়ে আসা গ্রামের স্মৃতি। বাবা সিনেমার কাগজ কিনতে পারতেন না। হয়ত কিনতে চাইতেনও না নানা 'নৈতিক' কারণে। সিনেমা ম্যাগাজিন, নভেল পড়া তখন তো যাকে বলে রীতিমতো ক্রাইম।

সিনেমা পত্রিকা লুকিয়ে পড়তাম পিসিমার বাড়িতে গিয়ে। যেহেতু ওঁর দেওয়রের বই দোকান। কিন্তু সে পাঠও তো নেহাই লুকিয়ে লুকিয়ে 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণের মতোই। তারিয়ে তারিয়ে, গোপনে।

বাবার কাছে 'অবতার' বা 'সচিত্র ভারত'-এর কথা শুনেছিলাম। 'যষ্টিমধু' সম্পাদনা করতেন কুমারেশ ঘোষ, রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকা, দেখেছি। কুমারেশ বাবুর প্রয়াণের পর সেই পত্রিকা বেশি দিন চলে নি। 'কার্টুন' বলে একটি পত্রিকা বার করতেন সুকুমার নামে একজন কার্টুনিস্ট। হেনা চৌধুরী বার করতেন 'নারীজগৎ'। গল্প, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধের পাশাপাশি মেয়েদের সমস্যা নিয়েও বেশ কিছু লেখা থাকত।

মায়েদের ছাদ-আড্ডায় মেয়েলি ইশারামূলক ভাষা 'ওর এবার হবে'—বলার পর প্রায় কলকল হাসিতে কিশোরী হয়ে উথলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উল বুনতে থাকা হাতের কনুই অল্প করে যেন ছুঁয়ে যায় পাশের নারীর শরীর। হাসির কল কল্লোলে তিনিও তখন বন্ধনহীন কোনো এক পাহাড়ি ঝর্না। উলের গোলায় টান পড়ে। গড়াতে থাকে রঙিন পিওর উল। ক্যাশমিলন নয়, পিওর উল। সঙ্গে কাঁটা চলে, চলে—মন্ত্র যেন। সোজা উল্টো, উল্টো সোজা। ঘর ফেলা। ঘর তোলা। বর্ডার বোনা, বগল ফেলা। নেক-মানে গলার জায়গাটা ঠিক করা। দরকারে কলার। নাহলে গোল, নয়ত ডি কার্টিং গলা।

হাত নড়ছে।

মুখ নড়ছে।

বাতাসে মুচমুচে শীত।

এই যে 'ওর হবে' বা 'ওর আবার হবে'। এ বাক্যটির মানে কী! কী হবে? মনের ভেতর পাক খেতে থাকে এমন নানা 'জিজ্ঞাসা', সেই 'পাকা' ছেলের। যে কিনা তার নিজের মা-কে মাঝে মাঝেই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে আর ভাবে আমার মা এত সুন্দর! এতটাই সুন্দর আমার মা! সেই ছেলেটাই তখন হাবাগোবা হয়ে যায় একেবারে। গোটা ব্যাপারটাই যেন তার কাছে খানিকটা 'ধোঁয়া ধোঁয়া', দেওয়ালের ওপারে থাকা আবছা কিছু। সোজা করে বললে—'রহস্যময়'।

পরে সে বুঝেছে এই খোলা আকাশের নিচে আড্ডায় থাকা নারীদের কেউ একজন সেই যে বলে উঠলেন, 'ওর হবে' বা 'ওর আবার হবে' মানে কোনো এই আড্ডাধারিনীদের কেউ হয় প্রথম বার গর্ভবতী, নয়ত পুনরায় গর্ভিণী হয়েছেন।

এই যে জীবন রসের নানা স্বাদ—কটু, তিক্ত, অম্ল, মিষ্ঠ—এর সবটা না হলেও খানিকটা খানিকটা অর্জন করেছে এই অকাল পাকা ছেলেটি 'সিনেমা জগৎ', 'উল্টোরথ', 'প্রসাদ', 'ঘরোয়া' থেকে। আলতো করে কনুই ছোঁয়ানোর ভাষা সে বুঝতে পারে হয়ত। সংকেতকে ডিকোড করতে পারে। তবে শুধু কি তাই কেবল! পরে সে অনেক ভেবে দেখেছে সিনেমা পত্রিকাগুলো কি তাকে নিছকই পাকিয়েছে শুধু! আর কিছুই কি দেয়নি! মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' সে তো পড়ে 'প্রসাদ'-এই। ক্ষিতীশবাবু কি তখন 'প্রসাদ' সম্পাদক? নাকি প্রণব বিশ্বাস মশাই? বনফুলের 'লী' নামে একটি উপন্যাস, যা সম্ভবত প্রকাশিত হয় বনফুলের মৃত্যুর পর, তাও তো তার পড়া কোনো সিনেমা পত্রিকার শারদ সংখ্যাতেই। সম্ভবত 'প্রসাদ'-ই হবে। 'নবকল্লোল'-এর শারদ সংখ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' যা কিনা 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ কোম্পানির পিয়োন মারফত ফেরত দিয়েছিলেন আর পরে কোনো বছর 'হিম পড়ে গেল'। যেখানে স্বয়ং মধুসূদন মজুমদার মশাই আর ছোটদের লেখক সুকুমার দে সরকারও।

এরকম আরও কত যে লেখা আছে। আসলে সাহিত্য ভোক্তা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তার পাঠ অভ্যাসকেই ক্রমশ প্রখর থেকে প্রখরতর করেছিল। তার সঙ্গে ছিল পাড়ায় পাড়ায় গানের জলসা, সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনয়, হলে গিয়ে সিনেমা, মাঠে গিয়ে ক্রিকেট-ফুটবল দেখা। এরমধ্যেই একটা বড় অংশ পত্র-পত্রিকা কিনতেন। পড়তেন। প্রায় নিয়মিত যেতেন লাইব্রেরি। এঁদেরই কেউ কেউ রাত জেগে বড়ে গোলাম আলি, আমির খাঁ সাহেব, এটি কানন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় শুনতেন। কলকাতায় তখন কত কত রাগ সঙ্গীত কনফারেন্স। এইসব সঙ্গীত সম্মেলনও বহু বছর হল প্রায় নিরুদ্দেস। ফুটপাথে বসে গান শুনতেন রসিকজন কলকাতার ভোর আসত টাটকা আহির ভৈঁরো শুনতে শুনতে।

মনে পড়ে সিনেমা পত্রিকার মলাটে সুচিত্রা-উত্তমের যুগল মুখশ্রী। কখনও সৌমিত্র-মাধবী বিশেষ করে পুজো সংখ্যায়। ডিঙ্ক নয়ত তামার ব্লক। ভেতরে সবটা লেটার প্রেসে ছাপা। তারপর লাইনের ফেস এল। রূপশ্রী, দেবশ্রী সব টাইপের নাম। বর্জাইস বলেও একটা টাইপের মাপ আছে।

মায়েদের সেই যে গল্প-গুজব, কথাবার্তা, হালকা হাসি, চোখ নাচানয় অপার রহস্যময়তা তার কাছাকাছি আমারও থেকে যাওয়া নানা ছুতোয়, পরিণামে বকা খাওয়া কখনও কখনও বড্ড পেকেছিস না! সেই পেকে ওঠার সঙ্গেই, অ্যাডাল্ট-গন্ধী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এইসব পত্রিকারা, যেখানে বাঙালির জীবন কল্লোল। এখনও তাদের কারও কারও জন্য বেশ মন কেমন করে, মাঝে মাঝে।

ভানুকাকার তেইশ-ছাব্বিশ

প্রদীপ দাশগুপ্ত

স্থানীয় নাগরিক কমিটি বছরে যে ক'টি অনুষ্ঠান নিষ্ঠাভরে পালন করে থাকে, তার মধ্যে বছরের শুরুতেই আসে তেইশে জানুয়ারি। আর তার পরেই ছাব্বিশে।

তেইশে, সুভাষ বসুর জন্মদিনে, প্রধান বক্তা হিসাবে ডাকা হল যথারীতি আমাকেই। যেহেতু, এলাকার একমাত্র হাইস্কুলের আমিই প্রধান শিক্ষক।

আমি সবিস্তারে বললাম ওঁর দীর্ঘ জীবনের বীরত্বের কাহিনী। কিভাবে কংগ্রেস ছেড়ে, ফুয়েরার হিটলারের রণ-মিত্র-দেশ জাপানে গিয়ে,—শেষমেশ—রাসবিহারী বসুর কল্যাণে—আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতাজী হয়ে ওঠা; এ-সবই বললাম। আমার নজর পড়েছিল বাচ্চাদের দিকে। তাই তাদের ভালোলাগার মত করেই বললাম। এতে শুধু বাচ্চারা নয়, বড়রাও সশব্দ হাততালিতে অভিনন্দন জানালেন।

সভার শেষে গোল বাধল ভানুকাকাকে নিয়ে! সবার সামনেই চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'হারামজাদা, ভুলইয়া গ্যাছস, তুই এককালে একখান কালেজে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পড়াইতিস?'

সভাপতি-সহ উপস্থিত সবাই ওকে নেহাতই খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপার হিসাবে নিয়ে মজা পেলেও, আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম যে, ওই সম্ভাষণটা ছিল নিছক ভূমিকা মাত্র। বাড়ি যাবার পরে, আমার কপালে দুঃখ আছে।

বাড়ি ফিরে আমিই বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে যাদের নিয়ে অনুষ্ঠান, তাঁরা তো কেউ রাজনীতি করেন না। নাগরিক কমিটির অনুষ্ঠান দু'টির পিছনে প্রেক্ষিত হিসাবে রাজনৈতিক ইতিহাস থাকলেও, যেহেতু এখানকার নাগরিকগণ এমন এক আর্থ-সামাজিক ধাপের মানুষ, দেশের শাসনকারী-প্রভুদের ঘেন্না-ধরানো রাজনীতিতে প্রভাবান্বিত হয়ে, রাজনীতির প্রতি বিবমিষা প্রকাশটাকেই এঁরা সুবিধাজনক মনে করেন। অতএব, পূর্বোক্ত দু'টি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বিশুদ্ধ অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান হিসাবেই তুলে ধরার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। একটা অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে আমি কি করে...।

শেষ করতে না দিয়েই ভানুকাকা পড়লেন আমাকে নিয়ে।

'অরে গাধা, এমন এক অসমান সমাজে অরাজনৈতিক কোন কিছু যে হয় না, হেয়া তুই জানস না? প্রকাশ্য দিবালোকে—মাইকে-মুখ-দিয়া তুহ কইতে পারলি—তারা- তো কেউ রাজনীতি করেন না? সব শালা করে, লুকাইয়া করে, শোষক-শ্রেণীর মগজ-শাসনে নিজের অজান্তেও করে। নিজেদের শ্রেণী-অবস্থান টিকাইয়া রাখনের স্বার্থে, নিজেরেই ঠকাইয়া মিছা কথা কয়। এইয়ার নাম ভদ্রলোক। বোঝজো?' বলতে লাগলেন যে, কেন রাজনীতি শব্দটা ওঁদের কাছে 'ট্যাবু'। 'চউক্ষে কি দ্যাখতে পাওনা, দ্যাশের শাসকরা, দ্যাশের মাইষের টাকা লুঠ কইরা ক্যামনে ল্যাংটা হৈয়া নাচে? নিজেগো কামড়া-কামড়ি থিকা—দুই-একখান ধরা পড়লে, নিজেগো কাগজ দিয়াই প্রচার চালায়, কয়---'কেলেঙ্কারি'। হে তো ক্যাবল, টিপ-অব-দি-আইসবার্জ! নিজেগো এক ভাগের বিরুদ্ধে এই বদনাম-এর পিছনে কৌশলডা কিয়ের লেইগগা? ভাবজোস কোন দিন? এই সকল পোলিটিক্যালি আধা-সেন্সিটিভ মানুষগো, —'সব-ঝুট-হ্যায়' —মার্কা এক দর্শনে পৌঁছাইয়া দিতে। অহন তো প্রচারের আর এক কায়দা ধরছে, হ্যাগো ওই কৌশলেই তো এ্যারা অ-রাজ-নৈতিক! হেয়া বোজোনা?'

'সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয়', —কে বলেছিল? বাম-ডান, হিন্দু-মুসলিম, চরম-নরম, —সবাইকে নিয়ে চলতে চেয়ে উনি কোন শ্রেণীর স্বার্থে ঘা দিচ্ছিলেন, কার কার যলা-ষড়যন্ত্রে উনি কংগ্রেস ছেড়েছিলেন? দেশেরই স্বাধীনতার জন্য লড়তে গিয়ে ওঁকে দেশটাই কেন ছাড়তে হল? যারা আজ ওঁকে মহান দেশপ্রেমিক নামে ডেকে প্রায় পূজা বেদীতে বসাচ্ছেন, কেন তাদের একথা ভুলে যাওয়া সুবিধাজনক মনে হয় যে, স্বাধীনতার পরেও, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানীদের শাস্তি দেবার জন্য বিচার সভা বসে? কেন স্বাধীন ভারতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানীদের মুক্তির জন্য বামপন্থীদেরই আন্দোলন করতে হয়েছিল? 'এসবই হইল গিয়া বিরাজনীতিকরণের কায়দা। হ্যারা প্রকৃত গণতন্ত্রে, —অর্থাৎ সকল মানুষের অধিকার-কর্তব্য-সচেতনায় ভয় পায় দেইখাই, —মুখে গণতন্ত্র-গণতন্ত্র শান্তি-শান্তি কইরা গলা ফাডায়। এগো ভণ্ড কইলে প্রকৃত ভণ্ডগো, চোর কইলে চোরেগো অপমান হইব।' মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মায় নাতিনাতনি-সহ, সকলের সামনেই বিস্তর গালি-যোগে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে, এভাবেই, ভানুকাকা প্রায় তিন ঘন্টা ধরে আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় তারিখটিতে, 'আজকের প্রজাতন্ত্র দিবসে—' ইত্যাদি বলে গলা ফাটিয়ে যিনি এতক্ষণ ঘোষণা করছিলেন, সভাপতি তাঁর কানে কানে কি যেন বলতেই, তিনি দুম করে 'সংক্ষিপ্ত' বক্তা হিসাবে ঘোষণা করে বসলেন ভানুকাকার নাম। আমি প্রমাদ গুণলাম। ভানুকাকা আজ ইউনিভার্সিটির ক্লাস-রুম না ভেবে বসেন। এইসব ভদ্রমানুষজনেদের 'বোর' না করে ছাড়বেন না। এঁদের মনের মত করে, ভানুকাকা কি

করে এমন এক বিষয়ে অরাজনৈতিক বক্তৃতা পরিবেশন করবেন? তা'ও আবার, সংক্ষেপে?

যথারীতি, বক্তৃতার শেষে, বাচ্চারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বড়রা বেশির ভাগই মুখ নীচু। আর সভাপতি এবং তাঁর পাশে দাঁড়ানো কয়েকজনের শুধু নিদারুণ-কষ্টের-হাসিমুখ নিয়ে গদগদ ভানুকাকার দিকে তাকিয়ে। সভাপতির তোয়াক্কা না করেই, ঘোষকই — মাইকে মুখ লাগিয়ে ছোট্ট উচ্চারণ করলেন, 'সভা শেষ'।

আমি এমন শ্রুতিধর নই যে ভানুকাকার দীর্ঘ বক্তৃতার সবটাই আপনাদের কাছে পরিবেশন করব সংক্ষিপ্ত-সারটাই আপনাদের জানালাম।

ভানুকাকা প্রথমে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটা নিয়েই পড়লেন। প্রজাতন্ত্র আবার কি? সাধারণতন্ত্র। শব্দটা রাষ্ট্রনৈতিক। সাধারণে যাকে বলে রাজনৈতিক। এটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শব্দ। প্রজাতন্ত্র বললেই তো রাজার কথা চলে আসে। ইংরাজি শব্দটা হল—'রিপাবলিক', 'হোয়ার দেয়ার ইজ নো মনার্ক, এ্যাণ্ড সুপ্রিম পাওয়ার ইজ ভেস্টেড উইথ দ্য পিপল'। আমি মনে মনে বললাম কি সব্বোনাশ! এ তো মারাত্মক কথারে বাবা, চরম ক্ষমতা থাকবে দেশের মানুষের হাতে!

'রাজা থাকবে না; চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে মানুষজনের হাতে', ভানুকাকা বললেন। 'অনেকে জিগাইবেন, হেইডা আবার ক্যামনতারা কথা? ক্ষ্যামতা তো হগলডিই—রাজার! জিগাইবেন, —দুই বইয়ের কথাগুলান এইরোম মাথায় ধইরা রাখোস ক্যান? মরবি, মরবি! এইয়াই হইতেছে দেশের একেবারে গোড়ার সমস্যা! বিচ্ছিন্নতাবাদ! বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা পইড়া থাকে একদিকে। ব্যবহারিক আচার-আচরণ হাঁটে আর একদিকে! উচ্চারণ আর আচরণের এই বিচ্ছিন্নতাবাদ, শুধু দেশে বা সমাজে নয়, পেশার ক্ষেত্রে— এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও নানান আপদের আমদানি করে।'

খুব রেগে গেলে, ভানুকাকা মাতৃভাষা ছেড়ে, বেশীরভাগ সময়ে, ক্লাস-নেবার সময়কার শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন। ভানুকাকা বলে চলেন, —'অধিকাংশ দেশেরই সকল মানুষকে — স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিতে রাজাকে খেদিয়ে দেওয়া হ'লে কি হবে? দেশের মানুষ সে স্বাধীনতা কাকে বলে শাসকরা তা বুঝতে দিতে চাইলেই তো? অল্প সংখ্যক সুবিধাভোগী যাঁরা শিক্ষার সুযোগ তথা সব ব্যাপারটা বোঝার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাও নিজশ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখতেই বুঝতে চাননা। বেদের আমলের ধ্যান-ধারণার অভ্যাসে মগজে রাজশাসনও অবিকল ছাপ নিয়ে আছে। রাজা যায়। রাজার আমলের সংস্কৃতি অর্থৎ—শুধু গান-বাজনা না, ভাবনা-চিন্তা-আচরণ দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে। রাজভক্তি আর মগজ থেকে যেতেই চায়না! এখনও বহু রাজাকেই ঠাকুর-দেবতা সাজিয়ে পূজা করে! এমনকি, নিজের ছেলের নামও, পরম স্নেহে রাখেন—'রাজা'! তো, এহেন মানুষদের কি করে বোঝান যাবে গণতন্ত্রের রূপ সব মানুষের স্বাধীনতা? 'সাধারণতন্ত্র-দিবস'-কে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? সাধারণ মানুষ তো প্রশ্ন করতেই পারে। মুশকিল হচ্ছে, —আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, (আমি স্বগতোক্তি করি, মরেছে, বক্তৃতাতেও আবার আমাকেই আক্রমণ!) হে-তো হ্যাডমাষ্টার, হ্যাও বাদ যাননা। এ-গো বোঝানো রীতিমত মুশকিল যে, উচ্চারিত শব্দগুলো আসলে, একজনের চিন্তার — অর্থাৎ মগজের 'হার্ড-ডিস্কে', আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের পেয়াদাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব-পরিবেশের দ্বারা আগের থেকেই 'প্রোগ্রাম' করা চিন্তার প্রকাশ মাত্র। 'প্রজাতন্ত্র' কথাটির মধ্যে 'প্রজা' শব্দটাই-মনের গোপন কোনে—অবচেতন মনে—চাগিয়ে তুলবে 'রাজা'-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাগুলো। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ক'ন, —এদেশে গণতন্ত্র অনেকখানি বিকাশ লাভ করিয়াছে। কোন পর্যন্ত? ভোটদান পর্যন্ত? ভোটদানের পিছনে, বিচার-বুদ্ধির বিস্তার কতদূর? যাকে ক্ষমতা দিলাম, তিনি বা তার দল গণতন্ত্রের পক্ষে, অর্থাৎ—বেশীরভাগ মানুষের পক্ষে কাজ করেন কিনা, তার দৈনন্দিন খবর নেবার সময় খরচ করতে আমরা রাজি থাকিতো? এই রকম খবর রাইখা ভোট দেওয়া মানেই যে এই রকম — চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ, এইডা যদ্দিন না বুঝতাছেন, যদ্দিন এই দায়িত্ব বুঝিয়া না লইতেছেন—তদ্দিন গণতন্ত্র ঠিক মতো মগজে জায়গা পাইব না। গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণাগুলান—পোলাপানের মতো ইমম্যাচিওরই থাকবো। এ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ধারণা মগজে জায়গা না পাইলে কি হয়?' প্রশ্নটা তুলে, জবাব দিলেন ভানুকাকা নিজেই।

'মগজে ভরা রাজা। রাজার আমলের ধারণায়, জান-মালের সব দায়িত্ব রাজার। এদিকে রাজা তো খুঁইজা পাইতেছেন না। কি করা যায়?

নিজেদের হাতে দায়িত্ব নেবার জন্য মগজ তৈরী হয় নাই। কারে দায়িত্ব দেওয়া যায়? ক্যান? একজন—অমুক-বাবা, অমুক-মা কি একজন দাদা-দিদি হইলেই চলে। অতএব, কলৌ নামৈব কেবলম! কলি কালে নামই শ্রেষ্ঠ, নাম করলেই চলব। মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যান-জ্ঞান, পূজা-পদ্ধতি, কিছুই জানার দরকার নাই। শুধু নাম করলেই চলব। এইয়ার সুবিধাজনক আর কি হইতে পারে! ব্যক্তিগত জীবনের এই আধ্যাত্মিক-ভক্তিবাদ যদি রাজনীতিতে আমদানি করি, তা' হইলে তা' হইবে আধ্যাত্মিক্তার ক্যারিকেচার। এই ক্যারিকেচারের পাপেই কপাল ভাঙবে।

তখন আর, পোলাটা ক্যান চাকরি পায়না, লাখের বেশি টাকা খরচ করিয়া যে পোলাটারে কম্প্যুটার-ইঞ্জিনিয়ার

বানাইলাম—তারে ক্যান ভূতের মতন খাটাইয়া—একজন রাজমিস্ত্রির মজুরি দিতেও মালিক রাজি হয়না, ক্যান খাদ্যের-ওষুধের দাম বাড়তেই থাকে, দ্যাশের কারখানা বন্ধ হয়, আর বিদেশের ছাপমারা জিনিষে বাজার ছাইয়া থাকে, —এই সকল প্রশ্নের জবাব পাউবেন না!

অন্যদিকে, অহন আবার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে পড়া শব্দগুলোর মানেটাই বদলাইবার আমল চলতাছে। পৃথিবীর নানান দ্যাশে গণতন্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা নেওয়ার এক স্ব-ঘোষিত মুরুব্বি জুটছে। তার কাছে, দ্যাশে দ্যাশে গণতন্ত্রের বেদী স্থাপনের মানে হইল গিয়া, সে দ্যাশটাতে দাঙ্গা লাগাইয়া, একটা হট্টচট্ট পাকাইয়া, নির্বাচনে রিগিং কইরা, নিজেগো দালাল বসানোর ঠিকা নিছে; যাতে সে মুরুব্বি তাদের সুবিধা মত, সে দ্যাশটারে পরাণ-ভইরা লুঠ করতে পারে। ইরাক থিকা ইউক্রেন—একই জিনিষ দ্যাখতে পাইবেন! আবার, 'এম্পায়ার' শব্দটারও, নতুন অর্থ আমাগো শিখানোর লাইগা, একদল বুদ্ধিজীবীরে কামে লাগাইছে। আর, এই পোড়া বাংলায় তো, হ্যাগো মাইযে আমাগো শিখাইবার জন্য উইঠা পইড়া লাগছে, যাতে দলতন্ত্রের হিটলারী-পণারেই আমরা গণতন্ত্র বলিয়াই মানিয়া লই'।

ভাক্তি যোগ্যরে ভক্ত করা খারাপ না। ঐটা দরকার তবে, এইখানে, আমগো সকলেই প্রণম্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একখান কথা আপনেগো মনে করাইয়া দিতে চাই। শাস্ত্রী মশয় কইছেন, —'ভক্তিবাদ গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিখানি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি'। আইজও কি আমরা দেখিনা? আমরা নিজেরাই কি 'গাঢ় ভক্তিবাদে আক্রান্ত না? সন্দেহ নাই, এয়াতে সুবিধার অন্ত নাই। পড়া-জানা-বোঝা, কিছুরই দরকার নাই, ঐ যে আগেই কইছি, মন্ত্র-তন্ত্র-ধ্যানজ্ঞানের দরকার নাই!

সুবিধা, সুবিধা, সুবিধা। অতএব, এই সুবিধাবাদেই আমরা গা ভাসাইলাম। এয়াতে আর যাই হউক। 'প্রজাতন্ত্র' সফল হইতে পারেনা। বুদ্ধি, কারো কম কি বেশী থাহেনা। যে যতটা কাজে লাগায়, তারে তত বুদ্ধিমান কয়। আমার ফার্ভেন্ট আপীল, বুদ্ধি কামে লাগাইয়া, ওই চূড়ান্ত, ক্ষমতা, এই সবের দায়িত্বটা একটু বুঝিয়া ল'ন। প্রজাতন্ত্ররে সফল করেন।

'শেষ প্রশ্ন'। না, ভয় পাইয়েন না, আমার না, —'অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের'। (মাইক থেকে মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে নীচু স্বরে বললেন, 'শরৎচন্দ্র কি ল্যাখছেন শোন, একটু মেমরাইজ করিস'।)

শরৎচন্দ্র লিখছেন, —'মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে মানুষ হয়ে উঠতে পারে।'

এইখানে উপস্থিত সকলেই আপনেরা সম্মনিত মানুষ, শ্রদ্ধেয় মানুষ; আপনেগো কওয়ার অধিকারী বলিয়া—আমি নিজেরে মনে করিনা। কিন্তু, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনিও একজন সম্মানিত। প্রধান শিক্ষক। কিন্তু, পরিবারে—আমি তার গুরুজন। —পুরানা সমাজের সেই হিসাবের সূত্রে তারেই কই যে, তুই দেবানন্দপুরের কুলাঙ্গার! দেবানন্দপুরের মানুষ হইয়া শরৎচন্দ্ররে পড়স না, জানস না, চিনস না? নিজের চৌদিকে 'ফাঁকি' জমাইয়া 'কানা' হইয়া থাকবি?

কয়েক সেকেণ্ডের 'পজ' দিয়ে ভানুকাকা মন্ত্রের মতন করে উচ্চারণ করলেন, —'সকলকে প্রণাম'।

সভা শেষে, বাড়ী আসা পর্যন্ত গোটা রাস্তাটাই ভানুকাকা নিঃশব্দে এলেন। ভাবলাম, যাক বাবা, নিজের জমে থাকা কথাগুলো বলতে পেরে, ভানুকাকা নিশ্চয়ই ঠান্ডা হয়েছেন। আমার ফাঁড়া কাটল!

বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই হাঁক দিলেন, —'বৌঠান! অর কাকিরে ক'ন তো, আমার ল্যাখার নূতন খাতাটা লইয়া আসতে!'

কাকীমা নয়, গোলমাল আন্দাজ করে বোধ হয়,—আমার মাতা ঠাকুরাণীই স্বয়ং ফাইলটা নিয়ে এলেন। তা' থেকে আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে, বললেন, 'গাধা, পড়'!

এ কি! এ যে রবিঠাকুরের একগাদা উদ্ধৃতি। 'বাতায়নিকের পত্র'। মাথাটা ঘুলিয়ে গেল,—দেশ, সাধারণতন্ত্র, সার্ব্বভৌমত্ব, শরৎচন্দ্র, শেষে—রবীন্দ্রনাথ! ওফ!

'৫ই জৈষ্ঠ্য, ১৩২৬' (ইং ১৯১৯) 'জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে—তখনি জাহাজের বাইরের জলের মার সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চাল-চলন তেমন প্রচন্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এই জন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে, নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে সে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেঁচে ফেলতে হবে। ... এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরের বাধা-বিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভাল বৈ মন্দ নয়—কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্য ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব'।

পড়া শেষে, চোখ তুলতেই, বললেন, 'সেই বাংলা ১৩২৬ সনে, মানে আজ থিকা চৌরানব্বই বছর আগে, ত'গো শুদ্ধিকরণের লইগ্‌গা ঋষি-কবি লেইখখা গ্যাসেন! রবি ঠাকুররে ত'রা চিনস?'

প্রকৃতির রুদ্ররূপ

জগন্নাথ রায়

'প্রকৃতি' — তুমি কত সুন্দর,
আবার কত নির্মম তুমি—
নষ্ট করিছ রুষ্ট হয়ে,
তোমার-ই সৃষ্টি ভূমি।

তোমার সৃষ্টিকে উপভোগ করি,
আবার তোমারে জীর্ণ করি—
বুঝিনা তোমার যন্ত্রণা,
তাইতো করি বঞ্চনা।

জ্ঞানী মোরা পরিবেশ বুঝি,
তবু পরিবেশ মানিনা,
তাইকি তোমার রুদ্ররূপ,
নাকি দিতেছ মোদের চেতনা।।

'প্রকৃতি' পরমা, সুন্দরী, শান্ত-সুশীলা। এহেন প্রকৃতি কেন ভয়ংকরী হয়? কেন রুদ্ররূপ ধারণ করে? কেনই বা রুষ্ট হয় বারে বারে? কেন ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে ভীষণ-ভয়ংকর হয়? এমন অজস্র প্রশ্ন মনের গভীরের নাড়া দেয় বারে বারে। অনুসন্ধিৎসু মন পিপাসু হয় এর কারণগুলি জানার জন্য। বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অভাব, সর্বোপরি মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য নিয়ম-বর্হিভূত কিছু প্রকল্প রূপায়ণের ফলে বিপর্যস্ত আজ, প্রকৃতির সৌম্য রূপ। বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে তার উল্লেখ করতে গেলে অবশ্যই একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের (Report) কথা মনে পড়ে যায়।

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)—এই জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী চীন ও আমেরিকার গবেষকরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি Coupled Model Inter Comparison Project, Phase-5 (CMIP-5) দ্বারা বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে যে, ২০৫৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০৫৮ সালের মধ্যে সুমেরু-র বরফ সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবী ক্রমশই গরম হচ্ছে। তাপমাত্রা ক্রমশই উষ্ণ হচ্ছে, যার থেকে নিস্তার পাবে না সুমেরুর মত কঠিন বরফের দেশ। অর্থাৎ ৪৫ বছরেই গলে জল হবে সুমেরু। এও এক প্রকৃতির রুদ্ররূপের ভীষণতা। যদিও তথ্য অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা; তবুও মনে রাখতে হবে যে, এটা মনুষ্য জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রকৃতির নিয়ম-বহির্ভূত প্রকল্পগুলির কু-ফল হতে চলেছে।

একটু ভেবে দেখুন! ২০০৯ সালের প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ''আয়লা'' থেকে শুরু করে ২০১৩ সালের ''পাইলেন/পিলিন'' এর মতো প্রায়ই ঘটে চলেছে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মারণ-ব্যধি আজ নিয়ন্ত্রণে, নানান যুগান্তকারী আবিষ্কার আজ করায়ত্ব, মহাকাশ গবেষণায় আজ উল্লেখযোগ্য সাফল্য, কিন্তু প্রকৃতির রূদ্ররূপের সমাধান আজও এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন? আমরা সব সময় ভুলে যাই। কোন কিছুর বেশীটা ভাল নয়, সব কিছুরই একটা লক্ষণ রেখা থাকা উচিত, আমরা ভুলে যাই নদী ও প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় যখন কিনা তাদের ভারসাম্যে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে। ১৬ ও ১৭ই জুন, ২০১৩, মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও অলকানন্দা অববাহিকায় ৩৮০ মিলি মি. অতিবর্ষণের ফলে উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক বিপর্যয় প্রাকৃতিক ভারসাম্যের গুরুতর বিঘ্ন ঘটার কারণেই সংঘটিত হয়েছে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, বাঁধ ভাঙা প্লাবন, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা বড়বড় পাথরের চাঁই, জলাধারের আধার ভেঙে জলোচ্ছ্বাস-এর ফলে গাড়োয়াল হিমালয়ের শীর্ষ থেকে অজানা প্রান্ত দেশে মাইলের পর মাইলে অবস্থিত জনপদ, হোটেল, রিসর্ট, মন্দির কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অভাব, মানুষের অবহেলা ও সরকারের উদাসীনতা এর কারণ বলে আমার মনে হয়। একটু তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, ২০০৭ সালের Inter Governmental Panel on Climate Change-এর report-এ বলা হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের অল্প সময়ের মধ্যে অতি বৃষ্টি বা Storm Rainfall এর প্রবণতা বাড়বে, একই সঙ্গে বাড়বে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়। ২০০৯ সালের আগে CAG-এর Report-এ সতর্ক বাণী ছিল যে, ভু-তাত্ত্বিক দিক থেকে হিমালয়ের পাদদেশে যে অজস্র গাছ কেটে, পাহাড়ে ব্লাস্টিং ঘটিয়ে যে অজস্র টানেল তৈরি করে বহু প্রকল্পের কাজ চলছে, তা একদিন বড় বিপর্যয় বয়ে আনবে, কারণ এখানে প্রকৃতির ভারসাম্যের ব্যঘাত ঘটে চলেছে নিরন্তর। প্রকৃতির এই ভীষণরূপ এর জন্য যে, মানুষেরও পরোক্ষে হাত হয়েছে তার কারন অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির অবাধ বিচরণের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয়েছে। বহু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিবেশের সব বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে, নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে নির্মিত হয়েছে বিশাল বাঁধ ও জলাধার। তাছাড়া গত কয়েক দশক ধরে গাড়োয়াল

হিমালয়ে ভূমি ব্যবহারে কোন পরিবেশগত নীতি নিয়ম মানা হয়নি। পাহাড়ের ঢাল কেটে কংক্রীটের বাড়ি, নদীর প্লাবনভূমিতে হোটেল। রিসর্ট, প্রায় নদীর খাদের ভিতরেই মন্দির, আকাশছোঁয়া দেবমূর্তি তৈরী হয়েছে। ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল পর্যটকের চাপ-এর ফল স্বরূপ ভারসাম্য হারিয়েছে প্রকৃতি, রুষ্ট হয়েছে প্রকৃতি, বিকৃত হয়েছে প্রকৃতির সুন্দররূপ। প্রকৃতির এত ভয়ংকর রূপ দেখা সত্বেও পৃথিবীর কোন দেশের সম্পূর্ণ চেতনা হয়নি। ফলে এখনো চলছে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতিবন্ধী সব প্রকল্প, উষ্ণায়ন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে সুন্দর পৃথিবীটাকে। অদূর ভবিষ্যতে এই গ্লোবের কি হবে তা একমাত্র বিজ্ঞানীরাই হয়ত বলতে পারবেন।

প্রায় প্রতি বছর ‘সাঁকো’ পত্রিকার জন্য আমার না-লেখা কলমটাতে কালি ভরে লেখার চেষ্টা করি। কারণ ‘সাঁকো’-র পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে নিজ আঙ্গিকে কিছু লেখার প্রেরণা জোগায়। এমনি এক তাগিদে আমার এবারের এই ছোট্ট নিবেদন যেটা কিনা বর্তমান বিশ্বে এক ভয়ংকর ও বিরাট প্রশ্নচিহ্ন!!

At Crossroads

By Prasun Ray

The golden pen was lying on the table, catching a glint of the light, as the sun rays filtered in through the crack in the window. Saswata was staring intently at it, as if expecting it to burst into flames at any moment. The pen had been gifted to him by his father, when he had topped in Sanskrit in the board exams. The glint from the pen was having a hypnotic effect on him.

Right from childhood, he had this dream of becoming a writer. It all started when he got a prize for story writing in primary school. The claps reverberating in the hall, gave him a feeling of joy and contentment, which seemed to seep down to his bone. That’s when he decided that he wanted to feel this pleasure again and again. What dreams he used to have those days!! Getting huge tomes published, winning awards, the same sound of claps ringing in his ears wherever he went, being invited to august gatherings. Often the dreams would end with a shooting pain in his ears, as the teacher would forcefully pull him out of his daydreams.

But dreams, like all good things, often come with an expiry date. You slowly start forgetting your dreams; as you get hit by the winds of parental pressure, peer pressure, and conventional advice from teachers. Also, fear of uncertainty also acts as a corrosive acid. Like millions of Indian children, he also got into the rat race of achieving the ultimate aim of a fat salary and a nice sounding title.

Not that it troubled him. He was fairly good at running the race. He passed school with flying colours. Then, like most kids, he got into a very good engineering college.

That was one of the most memorable periods in his life. College life was an entirely different world. He tasted freedom for the first time. No conventions to follow, no parental guidelines to adhere to. It was as if he achieved Utopia.

This could have become a cause for the downfall of Saswata. Many kids lose their way during this phase. The taste of freedom triggers a yearning for hedonistic pleasure. Life becomes an aimless quest for momentary pleasure, often through addictions or unsocial activities.

But don’t worry!! Nothing of that sort happened to our Saswata. He rather flourished in this environment. His penchant for writing blossomed again, as he founded a literary magazine. His academic performance was not too shabby either, consistently scoring among the top five in his department.

Three years passed like a dream!!

Just then, something happened which completely changed the course of his life.

He was packing to go home at the end of the year. That’s when he saw two things lying

on his table: the magazine founded by him, his very own creation; and the fat ugly book, to which he had devoted considerable time to achieve his grades. That's when it hit him!! What was he doing? Why was he wasting his time reading arcane engineering concepts? He got reminded of the dreams he had dreamt ages ago. What happened to them? He slowly sank back into his bed, feeling a deep sense of restlessness. Till now he had felt very good about his first year in college. But now it all felt such a waste of time.

But what can he do now? Can he leave all this behind and embark on a new path? A new path with great rewards, no doubt, but also full of uncertainties. He was virtually sure of getting a respectable job. Will he throw all this away.

Then his eyes fell on the pen, and he didn't even realize when he fell asleep.

Within a few minutes, he was woken up by a pleasant looking bearded man. He sat up with a start.

"Who are you?" asked Saswata.

"That does not matter, hero!! Is that the most important question in your mind right now?" the man said with a knowing smile.

"Please! Please take away anything you want. But please don't hurt me!!"

"Calm down boy! I am not a thief."

"Who are you then?"

"I was just passing by. I saw you sleeping with a confused expression. I am a face reader you see. I know what you are thinking."

"Tell me, what is it? Tell me!!" challenged Saswata.

"You are not sure about the choices you have made, isn't it?"

Saswata was shocked. "How does he know?" he wondered.

"Surprised, aren't you? I can tell you more. You really want to do something to achieve your childhood dreams, but you are not sure whether you can risk it".

"Ok, so you are an astrologer! Looking for some extra business, are you?"

"Come on! You are more intelligent than that. Do I look like a two-bit card reading Sadhu Baba?"

"What do you want?"

"That's not important. Question is, what do you want? Do you want me to help you put your mind at ease?"

Saswata found himself saying, "Yes!"

"Ok Good! You are exactly in the same situation as I was, 30 years ago. Now you understand how I could quickly sense your state of mind? Come; let me take you to my room. You will find some interesting things there, which will help you decide."

The mystery man's room was a bewildering mess. Seemingly useless things were jostling for space with rows and rows of books, documents, certificates and trophies. Then he saw it. THE BOOKER PRIZE CITATION!!!!!

"Ooh! He is a celebrity in literary circles! How come I don't know him? I have the names of all the Nobel Prize Literature winners and Booker Prize winners on my fingertips. Who is he? I am sure I've never seen him. What is his name?"

The mystery man chimed in, "Ah! So you have seen that. Not a big deal, man. Just the fruits of doing what I wanted to do in life."

"But yes", he added, "It has come at a price".

Then he handed Saswata a box of odds and ends. Saswata took something out of it. It was a railway coolie badge. "Oh that! Those were the days. Man! I used to feel like such a fool. I had left my studies to become a writer, on a whim. I was on such an ego trip. I didn't even flinch when my father disowned me. I would think 'Oh! I'll just jot down my ideas on paper, and send to those Penguin people, and roll in the moolah. Dad will look so silly then!' Well, it took me sometime to come down to earth. Penguin did not even bother to send me a regret letter. When I came to my senses, I had no money, no home to go to, and no idea about what to do next. Then I somehow got the job of a Railway coolie. What to do, I had to eat. You know, for two years, my home was the railway platform."

Then Saswata took out a bound notebook, with a huge red cross on the cover.

The mystery man continued, "This is not just a book, but my greatest teacher you know."

Even while working as a coolie, I tried to keep my dream of becoming a writer alive. I even managed to write a novel. That one, the book you are holding in your hand. I was so sure it would be a success."

"One day, I managed to be-friend a scholar, who was aspiring to become an author. We talked for hours on that platform, discussing right from Shakespeare, to Wodehouse. He did know a lot of publishers. During the course of the discussion, I showed him my book.

He was so impressed! He was very sure that this would be an international bestseller. He urged me to get it published. But I did not know any publisher. So he took my manuscript, and promised to connect me with publishers. Like a naive fool, I handed it to him."

"And that was the last I heard from him. Many months after that, guess what happened? My book was a bestseller, all right! But of course the author was supposedly, my scholar friend"

"That day taught me so much about human nature, about greed, about how easy it is to break someone just for your self interest."

"Most importantly, it taught me about myself. Could I rise again after such a huge setback? Oh yes I could! I found that my dream, my passion, was as indestructible as a rock."

"I continued writing. I continued sending my manuscripts to publishers, and magazines, unfazed by the rejections. Gradually, some of them started getting published", he said, handing Saswata a thick volume of his publications. He used the pseudonym "Phoenix".

"Such an apt name", though Saswata, "but why have I never heard of him?"

The mystery man continued, "It turned out, people loved what I wrote, so the publishers loved me. The trickle became a deluge. And it has now ended up with this", he pointed to the Booker Citation.

"Of course the going has not been smooth. 30 long years of struggle to reach this stage. How can it be smooth! But I survived! Because I had the conviction, that what I am doing is what I want to do! Without conviction, you will be crushed at the first hurdle itself. Crushed!"

Saswata heard the dinner bell just then. He said, "Thank You sir! For sharing your story. It was truly very inspiring. Now I'm a little surer about what I want to do. I really want to stay in touch with you. Can I now know your name?"

"Come on! You know me. You know me better than anyone in the world!"

"I'm sorry sir! You are mistaken. You are confusing me with someone else. Please tell me, who are you?"

"Well, my friend! I am Saswata, 30 years in the future!"

Saswata just went blank. He staggered and fell back. Instantly, he opened his eyes. He found himself lying on his hostel bed, with unpacked luggage scattered all round him.

He started smiling. He now knew what to do. He calmly got up, lit up a candle, and started burning his student I.D. card.

'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫ থেকে ১৬

টেম্পার কারখানা

সূচনা ঃ 'টেম্পার কারখানা' নামক পরীক্ষা নিরীক্ষাটির 'সমাজ বিজ্ঞান' চর্চা হিসেবে 'আমাদের কাজ' এবং 'আমাদের কাজ (সংযুক্তি ১ থেকে ৬) নিয়ে মোট সাতটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে ইন্টারনেটে গত ডিসেম্বর ০৯ থেকে। এই সাতটি লেখার সংকলনের সাথে পরিশেষে (আমাদের কাজ—সংযুক্তি ৭) নিয়ে ১৬তম লোকসভার সাম্ভাব্য ফলাফলের একটা অনুমান করা হয়েছে। বিষয়টা জটিল এবং কঠিন ফলে ঘাটতি থাকবেই। পাঠকদের কাছে আশা করব তা পূরণের।

(ক) ডিসেম্বর ০৯

আমরা আজ যারা মিলিত হয়েছি তাদের মধ্যে সাধারণ বন্ধনের সূত্র হল ''টেম্পার কারখানা'' নামের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থী আর্দশে বিশ্বাসী। ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে দেশের অগ্রণী প্রচার মাধ্যমে যা প্রকাশিত বা আলোচিত হয়েছে বা হচ্ছে তার সম্পূর্ণতার অভাব এবং জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে বেশ কিছু উদ্বেগজনক দিক সঠিক ভাবে বিবেচিত হচ্ছে না—এই মনোভাব-ই আমাদের এক সাধারণ মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা-র জন্য দেশের জনমত গঠনে বামপন্থী দলগুলির জড়তা বা সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে আমরা আরও বিচলিত বোধ করছি। বিগত ৩৫ বছরের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার আলোক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে অনুভব, তাকে ভিত্তি করেই এই খোলা মেলা আলোচনা, যার মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে বাস্তব সমীক্ষা এবং দুর্বলতা কাটানোর জন্য পথের অন্বেষণ। সম্ভব হবে কি করণীয় তার একটা প্রাসঙ্গিক রূপরেখা তৈরি করা। সম্মিলিত এই মতামতগুলি আমরা চারপাশের চিন্তাশীল মানুষদের কাছে নিয়ে যাব, যাতে আলোচনা আরও সমৃদ্ধ হয় এবং এই আদানপ্রদানের মাধ্যমেই কাটবে ধোঁয়াশা মিলবে পথের দিশা। যে পথে হাঁটলে হয়তো আজকের আমাদের মনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা খানিকটা হলেও কাটবে। ইতিহাসের শিক্ষা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্র বিভিন্ন সময়ে (শ্রেণীশত্রুর বেশ ও ভেক বদলের সঙ্গে সঙ্গে) তার অভিমুখ না পাল্টালে তার আঘাতের শক্তি কমে যায়, এই বদলের কোনও পুর্বনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, না আছে তার কোনও ''মেড ইজি'' সমাধান, আছে খালি কিছু বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এই নিয়মগুলি আর শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের অন্বেষণের পাথেয়!

জাতীয় দলগুলির ফলাফল ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব

সাধারণভাবে ১৫তম লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল আগামী ৫ বছরের জন্য একটি স্থায়ী সরকার হবার ধারণাকেই জন্ম দিয়েছে। বিগত ২০ বছরের মধ্যে ভারতের সর্ববৃহৎ জাতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের ফলাফল সবচেয়ে ভাল হয়েছে। ১৯৯৯ সালের পর এই প্রথম তারা ২০০টিরও বেশী আসন লাভ করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তুলনায় অনেক খারাপ ফল করেছে। পরিসংখ্যান তথ্যানুযায়ী এই দুই বৃহৎ দলের মিলিত ভোট গতবারের (মোট) ৪৮.৭% তুলনায় ১.৩% কমেছে। কংগ্রেসের বেড়েছে ২.১%, বিজেপির কমেছে ৩.৪%। অন্যান্য জাতীয় দলগুলির প্রভাব কয়েকটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় তাদেরকে আঞ্চলিক দলগুলোর সাথেই ধরা হয়েছে। বামপন্থী ও অন্যান্য বৃহৎ আঞ্চলিক দলগুলির মোট ভোট কমবেশী ৩৭.৫%-র মধ্যেই বিগত দুটি লোকসভার মত স্থির আছে। এই তথ্যগুলি দ্বিদলীয় শাসনের যারা প্রবক্তা তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য আশাকরি যথেষ্ট। ভারতীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক বৈচিত্র্য অর্থাৎ ''রেইনবো প্যার্টান'' অক্ষুন্ন আছে, বরঞ্চ এর প্রভাব মনে হয় অল্প হলেও বেড়েছে। এবারের নির্বাচিত সদস্যরা মোট ভোটারের গড় মাত্র ২৫% ভোট পেয়ে নির্রাচিত হয়েছেন যা আগের তুলনায় নিম্নমুখী। বামপন্থী রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রে এই চিত্রটা অনেকটাই আলাদা। মাত্র ৫ জন সদস্য ব্যতীত এবারের সব সদস্যই নিজ কেন্দ্রে বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন। এইসব তথ্য দ্বিদলীয় শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বের ভবিষ্যৎ ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় তৈরি করে।

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈচিত্র্য এবং বামপন্থী দলগুলির অবস্থান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খার মঞ্চ হিসাবে কংগ্রেসের জন্ম এবং বৃদ্ধি। গান্ধী, প্যাটেল, জিন্না, নেহেরু, নেতাজী, নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক ধারা বা ব্যক্তিচেতনার জন্ম কংগ্রেসের জঠরে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবধারা কখনো শ্রেণীগত অবস্থান, কখনও বিশেষ পারিবারিক আনুগত্য, কখনো বিশেষ ধার্মিক প্রাধান্য, কখনও বিশেষ রাজ্যের বা

অঞ্চলের অগ্রাধিকার, কখনও বিশেষ ভাষার জাতীয় স্বীকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে বারে বারে কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, জাতীয়তাবাদী চরিত্র সম্পর্কে জনগণের মনে প্রশ্ন জেগেছে বিশেষতঃ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। এক জাতীয় রাজনৈতিক দলের এই দোদুল্যমানতার ফলে বহু আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক দলের উৎপত্তি ঘটেছে। সাধারণ নির্বাচনগুলিতে সামগ্রিক দেশের মতামত বা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটার বদলে রাজ্যগুলির চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত বা পরিবেষ্টিত হয়েছে। জরুরী অবস্থার পরবর্তী সময়ে এই ধারা দ্রুতি পেয়েছিল। দেশের স্বাধীনতাকে মিথ্যা বলার সাহস বা অপরাধের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বামপন্থীরা নিজেদের স্বাতন্ত্রতাকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতের রাজনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই)। অপরদিকে তেভাগা, তেলেঙ্গানা, ৬০ দশকের জমির লড়াই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানতে থাকে। শিল্পজগতেও সংযুক্ত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর উদাহরণ স্থাপনা হয়। আন্দোলনের জোয়ার ধাক্কা দেয় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে। ছাত্র, যুব, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেই আন্দোলনে সামিল হ'ন। বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনেও এই আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা, স্ট্যালিন পরবর্তী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনৈক্যের প্রভাব, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে নিজেদের ঐক্যে ফাটল ধরে। কংগ্রেসের মতো কমিউনিস্টদেরও বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহের উর্ধ্বে থাকে না। এর সুযোগে রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা সুপরিকল্পিত ভাবে নামিয়ে আনা হয় আক্রমণ। জাতীয় আন্দোলন এবং বামপন্থীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে জাতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস) ভিত্তিক জনসংঘ (যা কিনা সাম্প্রদায়িক বি.জে.পি-র অগ্রদূত) এবং আরও কিছু আঞ্চলিক দল। তারাও ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে স্থান করে নিতে থাকে। জরুরী অবস্থার পর কংগ্রেস বিরোধী বাম এবং ডান উভয় জোটই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির সঠিক প্রয়োগের ফলে জনগণের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন বামপন্থীরা। অথচ এই সময়েই জঙ্গী কৃষক আন্দোলনকে শিকার হতে হয় বাম হঠকারিতার। বাম হঠকারি শক্তিকে সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্র পরোক্ষভাবে মদত দিতে থাকে বাম ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য। গণআন্দোলনের উপর রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত আক্রমণের প্রথম শিকার হ'ন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, যদিও তার কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবাসী টের পান স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ। জরুরী অবস্থার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বাম ঐক্য বহু শহীদের আত্মত্যাগের ফলে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে ৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে (তা সে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা যাই হোক না কেন) সবগুলিতেই বামপন্থীরা কমবেশী ৫০% ভোট পেয়ে জয়ী হন। শুধু ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বেই এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট। নির্বাচনগুলিতে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল ভারতের গড় ভোট প্রদান থেকে অনেক ওপরে (প্রায় ৮০% মানুষ তাদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার লাগাতার প্রয়োগ করেছেন এবং করেন)। শুধু ভোটে অংশগ্রহণ করাই নয়, আইনী স্বীকৃতি পাওয়া জমির লড়াই-র ফলে মানুষের যে উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই খুব কম সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে কৃষিক্ষেত্রে সামনের সারিতে এনে ফেলে। ভুমিসংস্কার, সেচ, উন্নত বীজ, সার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সাধারণ মানুষকে স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা ইত্যাদি দৃষ্টান্তমূলক কাজ বামপন্থীদের এক নির্ভরযোগ্য জোট হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জায়গা করে দেয়। যদিও বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীরা উদ্যোগী হন কিন্তু প্রথমে একটি এবং পরে আরও দুটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই তাদের সাংগঠনিক শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত পতনের পরে দেশ অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থানের পর কংগ্রেস দোদুল্যামানতা দেখালেও বামপন্থীরা বিশেষ করে এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং তার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অবস্থায় পৌঁছে যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে প্রথমদিকে বাবরি মসজিদ্ এবং পরবর্তীকালে গোধরা ইত্যাদি মারাত্মক ঘটনা ঘটার পরেও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয় বামপন্থীরা। এই সমস্ত ঘটনাতেই ভারতের ঐতিহ্য ''বৈচিত্র্য ও সমন্বয়'', রাজনীতিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকে। ১২তম লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস সহ সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর (যাঁর দল ১৯৭৭ সাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি ফ্রন্টকে সক্ষমতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এবং জাতীয় স্তরে কিছু প্রয়োজনীয় বিকল্প প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল) নেতৃত্বে হিন্দুত্বের

বিপদ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছিল। বোধহয় বামসংকীর্ণতার জন্যেই এই সম্ভাবনাপূর্ণ বিকল্পটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এর ফলে বামদলগুলি ছাড়া প্রায় সবজায়গাতেই সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বাড়তে থাকে এবং কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে এবং ১৩তম লোকসভায় বিজেপির নেতৃত্বে (এন ডি এ জোট) কেন্দ্রে সরকারগঠন করতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ ঐতিহ্যশালী ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি দলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন বিপদের সূচনা করল। এর উপর বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি এবং তার নিজস্ব বিপদ তো আছেই। এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতেই ধর্মনিরপেক্ষ ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি কাছাকাছি আসতে থাকে। অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রশ্নেও দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বজায় রাখতে ধীরে হলেও ''সম্পূর্ণ উদারীকরণের'' বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। ১৩তম লোকসভাতেই এই মেরুকরণ শুরু হয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে। ফলস্বরূপ ব্যাঙ্ক, বীমা, তৈলক্ষেত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কর্মচারীরা উদারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই সংগঠিত করতে থাকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে। বিপদগুলি একেবারে না কাটলেও কার্যকরী প্রতিরোধের ফলে দেশের অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের সার্বিক ক্ষতি করতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পবিকাশের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে উদারিকরণের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা বুঝে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী। শুরু হয় এক অসম বিকাশের প্রতিযোগিতা। উদারীকরণের প্রকোপে ভারতে কৃষিবিকাশের বৃদ্ধির হার থমকে থাকে। সার, বীজ প্রভৃতি সবকিছুরই দাম ফসলের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে শিল্পে উন্নত অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে শিল্প বিকাশের পাশাপাশি ঘটতে থাকে বিপুল সংখ্যক কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে অগ্রগতি ৮০র দশকের তুলনায় মূলতঃ বিশ্বায়নের প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাতীয় গড়ের উপরে ধরে রাখা সম্ভব হয়। ফলস্বরূপ এখানেও একধরনের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। শিল্পায়নের ভিত কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এর পশ্চিমবঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যগুলি তালিকাভুক্ত করলে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—

(১) ভারতের সংবিধান সম্মত আইনের বামপন্থী রূপায়ণ হল পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার আইন এবং তার বাস্তব প্রয়োগের ফলে ছোট ও প্রান্তিক চাষীরা এই প্রথম ''লাঙ্গল যার জমি তার'' এই স্লোগানের বাস্তবতা উপলব্ধি করল। সাথে সাথে জমিতে উৎপন্ন ফসলের মালিকানা যে কি পরিমান উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরী করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ৮০র দশকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমান থেকে। অথচ জমি ছোট ছোট অংশে আল দ্বারা বিভক্ত হবার ফলে যন্ত্রের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, সেচের অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উৎপাদন দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাবে বাড়তে থাকে এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের মতো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই বৃদ্ধি কমলেও জাতীয় গড়ের উপরেই থাকে।

(২) মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% (যারা জমির সঙ্গে যুক্ত) মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং এই সম্মিলীত ক্রয়ক্ষমতার পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করে ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির চাহিদা বাড়তে থাকে।

(৩) পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জমির পরিমান বৃদ্ধি না হওয়ার যে দ্বন্দ্ব তার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের সন্ধান চলতে থাকে। এর মাঝে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপের ফলে যে সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত যে ব্যাপক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তার ফলস্বরূপ এই সময়েই সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বউদ্যোগের আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। জন্ম হয় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প উদ্যোগের যার শাখা প্রশাখা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত হয় কাজের সন্ধানে। ২০০০-০১ সালে অসংগঠিত ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা এবং তার সাথে যুক্ত মানুষের সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক হয় পশ্চিমবঙ্গে। মোট ১৭০ লক্ষ ইউনিটের মধ্যে ২৭ লক্ষ অর্থাৎ ১৫.৮২% ইউনিট এবং এর সাথে যুক্ত ৩৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫৮ লক্ষ অর্থাৎ ১৫.৬৭% শ্রমিকের কাজের সুযোগ হয় কেবল পশ্চিমবঙ্গেই। সংগঠিত ক্ষেত্রে নানান কারণে বৃদ্ধি বা চাকরীর সুযোগ নিম্নমুখী হলেও ছোট এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগের বৃদ্ধি ঘটে। ছোট ছোট জমি ও স্বউদ্যোগ মালিকদের সমন্বয় এক বিকল্প স্বনির্ভরতার জন্ম দিচ্ছিল। ফলে ১৯৮৩ সালে যে দারিদ্রতা বা দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসাবে ৬৯.৫৬% থাকলেও ২০০৪-০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৮.৪৯%, যা কিনা সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় কম।

এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব বিভিন্ন বৈচিত্রের ফলে (ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি) এই ধরনের সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন ধারার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় ফলস্বরূপ কিছু জটিল দ্বন্দ্বের আত্মপ্রকাশও ঘটে। বহু প্রমাণিত

পথের কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। একই সঙ্গে নতুন নতুন পথেরও অন্বেষণ চলতে থাকে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বহু অভিনব দিক উন্মোচিত হয়, একদলের বদলে ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক বিন্যাস প্রভৃতি। ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সহমত বা জাতীয় মতের জন্য পরস্পর ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী গোষ্ঠিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার গুরুত্ব বহুগুন বেড়ে যায়। ধৈর্য্য, সাহস, সততা, জ্ঞান, দৃঢ়তা প্রভৃতি মৌলিক গুণাবলীর প্রয়োজনও হয় অনেক বেশী। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'-র প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা প্রশ্নাতীত হয়ে পড়ে। বামপন্থীদের এই বিষয়টিতে অতীত অভিজ্ঞতা থাকায় জাতীয় রাজনীতিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। সব মিলিয়ে ১৩তম লোকসভার মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ১৪তম লোকসভার আগেই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাছাকাছি আসতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হয় UPA, বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন করে Common Minimum Program-এর ভিত্তিতে। CMP-র মূল বিষয়গুলি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা এবং সাধারণ মানুষের উপকারের কাজের অভিমুখের সংকলন। CMP রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও তার রূপায়ণে দুর্বলতা বামেদের মধ্যে লক্ষ্যণীয়! এখানে উল্লেখ্য যে বামেদের সর্মথনের উপর ভিত্তি করেই ইউ.পি.এ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। একই সঙ্গে কেরলে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ১০ বছর বাদে বামপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সঙ্গে কেরালা যুক্ত হয়ে মোট তিনটি রাজ্যে বামেরা ক্ষমতায় থাকে। লোকসভার স্পীকার পদ ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি কমিটির সদস্যপদ বা কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের পদ বামপন্থীরা গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ না করে বাইরে থেকে সমর্থন জানায়। দেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে বামপন্থীদের এই অবস্থান বোধহয় প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় নি। ঐতিহাসিক C.M.P. রূপায়ণে বামপন্থীদের কাছে যে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও দক্ষতা আশা করা গিয়েছিল তা বাস্তবে সংসদ বা আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল বা মোহজালে আটকে পড়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে C.M.P. রূপায়ণে যে গণআন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল তা হয় নি। অথচ কেরলে এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫০ ও ৬০-র দশকে এই বামপন্থীরাই সফলতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই দোদুল্যমানতা মানুষের কাছে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে এক ধোঁয়াশা তৈরি করে। দেশী ও বিদেশী বামবিরোধী শক্তিগুলি এর পূর্ণ সদ্বব্যবহার করে। ধর্মনিরপেক্ষ জোটে বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশঃই কমতে থাকে। দেশের প্রয়োজনে দেশপ্রেমিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং বামপন্থী শক্তির এক দীর্ঘমেয়াদী ঐক্য এবং একে কেন্দ্র করে যে যৌথ কর্মকান্ডের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছিল তা পূর্ণতা পেল না। সাধারণভাবে এর দায়িত্ব বামপন্থীদের উপরই বর্তায়। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় বামদূর্গেও ১৫তম লোকসভায় বামপন্থীদের ভোট ৮% কমে যায়, সংসদে বামেদের আসন ২৪এ নেমে আসে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের পর প্রথমবার বিরোধীদের কাছে আসন ও মোট ভোটের হিসাবে পরাজিত হয়। কেরলেও পরাজয় হয়। কেবল ত্রিপুরার দুটি আসন অটুট থাকে। অথচ যে সমস্ত জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিছুটা হলেও সংগঠিত করা গিয়েছিল সেখানে সমর্থন বৃদ্ধি পায় ফলে সর্বভারতীয় হিসাবে বামপন্থীদের ভোটের হার ১৪তম লোকসভার তুলনায় একই থাকে, বিহার ও ঝাড়খন্ডে C.P.I. (ML)-র ভোট নিলে ঐ হার সামান্য বৃদ্ধি পারে।

বামপন্থীদের ঘাটতি/ত্রুটি/বিচ্যুতি

সোভিয়েতের পতনের পরে সারা বিশ্বে মানুষের শোষণহীন সমাজ গড়ার প্রয়াস এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, কিন্তু এক প্রত্যয়দৃঢ় আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ আবার অন্বেষণে ব্রতী হয়। টিকে থাকা সমাজতান্ত্রিক চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি থেকে মানুষ যেমন লড়াইয়ের শিক্ষা নেয় তেমনই সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে ভারতের বামশাসিত অঙ্গরাজ্যগুলির থেকেও নতুন দিশার সম্ভাবনা দেখা দেয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এর প্রয়োগের বহুল সফলতা লক্ষ্য করা গেছে। ১৪তম লোকসভায় বামপন্থীদের সর্বাধিক শক্তি (৬১ জন সাংসদ) ও তিনটি অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতাসীন এই পটভূমিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। প্রথমেই বলা ভাল যে ''সঠিক পথের সন্ধান'' অবশ্যই হতে হবে গণআন্দোলনের মাধ্যমে। যতই তর্ক-বিতর্ক ঘাত প্রতিঘাত হোক না কেন দেখতে হবে গণআন্দোলনের অগ্রণী অংশের ভূমিকা কি? একথা ইতিহাস প্রমাণিত যে ভারতের বামপন্থী ঐক্যের ইতিহাসে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। বিভিন্ন সময়ে নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কাছাকাছি এসেছে এই সংসদীয় কাঠামোর মধ্যেই। এই বাম ঐক্য এবং তার নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা থাকার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য দুটি রাজ্যে সোভিয়েত পরবর্তী সময়ে এক স্থায়ী বিকল্পের যেখানে কৃষির বিকাশ, স্বউদ্যোগ, গণবন্টনের প্রসার এবং তার ন্যায্যতা, দারিদ্রতা হ্রাস ইত্যাদির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। মাওবাদী নামধারী বামপন্থীরা এই প্রমাণিত বাস্তবকে অস্বীকার করে। তাদের ''শ্রেণীসংগ্রাম''-র নামে ব্যক্তিহত্যা যার এক সিংহভাগ বামপন্থী নেতা ও কর্মী

হওয়ায় বাম ঐক্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরেছে একদিকে আর অন্যদিকে ''সংসদীয় মোহ'' ক্রমেই বাম বিচ্যুতির এক চিরাচরিত ব্যাখ্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কেরলে বামপন্থী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিজ দলের রাজ্য সম্পাদকের বিরোধ এবং সেই বিরোধ প্রকাশ্যে আসার পর পলিটব্যুরোর দোদুল্যমানতা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ জেলার সবচেয়ে বড় বামদলের সম্পাদক ও একাধিক বাম সাংসদও বিতড়িত হ'ন দল থেকে, শুধু তাই নয় নির্বাচনে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন, এক রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য টিভি চ্যানেলে (নির্বাচনের ঠিক আগের দিন) সাক্ষাৎকার দেবার সময় কেন্দ্রীয়কমিটির অবস্থানের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রাখেন, বামদলের নেতৃবৃন্দ প্রায়শঃই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখছেন, ইত্যাদির ফলস্বরূপ যে বাম ঐক্যের প্রতি জনসাধারণের ভালবাসা, আস্থা, শ্রদ্ধা ছিল তাতে চিড় ধরে। ক্ষমতালোভী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জনগণ এই বামপন্থীদের তুলনা করছেন। এই সমস্ত কারণই এক চরম হতাশার জন্ম দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিরোধীতার অনুঘটক হিসাবে বুদ্ধিজীবিদের একাংশ এবার বেশ সফলতা পেয়েছেন। অথচ এই বুদ্ধিজীবিরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টের কাছের মানুষ বলেই বিবেচিত হতেন। এও লক্ষ্য করা গেছে যে এঁদের সমর্থনে ভিন্ রাজ্যের কিছু সামাজিক কর্মীও এরাজ্যে এসে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। দেশী ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে এইসব কর্মীরা বহুল প্রচার এবং গুরুত্ব পাচ্ছেন। এইসব ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে যেমন আমেরিকাসহ বিদেশী শক্তির যেমন স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তেমনই বামপন্থীদেরও কৈবল্যও সমভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমটি স্বাভাবিক হলেও দ্বিতীয়টি খুবই উদ্বেগজনক কারণ আজকের অবস্থায় বামপন্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রমাণিত বা পরিচিত পথের পরিবর্তে অচেনা রাস্তাতেই হাঁটতে হবে বেশী আর এই অচেনা রাস্তায় সঠিক পথের অনুসন্ধানে শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা পরীক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তা না করে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা দেখেছি বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা, দক্ষতা, শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি গুণগুলির মাপকাঠিতে বিচার না করে কেবল স্তাবকতা সহ নানান সুবিধাবাদী ঝোঁক আর ''পাওয়া ও পাইয়ে দেবার'' রাজনীতি আজকের তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের মানসিক উৎকর্ষতা এক চরম তলানিতে নিয়ে গেছে। ফলে একদিকে যেমন শিল্পী শিল্পকলাকে, শিক্ষক শিক্ষাকে ... এককথায় বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞান মেধা ও বুদ্ধিকে পণ্যতে পর্যবাসিত করেছেন অন্যদিকে বৌদ্ধিক ভাবে মধ্যমেধার বুদ্ধিজীবিরা শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতিরেকে নিজেদের বামপন্থী বলে আত্মশ্লাঘার দোষে দুষ্ট হচ্ছেন। ভারতের জনগণ বামনেতৃত্বের কাছে এই পচনের বিকল্প আশা করেছিল। যা অনেক বছরের বামশাসিত রাজ্যগুলিতেও পূরণ হয়নি।

ভূমি সংস্কারের উপর ভিত্তি করে বামশাসিত রাজ্যগুলিতে এক বিকল্প বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে যেখানে ছোট ছোট জমির মালিকের সঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র স্বউদ্যোগীদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। বিশ্বায়ন ও লগ্নীপুঁজীর আগ্রাসনের সামনে এই ছোট উদ্যোগগুলিকে টিকিয়ে রাখাই এক সুকঠিন পরীক্ষা। পুঁজির আগ্রাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যেমন মার্কসবাদী উদ্ভাবনের প্রয়োজন তেমনই এই ছোট শিল্পোদ্যোগগুলিতে গুণগত মানের উৎকর্ষতা বিষয়ক সচেতনতা, মিতব্যয়ীতা, উৎপাদনশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নমনীয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলির লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটাতে হবে। চীনের গ্রামীণ শিল্পায়ণ বা rural industrialization-র শিক্ষা মনে হয় এক্ষেত্রে কার্য্যকারী হবে। বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, সাবান, জামাকাপড় ইত্যাদি সামগ্রীর ক্ষেত্রে চীনের এই গ্রামীণ শিল্প এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে। চীনের এই গ্রামীন শিল্পায়নের সুফল সারা বিশ্ববাসী উপভোগ করছে। দেশের অঙ্গরাজ্য হিসাবে বসতির ঘনত্ব, চাষযোগ্য জমির পরিমান, দূষণগত সমস্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি মাথায় রেখে ইস্পাতের মতো ভারী শিল্পের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ তা পুনর্বিবেচনার বা পুর্নমুল্যায়নের প্রয়োজন আছে। ''শিল্পে আমরা অগ্রনী ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব'' এই ধরনের স্লোগানকে পরিণাম দেবার জন্য যে গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন তার ঘাটতি রয়েছে বামদলগুলির শিল্পনীতির প্রয়োগে। এই কারণেই মনে হয় শিল্পায়ন নিয়ে উদ্ভুত দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে বামপন্থীরা পিছু হঠছে।

কমরেড লেনিন যখন তাঁর বিখ্যাত রচনাতে ''সাম্রাজ্যবাদ পুঁজীবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়'' মার্কসীয় ভঙ্গীতে প্রমাণ করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মুখোস উন্মোচন করেছিলেন তখনও বোধহয় সাম্রাজ্যবাদ এত উন্নত অবস্থায় পৌছয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে আমেরিকা তার বিশ্বব্যাপী ঘৃণ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে। তারপর প্রায় ৬২ বছর পেরিয়ে গেছে ভোলগা থেকে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কথাটি আজও ঘৃণার সাথেই উচ্চারিত হয়। যদিও বহু ভারতীয় আজও মার্কিন নাগরিকত্বর জন্য লালায়িত। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে

ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থায় উন্নয়নের স্বার্থে দেশীয় বুর্জোয়ারা সমভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির উভয়ের কাছ থেকেই সাহায্য চেয়েছে। ''ঠান্ডা যুদ্ধ''কে সুকৌশলে নিজেদের কাজে লাগাতেও সক্ষম হয়েছে। শুধু এটুকুই নয় সোভিয়েত পতনের পর একমেরুর বিশ্বতে নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ১২০ কোটি মানুষের এক বিশাল গণতন্ত্রকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই যতই অতিবামপন্থীরা মুদ্সুদ্দী বুর্জোয়া বলুক না কেন দেশীয় পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিক্রী হয়ে যায় নি। কিছুদিন আগেই বিশ্বব্যাপী মন্দায় মার্কিনিদের বহু তাবড় কারখানা বন্ধ হয়েছে, বেকারী এবং সামাজিক অস্থিরতা বেড়েছে বহুগুন। এক কৃষ্ণাঙ্গ আজ মার্কিন রাষ্ট্রপতি। সুতরাং বলা চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একমেরুর বিশ্ব এই স্বপ্ন সফল হয় নি। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদের অধুনা পরিচয় লগ্নীপুঁজি বা ইংরাজীতে যাকে বলা হচ্ছে Floating Capital (extremely mobile finance capital)—তার বিপদ এবং তার আগ্রাসনের মোকাবিলাই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রসাঙ্গিক হবে না যে পুঁজি কিন্তু নিজেকে সামজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতিদ্রুত পরিবর্তন করে নিতে পেরেছে বা এখনও পারছে অন্য মোড়কে! এবং এই কাজে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকরাই ব্যবহৃত হচ্ছেন। তাই বামপন্থীদেরও বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়েই লড়াই করতে হবে। মার্কসবাদী অন্ধবিশ্বাস নিয়ে নয়।

কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের আঁতুড়ঘর। মানুষের মধ্যে শ্রেণীহীন সমাজের বোধ তৈরী হয় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে। রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্যে না থাকলে এই গুরুত্বপূর্ণ মানবধর্মের থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কারণ বিচ্যুত হবার প্রলোভন বা সুযোগও তুলনায় অনেক কম থাকে, ফলে ক্ষমতায় থাকলে এই লড়াই অনেক কঠিন। এই লড়াই করেই গত ৩২ বছর ধরে বামফ্রন্ট ৫০% মানুষের আস্থা অর্জন করে। কিন্তু এক শ্রদ্ধেয় বাম নেতার কথামত **''শ্রেণীসংগ্রাম আজ নিজের মধ্যে জারি রাখতে হবে''** এই কথাটা প্রতিটি বামপন্থীকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। একটা দীর্ঘসময় ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার ফলে ব্যক্তিপ্রকোপ বৃদ্ধির যে সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকে, তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় কেন্দ্রীয় সরকার / লোকসভায় কিছু নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পাবার সুযোগের সাথে। ফলে বহু পরীক্ষিত বাম নেতৃবৃন্দের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সুযোগ সুবিধার প্রতি এক সুবিধাবাদী, নীতিহীন নির্ভরতা বা লোভ। তাই শ্রেণীহীন সমাজের আঁতুড়ঘরেই তৈরি হতে থাকে শ্রেণীবিন্যাস। ব্যক্তির বিস্তার পার্টির মৌলিক অবস্থানই নষ্ট করে দেয়, ''কমরেড'' কথার অর্থ বা তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গন করার মত বাস্তব অবস্থারই অবসান ঘটায়। আভ্যন্তরীণ নীতি, গণতন্ত্র, গঠনতন্ত্র সবই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে জনগন লাল পতাকা হাতে নিজেদের প্রতিটি পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে শহীদ করে বিশ্বকে ফ্যাসীবাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের দেশে লাল পতাকার পতন বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে মেনে নিয়েছে। এটা কোনও কল্পনা নয়, রূঢ় বাস্তব! ফলে মার্কসবাদের মনন, পরিশীলন এবং গোঁড়ামি বর্জিত প্রয়োগই একমাত্র পথ নতুবা পরিনাম বিজ্ঞানসম্মতভাবেই অবশ্যম্ভাবী!

পরিশেষে কিছু ভাবনা :

আমাদের কাজ হতাশার জন্ম দেওয়ার বা তার প্রতিপালন নয়, বিচ্যুতির কারণানুসন্ধান এবং সঠিক পথের অন্বেষণ! তাই কিছু সম্মীলিত ভাবনা পরিশেষে আমরা তুলে ধরতে চাই। ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর সঙ্গে এক যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে ''একমেরুর বিশ্ব''-র বিকল্পসন্ধান পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জারী আছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই প্রয়াসে ১২০ কোটি মানুষের ভারতবর্ষে বামপন্থীদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ! পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থীদের সবচেয়ে মজবুত দূর্গ। ১৫তম লোকসভার ফলাফল বামবিরোধীদের আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে, তারা ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছেন তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে বামফ্রন্টকে উৎখাত করতে ব্রতী হয়েছেন। আগামীদিনে যে আগ্রাসন আরও তীব্র হবে এ সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই, সমস্ত বামপন্থীকে এই অবস্থায় বামপন্থাকে রক্ষা করতে হবে শুধু চিন্তা বা কার্যক্ষেত্রে নয় নিজের জীবনেও। এই পরীক্ষায় সফল হতে গেলে আপোষহীনভাবে 'আমাদের কাজ' চালিয়ে যেতে হবে। এই ভাবনা বা বক্তব্য উপরের আলোচনায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু যেহেতু 'আমাদের কাজ' বলে আলোচনার শুরু তাই কাজের কথাতেই শেষ করছি:—

(১) ভারতের বামপন্থার ইতিহাসকে মাথায় রেখে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সমস্ত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, উন্নয়নমুখী, শ্রমজীবি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এবং এই জোটের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দায়বদ্ধ হয়েই এই জোটে অবস্থান করতে হবে এবং প্রয়োজনে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হবে। এই জাতীয় দায়িত্বের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হ'ল বামঐক্যকে মজবুত ও প্রসারিত করা। ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় সহকারে সমাজবিকাশের ধারাতে জোটসঙ্গীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি সংবেদনশীল জাতীয় বিষয়ের উপর বাস্তব অবস্থা বিচার করে

সঠিক বিকল্প রচনা ও ধৈর্য্য সহকারে সহমতের ভিত্তিতে তাকে রূপায়ণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(২) জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার প্রমাণস্বরূপ তাদের সুখ এবং দুঃখের সদাসঙ্গী হতে হবে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ধৈর্য্যসহকারে শুনতে হবে, শুনতে হবে জনগণের সমালোচনা ও পরামর্শ এবং সেইমত কাজের রদবদল করতে হবে মূল শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা বা না থাকার উপর জনগণের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্ক নির্ভর করে না। এই নিবিড়তাই জাতীয় স্বার্থে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই বাম বিকল্প সম্পর্কে জনগণের ধারণাকে স্পষ্ট করবে ফলস্বরূপ বিকল্পের রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটবে জনগণের গরিষ্ঠাংশের।

(৩) অঙ্গরাজ্যের সংসদীয় ক্ষমতায় থাকার বিপদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং দীর্ঘদিনের আন্দোলনের শিক্ষাকে পাথেয় করে শ্রেণীসংগ্রামকে কষ্টিপাথর হিসাবে ব্যবহার করতে হবে বিশেষতঃ নেতৃবৃন্দকে। এবং এর জন্য সাময়িক কোন পদ্ধতিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিরবিচ্ছন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে।

(৪) কিছু অঞ্চলের বামপন্থী সফলতাকে শেষ বলে ধরে না নিয়ে তাকে আরও ব্যাপক ভাবে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং যেখানে সফল প্রয়োগ হয়েছে তাকে আরও উচ্চস্তরের সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজবির্বতনের পথে শেষ বলে কিছু নেই।

(৫) ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঐতিহ্যশালী দেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ করতে গেলে তার প্রকৃত ইতিহাস, শ্রমজীবি মানুষের আন্দোলনের শিক্ষা এবং বহুবিধ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে হবে। যে কোনও ধরণের মতবাদের গোঁড়ামি বা বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

(খ) ফেব্রুয়ারী ২০১১

২০০৯ সালে, ১৫তম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল-কে খোলামেলা আলোচনা করে আমাদের মতো সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদের করণীয় কি তার একটা প্রয়াস আমরা শুরু করেছিলাম ''আমাদের কাজ'' এই লেখাটির মধ্যদিয়ে। অতীতকে বিশ্লেষণ করে, নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষ্য-গত দিক (objective) দিয়ে লেখাটি শেষ করা হয়েছিল। আমরা চেষ্টা করব এবার পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন-কে প্রেক্ষাপট করে আমাদের এই সংযোজনকে লক্ষ্য-গত (objective) এবং বিষয়কেন্দ্রীক (subjective) ভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরিপুষ্ট করা। এধরনের সংযোজনা ভবিষ্যতেও চালু থাকবে।

পটভূমিকা

সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি মোহগ্রস্ত বামপন্থীদের অবস্থা লোকসভা এবং পশ্চিমবঙ্গে তৎপরবর্তী পুরসভা নির্বাচনের পরে বেশ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল (যদিও একমাত্র ত্রিপুরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী থাকে)।

(১) এমনকি যে দেশপ্রেমিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে বামপন্থীদের ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল (১৪তম লোকসভার সময়) তা বেশ জোরালো ধাক্কা খায়। যদিও সাম্প্রদায়িক শক্তি এর সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়।

(২) বামপন্থীদের সর্ববহৎ দুটি দুর্গে ৮% কম ভোট পেলেও দেশের বাকি কিছু অংশ অ-কংগ্রেসী দেশপ্রেমিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে বামেদের ঐক্যের একটা সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। ফলস্বরূপ ১৪ এবং ১৫ লোকসভাতে বামপন্থীদের ভোট একই ছিল বরঞ্চ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(৩) কৃষিঋণ মুকুব, বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল এবং ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা গ্রামে এক নতুন সমীকরণের সূচনা করেছিল।

(৪) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা ভারতে তুলনায় কম প্রভাব ফেলতে পেরেছিল এবং জাতীয় গড় উৎপাদন (GDP) কখনই পশ্চিমী দেশগুলির মতো অতোটা অধোগতি প্রাপ্ত হয়নি।

কিন্তু এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলির থেকে সঠিক শিক্ষা বা লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার লক্ষ্মণ বামেদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। বামেদের এই দুর্বলতা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে উৎসাহিত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, ফলে একদিকে যেমন ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচী (CMP, Common Minimum Program) বাতিল হয়, আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি সাক্ষরিত এবং সংসদের অনুমোদন পায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ (যা কিনা বামেদের বিরোধিতায় থমকে ছিল) নতুন উদ্যমে শুরু হয়। আরও একটি দিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আক্রমণ সংগঠিত করে সেটা হল বাম-দুর্গগুলিতে পরিকল্পিতভাবে অতিবাম এবং দক্ষিণপন্থীদের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ফ্যাসিবাদী প্রচার এবং বেছে বেছে লাল-পতাকাধারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পাশবিক আক্রমণ। কেন্দ্রীয় বাজেটে নির্লজ্জভাবে সমাজের উপরতলার অংশকে ব্যাপক সুবিধা দেওয়া চালু হয়। গুজরাট, বিহার, ঝাড়খন্ডের মতো রাজ্যে এন.ডি.এ নামক সাম্প্রদায়িক জোটের পুনর্উত্থানের ইঙ্গিতকে জোরালো করে এক স্বচ্ছ ও গতিশীল প্রশাসনের মুখোশের আড়ালে। পেট্রোল ও ডিজেলের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ওঠানো হয় ফলে শুরু হয় নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি। এই অবস্থায় তেল উৎপাদনকারী দেশগুলিতে

অভ্যন্তরীন গোলযোগের ফলে এটি একটি সামগ্রিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ বন্টনব্যবস্থা (Public Distribution System)-কে ধাপে ধাপে নির্মূল করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। বোধহয় স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে এই মাপের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নি। এর সাথে কমনওয়েলথ গেমস, ২জি কেলেঙ্কারি-র ঘটনা প্রমাণ করে দুর্নীতি ও কালোটাকা কিভাবে সু-উচ্চতায় পৌঁছে গেছে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের এই সর্বব্যাপী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা নতুন করে সংগঠিত হবার তাগিদ ধীরে হলেও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রভাব প্রকৃত বামপন্থীদের নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগঠিত হতে শুরু করেছে। উৎসাহ-জনক কিছু সফলতাও আসছে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়:

(১) জঙ্গল-মহল সহ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানে বামপন্থীদের সফল প্রতিরোধের ফলে মাওবাদী-তৃণমূল জোটের আক্রমণ অনেক স্তিমিত হওয়া (কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই মৃত্যুর ঘটনা ঘটছিল), কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাও গঠনমূলক। স্কুল পঞ্চায়েতগুলি আবার কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।

(২) শিক্ষার অগ্রগতি রুখতে ছাত্র-সংসদগুলি দখল করতে দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ চেষ্টা প্রতিহত করে পশ্চিমবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ কলেজে বামপন্থী ছাত্রদের দখলে আসার বিষয়।

(৩) উত্তরপূর্ব ভারতের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম করেই প্রতিটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বামপন্থীদের বিজয়।

(৪) সিঙ্গুর থেকে টাটা বিদায় নেবার পরেও অন্যত্র লগ্নী চালু থাকার ফলে বিগত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের গতি স্তিমিত থাকেনি।

(৫) গত বছর সেপ্টেম্বরে সফল শিল্প-ধর্মঘট এবং এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের সংসদ অভিযান স্বাধীনতা পরবর্তী সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক শ্রমিক অভিযান। এর ফলে শ্রমিক ঐক্য এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ছাড়া বামপন্থীসহ সবকটি শ্রমিক সংগঠনই এতে সামিল হয়েছিলেন।

(৬) ডাঃ বিনায়ক সেনের গ্রেপ্তার এবং তার পরবর্তীকালে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে সেই সম্পর্কে ব্যাপক আলোড়নের ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর শাসকশ্রেণী তার নগ্ন আক্রমণ সরাসরি নামিয়ে আনতে কিছুটা হলেও দ্বিধাগ্রস্ত। একটা কথা উল্লেখ করা ভাল, পশ্চিমবঙ্গে-র মাওবাদীদের বিরোধিতা করা আর একজন আদিবাসীদের চিকিৎসক-কে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করা একই চোখে দেখা উচিত নয়।

(৭) পরবর্তীকালে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের জনসভায় বহু পুরানো কমরেডকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

(১) বিকাশের হার প্রায় ৯% থাকায় বিগত বিশ্ব-মন্দার সময়েও এটা কখনোই ঋণাত্মক হয়নি, ফলে বিকাশশীল অর্থনীতির গুলির মধ্যে অন্যতম আজ ভারতবর্ষ।

(২) বিগত কয়েক বছরে দেশীয় সামন্ত প্রভুদের অবাধ লুণ্ঠন এবং বহুজাতিক কৃষি সংস্থাগুলির প্রবেশের ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে অপরদিকে অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির শিকার হচ্ছেন দেশের অগণিত মানুষ। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম রয়ে গেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে। কৃষি উৎপাদন এখনও প্রকৃতি নির্ভর অনেকটাই। মাত্র ৪৫% জমিতে সেচের সুবন্দোবস্ত আছে।

(৩) Floating Capital-র ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে দুর্নীতি ও কালোবাজারি এক অভূতপূর্ব স্তরে পৌঁছেছে। ‘‘গ্লোবাল ফিন্যানসিয়াল ইন্টেগ্রিটি’’-র হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বের মোট কালোকাটার প্রায় ৫০% ভারতের দান। দেশের মধ্যেও এর পরিমান ১৬/১৭ লক্ষ কোটি টাকার কম নয়।

(৪) দেশীয় বৃহৎ-পুঁজি এবং বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে তৈরি হয় আমাদের দেশের অর্থনৈতিক নীতি। ফলে আমাদের GDP & consumer spending-র মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশঃ কমছে। তার মানে হচ্ছে manufacturing industry-র থেকে আমরা ক্রমশই সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি-র দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়ছি। কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

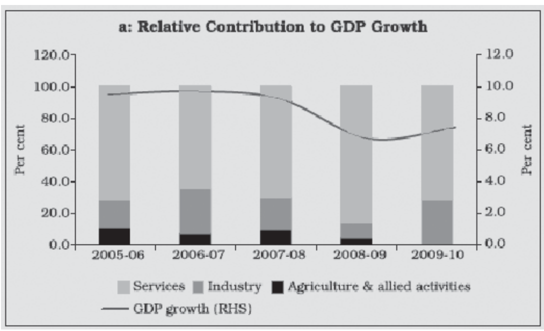

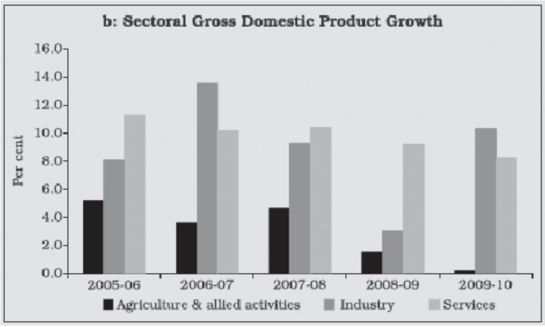

উপরের পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে বিশ্ব-মন্দার সময়, ভারতের গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূলতঃ সার্ভিস সেক্টরের উপর নির্ভরশীল ছিল। আরও একটি বিপদজনক দিক বেরিয়ে আসে তা হল ক্রমহ্রাসমান কৃষি উৎপাদন।

এইরকম বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক প্রবণতার প্রধান কারণ ভারতের শাসকশ্রেণীর এক জগাখিচুড়ী শ্রেণী-চরিত্রের জন্য।

একদিকে যেমন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প-দক্ষতা, যোগাযোগব্যবসথা, কর্মসংস্কৃতি, স্ব-উদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে বিকশিত হতে চাইছেন, অন্যদিকে শাসকশ্রেণী-র প্রতিভূ হিসাবে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাদের নিজস্ব মিশ্র শ্রেণী-চরিত্রের বশবর্তী হয়ে ওই উদ্যোগের ফল আত্মসাৎ করার চেষ্টায় মেতে আছেন কোনোরকম দায়বদ্ধতার পরোয়া না করেই। এর ফলেই সমাজে নানারকম অসাম্য, অস্থিরতা, অরাজকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি সমস্তরকমের অস্বাস্থ্যকর প্রবণতার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে।

বামপন্থীদের কর্তব্য

আগের লেখাটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বলা যায়, সমস্তরকমের অস্বাস্থ্যকর প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা এবং সুসংহত বিকাশকে নিশ্চিত করে এক দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের এই-সুবিশাল দেশের বৈচিত্র্যকে সামনে রেখেই বামপন্থীদের কাজের লক্ষ্য নির্ধারিত করতে হবে। অঙ্গরাজ্য গুলিতে বিকাশের তারতম্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জমির বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুলির মধ্যে ঐক্যের সূত্রের উদ্ভাবনী আবিষ্কার এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মধ্যদিয়েই বামপন্থীদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে হবে। আজকের দিনে বামপন্থীরা ৩টি অঙ্গরাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা পুষ্ট, তাই অভিজ্ঞতার দাম্ভিক প্রকাশ নয় তার ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যই আজকের আমাদের কাজ। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে এবারের মতো শেষ করব। বাম-শাসিত রাজ্যগুলিতে, সাধারণভাবে গণতন্ত্রের সুফল হিসাবে সাধারণ মানুষের আত্ম-মর্যাদাবোধ তুলনামূলক-ভাবে বেশী, তার সাথে দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতাও তাদের চেতনাকে পুষ্ট করেছে, তাই তারাও আজ তৈরি, লড়াইয়ের জন্য, প্রয়োজনে শহীদ হবার জন্য। তাই আরও একবার বলি কাস্তে শানাও, যেখানে যত দেশপ্রেমিক মানুষ আছো একজোট হও, আরেকবার খুলে দাও মেকীদের মুখোশ। আরও একবার ভারতের বামপন্থাকে রক্ষা এবং বিকশিত করার অঙ্গীকার দিয়েই শুরু হোক আমাদের কাজ।

(গ) মে ২০১১

"It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness; it was the epoch of belief, it ws the epoch of incredulity; it was the season of Light, it was the season of Darkness; it was the spring of hope, it was the winter of despair; we had everything before us, we had nothing before us;..."

এবারকার সংযুক্তি-র পটভূমিটা একটু অন্যরকম। একদিকে যেমন আক্রমণ সর্বব্যাপী অন্যদিকে প্রতিরোধের চেষ্টারও মাত্রা ব্যাপক। একদিকে যেমন গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে পুঁজি তার আগ্রাসন বাড়িয়ে চলেছে, একইভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন বামপন্থা-র পতাকার নিচে।

পাঁচটি রাজ্যের চারটিতে বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেরও ৬ দফা নির্বাচনও আর দু-একদিনের মধ্যেই শেষ হতে চলেছে। নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলাকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটা স্পষ্ট দিক-নির্দেশ করছে। তাৎক্ষণিক জয় পরাজয়ের থেকেও ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মেরুকরণের সূচনা হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৪ সালে লোকসভাসহ বাকী রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন প্রভৃতির মধ্যেদিয়ে এই মেরুকরণ এক সর্বভারতীয় আকার গ্রহণ করবে। এবং এই মেরুকরণই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই মেরুর একটি অবশ্যই বামপন্থীরা। দেশের প্রতিটি বামপন্থীকে এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় নিজ নিজ জীবনে ও কার্য্যক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। না'হলে আমরা পিছিয়ে যাব সেই অন্ধকার দাসত্বে। আজকের সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নের যুগে এই ভূমিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্তালিনের নেতৃত্বে রুশজনগণের ভূমিকার থেকেও বোধহয় কঠিন, লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। ফলে সফল

হলে এর প্রভাব হবে আরও ব্যাপক ও স্থায়ী। ব্যার্থ হলেও ফরাসী বিপ্লবের মতোই এর শিক্ষাও আগামী সমস্ত রকম সমাজপরিবর্তনের প্রেরণা হয়ে থাকবে।

২০০৮ সাল অবধি যেরকমভাবে চলছিল তাতে এটা দিবাস্বপ্ন বলেই মনে হতো। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাক্রম আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি বামপন্থীকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষই শেষকথা বলে, কারণ :

(১) দেশের অর্থনীতির সবল ও স্বাধীন বিকাশসত্ত্বেও একে বিশ্বের লগ্নী বা ভ্রাম্যমান পুঁজির কাছে বিকিয়ে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মরীয়াভাবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে ১৯৯১ সাল থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হলেও গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসীর স্বাধীন চেতনার ফলে এই চেষ্টা পূর্ণ সফলতা পাচ্ছিল না। যদিও কেবলমাত্র বামপন্থীরা ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী-র কাছে এখন এর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব নেই। কখনো সাম্প্রদায়িকতা, কখনো আঞ্চলিকতা, কখনো অর্থনৈতিক প্রলোভন, কখনো দুর্নীতি, কখনো সন্ত্রাস, কখনো ধারাবাহিক অপপ্রচার এবং দেশের অগ্রণী প্রচার মাধ্যমকে শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক সুফলকে দেশের মধ্যে বন্টনের বিষয়টিকে গুলিয়ে দেবার নিরলস প্রচেষ্টা হচ্ছে। মানুষের জীবনে শান্তি, স্থিরতা দ্রুত বিপন্ন হচ্ছে। গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসীর যৌথ প্রয়াসে যে অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তাকে কিছু লোভী, দেশদ্রোহী, ক্ষমতাবান শ্রেণীর মানুষ কুক্ষিগত করে ভাসমান পুঁজির অঙ্গ বা দাসে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে সাদাটাকা অতিদ্রুত কালোটাকায় রূপান্তরিত হয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে। প্রভিডেন্ড ফান্ডের/পেনশনের টাকা শেয়ারবাজারে খাটানোর উদ্যোগে নেওয়া হচ্ছে, সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে, দেশের কৃষিজমিতে কর্পোরেট ফার্মিং-র চেষ্টা চলেছে, ব্যাঙ্ক বীমা-র মত দেশের অর্থনৈতিক স্তম্ভগুলিকেও বিদেশী পুঁজির আওতায় আনার জোরালো প্রক্রিয়া চলছে। এই অপচেষ্টার বিরোধী প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ আন্দোলন দমনের জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরও প্রয়োগ হওয়া শুরু হয়েছে। ভারতের মতো ঐতিহ্যশালী গণতন্ত্রে, সহনশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ধর্মটিকে একেবারেই গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ কেবল মরিয়া নয় সর্বাত্মকও বটে। ব্যাক্তিকেন্দ্রিকতা এবং ব্যাক্তিকে মহামানব পর্যায়ে উন্নীতকরণ, প্রচারমাধ্যমকে (ছাপা এবং বৈদ্যুতিন) সম্পূর্ণরূপে ধনিক শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার, মিথ্যাচারের অন্ধ বেসাতি, অপর্যপ্ত অর্থের প্রয়োগ প্রভৃতি এটাই প্রমাণ করে যে, এবারের আক্রমণ সম্পূর্ণ ফ্যাসীবাদী চরিত্র নেবে যদি প্রতিরোধও সর্বাত্মক না হয়। প্রকৃত বামপন্থীরা এবারের নির্বাচনে এটা প্রমাণ করেছেন তাঁদের দুর্গগুলিতে মরণবাঁচন লড়াই করে, বিরামহীন মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে। কোনরকম যুদ্ধই বিনা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া হয় না। তাই বামদুর্গের উপযুক্ত মেরামতি বা ক্ষেত্রবিশেষে নবনির্মান জরুরী হয়ে পড়েছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরও বৃহৎ লড়াইয়ের প্রয়োজনে।

(২) যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির দিশারী হয়েও বামপন্থীরা এর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে এক অদ্ভুত জড়তার পরিচয় দিয়ে এসেছেন ঐতিহাসিকভাবে। এটা যখন বাস্তব যে দিল্লীতে এখন আর একদলীয় শাসন সম্ভব নয়, ফলে এমতবস্থায় এই ধরনের জড়তা কূপমন্ডুকতারই নামান্তর। বাস্তব হচ্ছে তিনটি বামশাসিত রাজ্যের বাইরে বিহার, ঝাড়খন্ড, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে বামফ্রন্ট গঠিত হয়েছে এবং ক্রমশঃই তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হচ্ছে, বিধানসভার আসনে এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন না ঘটলেও ভোটের শতাংশে এর স্পষ্ট উপলব্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধির প্রমাণ মিলছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মুকাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে এটা দেখা যাচ্ছে বামপন্থী এলাকাগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ঝড়েও টিকে থাকছে। ছত্তিসগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের বিস্তীর্ণ আদিবাসী অঞ্চলে বঞ্চনার বিরুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ইঙ্গিত। ন্যূনতম মজুরী, চাকরীর নিরাপত্তা ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব সুষমবন্টনের প্রশ্নে সমস্ত রাজ্যেরই ক্ষোভ রয়েছে। দেশের তিনপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তিনটি জনবহুল রাজ্যপরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে বামপন্থীদের। বর্তমান অবস্থায় সার্বভৌমতা, গণবন্টন ব্যবস্থা, ধারাবাহিক ভূমিসংস্কার, সাম্প্রদায়িক ও ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের সম্প্রীতি, শিক্ষার প্রসার, কাজের অধিকার, বিকল্প শিল্পনীতি, নিরবিচ্ছিন্ন এবং সুসংহত উন্নয়ন প্রভৃতি জ্বলন্ত জরুরী বিষয়গুলিকে নিয়ে বামপন্থী আন্দোলন অবশ্যই সমস্ত ভারতবাসীকে এক বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প পথের দিক-নির্দেশ করবে যদি সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে নিয়ে প্রচার ও আন্দোলন করার পরিকল্পনা করা যায়।

(৩) ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে আরও বিকশিত করতে বামপন্থীরা অনেক কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে কারণ তাঁরা গণতন্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন শ্রেণীসংগ্রামকে বিকশিত করতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের যে মূল্যবান শিক্ষা সারা বিশ্ব পেয়েছিল কমিউনিস্টদের পথচলার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার অন্যতম

প্রধান শিক্ষা হ'ল আজকের বিশ্বে দ্বন্দ্বগুলি তুলনায় অনেক জটিল হওয়ায় সঠিক সিদ্ধান্ত ও নীতিনির্ধারণের জন্য গণতন্ত্রের আরও বিকাশের প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টিতে সঠিক কেন্দ্রীকতা পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিকাশ ছাড়া অসাড় হয়ে পড়তে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট গঠন এবং তৎপরবর্তী সময়ে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক গণতান্ত্রিক প্রয়োগ ১৯৯১ সালের সোভিয়েত পতনও তাকে তেমনভাবে শক্তিহীন করতে পারেনি বরঞ্চ তার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী অবস্থান বামপন্থীদের উপর এক সর্বাত্মক আক্রমনের সূচনা হয় এবং বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক শক্তিতে পরিনত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এবারের নির্বাচন তাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে কঠিন নির্বাচনী লড়াই। এই সুকঠিন লড়াইয়ে মানুষের বিপুল সাড়া প্রমাণ করে সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস সফল হয়নি। কালোটাকার বিপুল ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ, কিছুক্ষেত্রে বামেদের বিচ্যুতি বা ব্যার্থতা ইত্যাদি কোনকিছুই প্রকৃত বামপন্থীদের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অসমর্থ হয়েছে। জনগণ আরও সংগঠিত হয়েছেন, লালঝান্ডা কাঁধে দায়বদ্ধতা এবং ডান্ডাহাতে (অর্জিত অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার প্রয়াসকে) প্রতিহত করার সংকল্পের প্রমাণ দিয়েছেন নির্বাচনী লড়াইয়ে। খেটেখাওয়া মানুষের এই উন্নত ভূমিকা এক উন্নত্তর বামঐক্যের সূচনা করেছে। জন্ম দিয়েছে আরও উন্নত চিন্তাচেতনার। ভারতবর্ষের বামপন্থীদের গণতন্ত্রের উপর ভরসা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের আগামীদিনের সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের চালকের আসনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে।

পরিশেষে

কালবিলম্ব না করে ১৩ই মে-র পর, পরিক্ষীত লৌহদৃঢ় বামঐক্যের উপর ভরসা করে আসুন এই মেরুকরণকে সংসদ এবং সংসদ বর্হিভূত প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার কাজ শুরু করা যাক ভারতবর্ষের বিকাশের ফল গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসীর কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে।

(ঘ) জুন ২০১১

এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি, ১৩ই মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা-র পর থেকেই বামবিরোধী শিবির উল্লাসে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন! চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে অনেক বুদ্ধিজীবি(?) আবার এটাকে সোভিয়েতের পতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন! কেউ কেউ আবার এই ফলাফলকে কিভাবে ভোদকায় চুমুক দিতে দিতে ভারতবর্ষে বামেদের প্রাসঙ্গিকতা নামক ধারনার কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার প্রয়াসে কি ভাবে পরিনত করা যায় তার চেষ্টা করছেন! অনেকেই ভারতবর্ষে ''বাজার অর্থনীতি''-র ভবিষ্যৎকে অত্যুজ্জ্বল করে তোলার দিকে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন! অন্যভাবে অনেকেই বলছেন ''এটা হচ্ছে বিশ্বায়নের স্বপক্ষে ভারতবাসীর সুস্পষ্ট রায়''!

সব মিলিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, ১৯৯১ সালে যে যাত্রাপথের সূচনা করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ করার যে মূল বাধা, তাকে অতিক্রম করার দিকে এগোনো গেছে। মিডিয়া-র (ছাপা এবং বৈদ্যুতিন দুই-ই) গরিষ্ঠাংশ এই চিন্তা-ভাবনাকে মদতপুষ্ট করাতে এটা এখন খানিকটা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতাও অর্জন করেছে।

আমাদের রাজ্যে এই উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই হয় বামপন্থীদের হত্যা করা হচ্ছে অথবা তাঁদের জনসমক্ষে প্রচন্ড মারধর বা হেনস্থা, শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এমনকি মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বামদল বা তাঁদের গণসংগঠনগুলি-র অফিস হয় দখল করা হচ্ছে বা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার বামসমর্থকরা (এবং তাঁদের পরিবারেরাও) ঘরছাড়া হচ্ছেন। মনিষীদের ছবি বা মূর্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার নামক মিথ্যা অভিযোগ/অভিযানের নামে বহু অগ্রণী নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার বা হেনস্থা করা হচ্ছে। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল গালাগালি বা ভীতিপ্রদর্শনই নয়, তাদের অভিভাবকদেরও শাসানো হচ্ছে। প্রশাসনের সর্বস্তরে চলছে বদলি ও রদবদলের পালা (পরিবর্তন?)। প্রত্যাশামতোই সদ্যনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী-র মুখের আশ্বাসবানী এবং তার দলের লোকেদের কার্য্যকলাপ একেবারেই বিপরীতগামী। এবং প্রাক্তন জাতীয়-সুরক্ষা সম্মন্ধীয় উপদেষ্টা বর্তমানে আমাদের রাজ্যপাল মূক এবং বধির হয়ে পড়েছেন!

এবার একটু পিছনে ফেরা যাক। ২০০৪ সালে মূলতঃ বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথম ইউ.পি.এ সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ জোটকে পরাস্ত করে। ত্রিপুরাতেও বিপুল জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা বিজয়ী হয় বিদেশী মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে। ২০০৬ সালে কেরলে আবার বাম ও গণতান্ত্রিক জোট ক্ষমতায় ফিরেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ৫০ শতাংশেরও বেশী ভোটদাতার আস্থা নিয়ে সপ্তমবার বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে এই ধরণের অনুকূল পরিস্থিতি এর আগে দেখা যায় নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশী ও বিদেশী বামবিরোধী শক্তিগুলি এই ক্রমবর্ধমান বামপ্রবণতাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে শুরু করেন।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্র (এক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যে) ক্ষমতায়

থাকার কিছু বিপদ বা বিচ্যুতির ঝোঁক থাকে, যদি-না গণআন্দোলন দ্বারা তাকে ক্রমাগত কশাঘাত করা যায়। এবিষয়ে আমরা আমাদের মূল লেখাটিতে (আমাদের কাজ) বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণ তাঁদের রায়ের মাধ্যমে অসন্তোষ বামপ্রভাবের ক্ষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার অতিবিশ্বাসে এর উপযুক্ত গুরুত্ব বা সঠিক বামপন্থী সংশোধন কর্মসূচী নেওয়া হয় নি। মূলতঃ স্থানীয় কারণ, বামবিরোধী শিবিরের অনৈক্য, সংসদীয় ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়ে প্রভাবশালী বামবিরোধী নেতৃত্বকে প্রভাবিত করা—এই সমস্ত চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশলে এর সমাধান খোঁজা হয়েছিল। যা'র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা দেখেছিলাম ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং তৎপরবর্তী ২০১০ সালের শহর শহরতলীর পৌরসভা বা পৌরনিগমগুলির নির্বাচনে। এই পটভূমিতে আত্মবিশ্বাসী বামবিরোধীরা দেশী এবং বিদেশী সমস্তরকম শক্তি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নির্বাচন ঘিরে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ মরনবাঁচন লড়াই এবং মানুষের সাড়া যেমন আছে তেমনি নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সালের তুলনায় বামেরা প্রায় ১৮-২০ লক্ষ মানুষের ভোট বেশী পেয়েছেন এবারের মতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল বহু মানুষের অভিজ্ঞতার বিপরীত হওয়ায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন এবং তার ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন মহলে কথা-বার্তা চলছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ব্যলটপ্রথার প্রবর্তনও জাতীয় দাবি হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরধরে ধারাবাহিকভাবে সরকারে থাকার অভ্যাস (বা বদঅভ্যাস)-এর ফলে বামপন্থী(?)দের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক, হতাশা, হঠকারিতা প্রভৃতি ব্যাধির কিছু লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এই ক'দিনের মধ্যেই কিছু আত্মহত্যার (বাধ্য হয়ে?) ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে। নিজেদের মধ্যে দোষারোপের প্রবণতাও বেশকিছু বামদলের নেতৃস্থানীয় নেতাদের কণ্ঠে শোনা গেছে। এই নির্বাচনের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ধাক্কা সামলাতে প্রয়োজনতিরিক্ত সময় নিয়ে ফেলেছেন। এইসব ঘটনাই বিভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিচ্ছে আরও বেশী করে। দীর্ঘদিন সংসদ বর্হিভূত কার্য্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকার ফলে অনভ্যাস বা অনভিজ্ঞতা (দেউলিয়াপনা?) বামনেতৃত্বকে একটা যাকে বলে ''ন যযৌ ন তস্থৌ'' অবস্থায় এনে ফেলেছে।

১৯৬৭-৭৭ এই সালগুলোর অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তৎকালীন শাষক গোষ্ঠী কম্যুনিস্টদের বিদেশীদের চর, নেতাজী-র বিরুদ্ধ পক্ষ প্রভৃতি অপপ্রচার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজনকে উস্কানী দেওয়া ইত্যাদি থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছিল। প্রকৃত বামপন্থীরা প্রতিবাদে সংসদ বয়কট করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু সংসদ বহির্ভূত কার্য্যকলাপের মধ্যদিয়েই জনগনের সঙ্গে নিবিড় সম্মর্ক রক্ষা করতেন। ৭২-৭৭ এ ১২০০ বামপন্থীকে শহীদ হতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনের স্বার্থে। বহু বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে জেল খাটতে হয়েছিল হয় মিথ্যা অভিযোগে অথবা বিনা বিচারে। এসত্ত্বেও সাবধানতার সঙ্গে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বামপন্থী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েই বামপন্থীরা জনগণের কষ্টার্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের মূলসূত্র মাথায় রেখে। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সংগঠিত করেছিলেন এই আধা স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সংগঠন। ফলে জোতদার বা জমিদার-দের থেকে উদ্ধার হওয়া অনেক জমিই কৃষকরা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক আন্দোলনও আক্রমনের মুখে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিবাদী সৃষ্টিগুলি হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও থেমে থাকেনি। নির্বাচনের সুযোগ না থাকলেও ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন শিক্ষা এবং চাকরি-র দাবিতে বিস্তার লাভ করেছিল। এরপর এসেছিল সারা ভারতব্যাপী ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট। শাষকের রাষ্ট্রযন্ত্র তার গণতান্ত্রিক নির্মোক খুলে ফেলে বাধ্য হয়েছিল সারা ভারতে জরুরী অবস্থা জারী করতে। আমাদের যা থেকে শিক্ষা নিতে হবে সেটা হ'ল এই সমস্ত আধা স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমনকে মোকাবিলা করার জন্য বামপন্থীরা সাধারণভাবে সাবধানতা, গোপন কার্য্যকলাপ, জনগনের মধ্যেই নিজেদের আত্মগোপন করে থাকা, ক্ষেত্রবিশেষে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি রণকৌশলের সাহায্য নিলেও, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আধা বা পূর্ণ পার্টিসান ওয়ারফেয়ারের দিকে যায়নি বা যাবার প্রয়োজন হয়নি। জনগণের আক্রোশের মাত্রা বুঝে শাসকদল অবশেষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ভূল হয়েছিল এই কথা স্বীকার করে ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের ঘোষণা করে। এই নির্বাচনে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবনতার অবসান ঘটিয়েছিলেন জনগণ, এই জনগনের গরিষ্ঠাংশ নিরক্ষর এবং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতেন। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বদলে কেন্দ্রে এসেছিল জোট সরকার। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের গভীরতা। আর পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল এক অভূতপূর্ব সামাজিক পরীক্ষা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও ওয়েলফেয়ার স্টেট-র সুফল কিভাবে শ্রেণীসংগ্রামকে বিকশিত করতে পারে তার নিরীক্ষা। যখনই বামপন্থীরা শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জনগনকে সঙ্গে নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তখনই গরীব মানুষরা বুকের রক্ত দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ অবধি কতজন বামপন্থী কর্মী খুন হয়েছিলেন লালঝান্ডা-র পবিত্রতা রক্ষায় তার হিসাব নিলেই চিত্রটি আরও পরিস্কার হবে।

তাই ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপর ভরসা রেখেই বামপন্থীদের এগোতে হবে। পালন করতে হবে দায়িত্বশীল বিরোধী ভূমিকা। আমরা যদি ৬৭ সালের আগে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী এঁদের ভূমিকা দেখি তবে জানবো দায়িত্বশীল বিরোধীতা দিয়েও বহু গণআন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করা যায় এবং তার নেতৃত্ব করা যায়।

নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি (বিশেষতঃ আদর্শগত) নিয়ে যেমন আলোচনা হবে তেমনই অতিদ্রুত নিজেদের শৈথিল্য কাটিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভাবন করতে হবে আন্দোলনের মূল বক্তব্যকে। আর এই সমস্তকাজটাই জনগণের সক্রিয় অংশীদারীত্বে করতে হবে। শুধু জনগনের রায় মাথা পেতে নিলেই হবে না। দেখতে হবে এই রায় কি বামবিরোধী প্রচার আর মিডিয়া সন্ত্রাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা। দেখতে হবে কোনও অত্যাধুনিক কৌশলদ্বারা এ রায় পরিচালিত হয়েছে কিনা। প্রত্যাবর্তনে জনগনই শেষ কথা বলবে। ফলে দিকে দিকে বামপন্থীদের উপর আক্রমণ রুখতে হবে সংঘবদ্ধ ও সচেতনভাবে। সংসদ এবং সংসদ বহির্ভূত আন্দোলনকে আরও বেশী করে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীর কষ্ঠিপাথরে ফেলে তবেই তার রূপরেখা তৈরী করতে হবে। নৈরাজ্য, আতঙ্ক, হতাশা, হঠকারিতা সব ঝেড়ে ফেলে আমরা এগিয়ে যাব আরও আরও মেরুকরণের পথে। যে মেরুকরণ, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সুফলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর মধ্যে প্রসারিত করবে, আমাদের ঐতিহ্যশালী গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে। জাত-পাত, নিরক্ষরতা, অনাহারের মত অভিশাপ ইতিহাসে পর্যবাসিত হবে।

(৬) মার্চ ২০১৩

* A few has surplus on everything but majority have shortage on everything...

* Confusion - helplessness - foolishness is passing, conclusions - self-beliefs - wisdoms are emerging.

* Deadly summer was end, rain with heavy lightening; flood, slippery path etc. are reality.

* Worst time of unipolar globalisation is fading, better times with multi polarity (dialectical) is visible.

এক বন্ধুর চিঠির কিছু অংশ দিয়ে আমরা শুরু করলাম এবারের সংযুক্তি।

''আমাদের কাজ'' লেখাটি শুরু হয় ২০০৯ সালে ১৫তম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ঠিক পরবর্তী সময়ে। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩২ বছর পর বামবিরোধীরা ওই নির্বাচনে জয়ের মুখ দেখেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন নিয়ে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ-২ এর সরকার গঠিত হয়। এই পরিবর্তনের সময়ের কাছাকাছি কোনও একটা সময়ে ডঃ অশোক মিত্র তাঁর একটি লেখায় ''বাম পরিবৃত্ত''-র উল্লেখ করেছিলেন। এই পরিবৃত্তের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে আমরা ''আমাদের কাজ'' লেখাটি শুরু করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে তিনটি সংযুক্তি প্রকাশিত হয়েছে। শেষ অর্থাৎ সংযুক্তি-৩ প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বিগত (২০১১) বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকমাসের মধ্যে, যে নির্বাচনের আশাতীত ফলাফলের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন দীর্ঘ্য ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে পরিবর্তনের স্লোগানে ধুলিসাৎ করে শ্রীমতি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মা মাটি মানুষের সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। এই পরিবর্তন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সেই খবর এবং তার প্রতিক্রিয়া কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত নয় সারা বিশ্বে আলোচিত হয়েছিল!

প্রত্যাশিত ভাবেই এই পরিবর্তনের মাত্র দু-বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যেই পরিবর্তিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের বামবিরোধী জোট ভেঙ্গেছে, রাজ্যে নারী নির্যাতন, অপরাধ প্রণতা, গণতান্ত্রিক কাঠামো ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণ, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, দুর্নীতি, শিল্পে অনিশ্চয়তা, কৃষিপন্যের নুন্যতম দাম কৃষককে না দেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের মৌখিক সমালোচনা সত্ত্বেও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ায় ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে মানুষের মোহ দ্রুত ভাঙছে। কিন্তু সঠিক বামপন্থার কোনও অভিমুখ বা প্রজ্জ্বলিত উদাহরণ সামনে না থাকায় তারা দিশাহারা। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কয়েক বছর আগের শ্রী অর্জুন সেনগুপ্তের তথ্যানুযায়ী মোট জন-সংখ্যার ৭৭% অর্থাৎ প্রায় সমস্ত সাধারণ মানুষ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী আয়ের নিরিখে দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাস করছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে নানান্ ধরনের ভর্তুকি প্রকল্প

চালু হয়েছে, কিন্তু নানা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত কারণে এর সবটাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এমনকি দারিদ্র-সীমা নিয়েও অনেক বিভ্রান্তি স্বার্থান্বেষী মানুষের কাছে জরুরী হয়ে পড়েছে যাতে বৈষম্য ও দুর্নীতি লাগাম হীন ভাবে বাড়িয়ে তোলা যায়। সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার থেকে মুক্তির জন্য তাঁরা ক্রমশই মরিয়া হয়ে উঠছেন। সমগ্র বিশ্বের মানুষ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন এই ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার আলোড়নের ফলাফলের আশায়। কারণ, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ (সংখ্যায় ১০০ কোটিরও বেশী), বিশ্বের ৪টি বিকাশশীল অর্থনীতিগুলির একটির চালিকাশক্তি এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আগামী দিনে পৃথিবী বা মানবতা কোন পথে চলবে তার অন্যতম নির্নায়ক শক্তি। অবস্থাটা কেবলমাত্র পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার ১/৬ অংশ বলে নয়, বা বিশ্বায়নের নামে এক মেরু বিশ্বের সমর্থক দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির জন্যও নয়, বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য নয়, অবস্থাটা তৈরী হয়েছে গণতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান ভাবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের জন্য, ভারতবাসীর শ্রম কুশলতা ও মেধায় গড়ে ওঠা স্বনির্ভর কৃষি, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির জন্য, সাম্প্রদায়িকতা সহ নানাবিধ বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে দেশের ঐক্য অখন্ডতা স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য। বিশ্বায়নের নামে এক মেরুর অর্থনীতির যে গা-জোয়ারী ব্যবস্থা বিগত দু দশকের কিছু বেশী সময়ে ধরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার যে চক্রান্ত চলেছে তার অন্যতম বিকল্প বহু মেরুর ব্যবস্থা সম্পর্কে আশা তৈরী করার জন্য। এক মেরুর প্রবর্তকেরা যখন মন্দার ফলে বিভ্রান্ত তখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে উন্নয়নের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ তৈরী হয়েছে। শিক্ষা ও চেতনার বিকাশ ঘটেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ (পরিবহন এবং দূরভাষ) ব্যবস্থারও প্রভুত উন্নতি হওয়ার ফলে বিচ্ছিন্নতা বা বিভ্রান্তি তৈরী করেও মানুষের মধ্যের যোগাযোগ আটকে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু সারা দেশে বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে, এমনকি বিশ্বের নিরিখে অশিক্ষা-অপুষ্টি ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিতে ভারতের অবস্থান খুবই আশঙ্কাজনক। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সরকারী ক্ষমতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের হাতে থাকছে না। সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী দলগুলির অধিকাংশই প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজের উচ্চ আয়ের মানুষের, এবং স্বভাবতই সাধারণ মানুষের সংগঠিত অংশগ্রহণকে প্রতিহত করার জন্য সংবাদ-মাধ্যম, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি কে অর্থের মাধ্যমে প্রভাবিত করা হচ্ছে, এই প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্বায়নের ছত্রছায়ায়। সাধারণ মানুষ ধীরে হলেও, পরিস্থিতির চাপে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন। এই অবস্থায় বামপন্থীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ তাঁদের সর্ববৃহৎ এবং মজবুত দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে পরাজয়ের পর।

পশ্চিমবঙ্গে এই পরাজয়ের কারণ হিসাবে প্রভাত পট্টনায়ক সঠিক ভাবেই বলেছেন ''রাজনীতি-র হাতুড়ে-করণ বা সহজ কথায় 'পুঁজিবাদ পার করে সমাজের পরবর্তী উন্নত স্তরে উত্তরণের মূল মতাদর্শগত লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে শুধুমাত্র কিছু ব্যবহারিক রাজনৈতিক কর্মসূচীতেই নিজেদের আটকে রাখার প্রবণতা (Miopic Vision)-র কারণই নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ...' নির্বাচনী পরাজয়ের থেকেও এই হাতুড়ে-কারণের প্রবণতাই আরও অনেক বেশী শঙ্কার কারণ''।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানে রাজনৈতিক মেরুকরণের যে সুযোগ বামপন্থীদের কাছে এসেছে সেগুলি হল ঃ—

(১) ২০-২১ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট: বলা বাহুল্য এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার কিছু আগেই এই ধর্মঘটের সাফল্যগুলি বামপন্থীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। ৯০-এর দশকে শুরু হওয়া বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এটি ১৫তম এবং সর্ববৃহৎ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ২ দিনের লাগাতার ধর্মঘট এই প্রথম। এই ধর্মঘটে যে ভাবে শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপক ভাবে আন্তরিক এবং ময়দানে নেমে সমর্থন করেছেন তাতে প্রমাণিত যে সঠিক ভাবে দাবীগুলির স্বপক্ষে একজোট হয়ে মূল বিষয়গুলিকে তুলে আনতে যদি বামপন্থীরা একজোট হতে পারে তবে সাধারণ মানুষও একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি এই ধর্মঘটের সাফল্যকেই প্রতিবাদের জোট বাঁধার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখতে হবে।

(২) ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন: অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এক্ষেত্রেও বামপন্থীরা তাঁদের জয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থী বিকল্প কি তার ব্যবহারিক উদাহরণ হিসাবে সারা ভারতে এবং বিশ্বেও সম্মান লাভ করেছেন। উলেক্ষ্য যে মার্কসবাদী বিকল্পের সঠিক প্রয়োগ বর্তমান অবস্থাতেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বামপন্থীরা শুধুমাত্র তাঁদের জনসমর্থন বাড়িয়েছেন তাই নয়, একটি অঙ্গ রাজ্যে দারিদ্রদূরীকরণ সহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা আশা করি ভারতের বামপন্থীরা এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেদের বিকশিত করতে পারবেন।

(৩) সর্ব-ভারতীয় জাঠা: দেশের চারটি প্রান্ত থেকে এই

জাঠার মাধ্যমে মানুষের মূল দাবীগুলির সাথে সাথে সঠিক বাম বিকল্পকেও প্রাধান্য দিতে হবে। অঙ্গ রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় থাকার অভিজ্ঞতার নিরিখে ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধী ভূমিকা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কাজের তথ্য সংবলিত পুস্তিকা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত করে প্রতিটি গ্রামে প্রচার সংগঠিত করে মানুষকে জাঠায় অংশগ্রহণ করাতে হবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন: গত ২০০৮-র নির্বাচন ওই হাতুড়েকরণ প্রবণতার এক বড় উদাহরণ। তৃণমূল স্তরে ক্ষমতা দখলের আশু স্বার্থই বহু জায়গায় বাম ঐক্যকে বিঘ্নিত করেছে। জমির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যে শ্রেণী ঐক্য সুসংহত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই শ্রেণী সংগ্রামকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত না করাতে বদ্ধ জলাশয়ে শেওলা জমার মত তাতে ক্রমশই ফাটল দেখা যায় এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে বামপন্থীরা এই ফাটলের সুযোগ নিচ্ছিল এবং ক্ষমতা দখলকেই একমাত্র আশু লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। শ্রেণী ঐক্য রক্ষার বদলে তার বিভাজনকে ক্ষমতায় থাকার জন্য ব্যবহার করা কোনওরকমভাবেই কোনও বামপন্থার অনুগমন বলা যায় না। মনে রাখা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৎসহ ভূমি সংস্কারের এই মডেল সারা ভারতবর্ষের আলোচনার এবং অনুসরণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। শুধু ভারতবর্ষেই কেন আন্তর্জাতিক স্তরেও এই ঘটনা এতটাই আলোচিত ছিল যে সুদূর ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আপামর গরিবের চোখের মণি স্বয়ং হিউগো সাভেজ পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বামবিরোধীরা ক্ষমতায় আসার পরেই বিশেষ নজর দিয়েছে এই বিকেন্দ্রীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে। সরকারী আমলা-দের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করা হয়েছে ধাপে ধাপে, যাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়। নির্মম দৈহিক অত্যাচার এমনকি খুন, জমির ফসল নষ্ট করা, জমি থেকে বলপূর্বক উৎখাত, তোলা-বাজী ইত্যাদি আজ গ্রাম বাংলার নিত্য সঙ্গী। কৃষিপন্যের দামের নিয়ন্ত্রণ আজকাল পুরোপুরি দালালদের কুক্ষিগত ফলে ঋণের দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা আজকাল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জমির শ্রেণী চরিত্র বদলের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কিছুদিন আগে লোকসভা উপ নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তি কে ভাল অংশের ভোট পায় যেটা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাসে অভূতপূর্ব! এবং সদ্য প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিধানসভার উপ নির্বাচনের ফলাফল এক বিশেষ দিক উন্মোচিত করেছে, সেটি হলো সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে শাসক দলের এক গোপন আঁতাত। এই বিপদ সম্পর্কে অবিলম্বে জনগণকে অবহিত করতে হবে এবং এর বীজ সমূলে উৎপাটিত না করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভুত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রতিরোধ হিসাবে একমাত্র আছে গরিবদের অর্জিত অধিকার রক্ষার শপথ। কিন্তু তৃণমূল স্তরে বাম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এই ঐক্যবদ্ধ শপথ সম্যক্ কার্যকারী হবে না। শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা এবং তার থেকে উদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা হাতুড়েকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে সঠিক বামপন্থী পরিবর্তন আনাই বামঅন্দরমহলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

(চ) জুলাই ২০১৩

গত মার্চে প্রকাশিত সংযুক্তি-৪ এ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মেরুকরণে বামপন্থীদের চারটি সুযোগের উল্লেখ ছিল এবং এই সুযোগগুলি কাজে লাগিয়ে সঠিক বামপন্থী ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ষের বামপন্থাকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবার ও স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ (শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে) বোধ হয় ছিল চতুর্থ-টি অর্থাৎ ''পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন''-টি এখনও শেষ হয়নি। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে সঠিক সময় থেকে বেশ পিছিয়ে অবশেষে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায়। ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এই পরিস্থিতিতে সংযুক্তি-৫ প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে আপাত স্থিতিশীলতার বাতাবরণ মনে হলেও অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য সাধারণ মানুষের জীবনে অস্থিরতা দ্রুত বাড়ছে। মানুষ ক্রমশই মরিয়া হয়ে উঠছেন মুক্তির জন্য। অথচ, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাঁরা এতই ব্যস্ত যে মুক্তির অন্বেষণে তাঁদের প্রয়াসের দৈনন্দিন বহিঃপ্রকাশ অনেক সময়েই সঠিক ভাবে মূর্ত হয়ে উঠছে না। অধুনা বহু প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমগুলিতে সমাজের উপর তলার মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকার সুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই 'তুচ্ছ বিষয়' হয়েই থেকে যাচ্ছে।

২০-২১ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট, ত্রিপুরার সপ্তম বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা (৫০%র বেশী ভোটে), সর্বভারতীয় জাঠার সাফল্য সাধারন মানুষের মধ্যে বামপন্থার মর্যাদা বা শ্রদ্ধা অনেকটাই বাড়িয়েছে। মনে রাখতে হবে এর প্রেক্ষাপট অনেক কঠিন এবং জটিল ছিল। বিশ্বায়নের প্রভাবে ৯৩ শতাংশ শ্রমিক অ-সংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত আছেন তাঁদের যুক্ত করে এই ধরনের

সর্বভারতীয় ধর্মঘটের আকার দেওয়া এক কথায় অভূতপূর্ব। প্রায় প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এই প্রয়াসে। বামপন্থীদের সর্ববৃহৎ দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরাচারী শক্তিরই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে ধর্মঘট বহুলাংশে সফল করা গেছে। নেত্রী-র অ-গণতান্ত্রিক সরকারী নির্দেশের (নাকি হুমকির?) ফলে সরকারী কর্মচারীরা উপস্থিত হতে বাধ্য হলেও রাজ্যের রাজধানীতে (দেশের অন্যান্য শহরের মতই) কোনও ব্যাঙ্ক বা বীমা দপ্তর খোলা সম্ভব হয় নি। ধর্মঘটী কর্মীরা (মহিলা সহ) দু দিন পিকেটিং করেছেন নিজ নিজ দপ্তরের সামনে সব রকম ভয় ভীতি উপেক্ষা করেই। রেল বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত পরিবহন প্রায় বন্ধই ছিল, রেল পরিষেবাও বহু জায়গায় বিঘ্নিত হয়েছে স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধে। ধর্মঘটের অন্যতম মূল দাবী (ন্যূনতম মাসিক বেতন ১০০০০ টাকা) পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থনৈতিক দাবী হলেও শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ আন্দোলনের এই সাফল্য এবং ব্যাপ্তি যে অন্যতম সর্ববৃহৎ, সেটা বিশ্বায়নের যুগে একটি বড় পদক্ষেপ বলে দেশে বিদেশে অনেকেই মনে করছেন। এই ধর্মঘটের ব্যাপ্তি যে দেশের কিছু অংশেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং দেশের প্রায় সমস্ত জায়গাতেই এর প্রভাব ছিল এই কথা সমস্ত সংবাদ মাধ্যম এবং সমস্ত মতের মানুষই স্বীকার করেছেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততা! বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শ্রমিকের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক উন্নত পর্যায় বলেই মনে করা উচিত।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বামপন্থীদের নির্বাচনী পরাজয়ের পর বামবিরোধীরা ত্রিপুরার বামপন্থী গভীরতাকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন নি মনে করেছিলেন প্রায় বিনা প্রতিরোধেই বামেরা ধরাশায়ী হবেন। কেরলে মাত্র ২০০০ ভোট কম পাওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ৪১ শতাংশ ভোট পাওয়া এই তথ্যগুলি বামবিরোধীরা কোনও সূচক বলে গণ্য করেন নি। নির্বাচনী পরাজয়ের পরের দিন থেকেই প্রতিরোধ গড়ার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় ফলে ত্রিপুরায় বামপন্থীরা কেবল নির্বাচনেই বিজয়ী হননি, রাজ্যের উন্নয়ন এবং বিচ্ছিন্নতা-বাদের বিরুদ্ধে এক দুর্নীতি মুক্ত, বিচক্ষণ বামপন্থার বিপুল জয় হয়েছে। সর্বভারতীয় জাঠা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাম-পন্থা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়িয়েছে। বিশেষতঃ একটি দক্ষিণের রাজ্যে এই প্রথম বামপন্থীরা নির্বাচনে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বেশ কিছু নির্বাচনী জনসভায় জনগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়, ফলে দুটি আসনে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-কর্মী ২১ বছরের সুদীপ্ত গুপ্তের পুলিশী হেপাজতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র বিক্ষোভ, 'কামদুনি কাণ্ডের' বিরুদ্ধে ছাত্রদের সই সংগ্রহ অভিযানে বহু বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান লক্ষ্য করা গেছে। ''ভাল ছাত্রেরা রাজনীতি করে না'' এরকম প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার যোগ্য জবাব দিচ্ছেন বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার পীঠস্থান হিসেবে পরিগনিত Indian Institute of Science সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা!

এই সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রক্রিয়ায় কিন্তু বামপন্থীরা নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা বারবার প্রকাশিত হচ্ছে। বিকল্পের যে সম্ভাবনার জন্য সারা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন সেখানে বামপন্থীরা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নেতৃত্ব করার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গত কয়েকটি ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ হবে, প্রথমত ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ কিভাবে অগ্রসর হয়েছে সেই প্রসঙ্গে ''ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল'' এই অংশে মার্ক্সের একটি মন্তব্যকে উদ্ধৃত করতে চাই। ...এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের উপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্য পুঁজির কেন্দ্রীভবন অপরিহার্য। ... একদিকে মানব জাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়, অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্য রূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর ...''। এখানে মার্ক্সের উপলব্ধি ছিল ''... বুর্জোয়া যুগের ফলাফল বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব আত্মস্থ করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই ...'' অর্থাৎ এক উন্নত সমাজের দিকে বিবর্তন ঘটবে। কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়! একটি পিছিয়ে পড়া দেশে শুরু হয় এক অনগ্রসর পুঁজিবাদ থেকে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা। এর পরবর্তী সময়ে একটি তাত্ত্বিক বির্তকের সূচনা হয় মূলত এই নিয়ে যে রাশিয়ার ভিলেজ কমিউনের উপর ভিত্তি করে সরাসরি (পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে না গিয়েও) সমাজতন্ত্র (''এক মহান সামাজিক বিপ্লব'') প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা। মার্ক্স তাঁর একটি চিঠিতে (in reply to Vera Zasulitch, first draft) যদিও এই উত্তরণ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু ভিলেজ কমিউনের সম্পত্তি-র বন্টনের বিষয়ে কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যেটা লেনিন

তাঁর অনবদ্য লেখা ''দি ডেভেলপমেন্ট অফ কাপিট্যালিসম ইন রাশিয়া'' লেখাতে ব্যাখা করেছিলেন। এখানে লেনিন মূলত ''পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়'' এই তত্ত্বের খন্ডন করেন। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে লেনিন মহান হিসাবে পরিগনিত হন এই কারণেই, এবং মার্ক্স এন্জেলসের পরেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। আসলে পুঁজিবাদ সামন্ত-তন্ত্রকে ধ্বংস করে এবং এই ধ্বংস করার মূলনীতি দুটি, প্রথমটি হচ্ছে কৃষি-শোষণ ব্যবস্থা-র ধ্বংস করে কৃষি ব্যবস্থাকে এক উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করে যাতে কৃষি জমির মালিকরা এই পরিবর্তন মেনে নেয় কারণ এতে ওই ভূস্বামীরা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেন, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুঁজি হিসাবে পরিনত করে অর্থাৎ জমিতে পুঁজির আধিপত্য বিস্তার করে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে এই পুঁজির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের আমরা উন্নত দেশ হিসাবেই চিহ্নিত করে থাকি। আর যে সমস্ত দেশে পুঁজির অধিকার সমাজের সমস্ত উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি (কারণ তখন পুঁজিবাদ অস্তগামী) তাদের আমরা উন্নয়নশীল দেশ বলে থাকি। এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বিশেষভাবে অনগ্রসর পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্র হাতে হাত মিলিয়ে সমাজ বির্বতনের ধারাকে থমকে দেবার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষ এরকম একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবেই পরিগনিত হয়, এবং সেই কারনেই বলা হয় প্রথমে জমি এবং জমির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ে এসে সেই উৎপাদনের উপকরণ গুলির উপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করার নামই বিপ্লব। খুব সংক্ষেপে আমরা দুটি বিষয় তুলে ধরতে চাই প্রথমটি হলো কোনও দেশে যদি পুঁজিবাদী বিপ্লব সম্পন্ন হবার আগেই অনুন্নত শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে সামাজিক বিপ্লব ঘটালে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য গড়ে তোলা কি জরুরী? দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে কোথাও কৃত্রিম ভাবে কোথাও বা খানিকটা স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু সম্পত্তি বন্টন এবং তা থেকে উদ্ভূত উৎপাদনের অধিকার এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সরাসরি সমাজতন্ত্র গড়া সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক সমাধানের খোঁজেই প্রকৃত বামপন্থীরা আছেন এবং থাকবেন।

বিশ্বায়নের নামে এক মেরুর বিশ্ব গঠনের যে অভিমুখ অধুনা ''লগ্নীপুঁজি''-র যে গা-জোয়ারী চলছে তার বিকল্প যদি ভারতবর্ষের বামপন্থীরা না দেখাতে পারেন তবে বিশ্বব্যাপী মেরু করণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এই জন্য ভারতবর্ষের তিনটি অঙ্গরাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা (বিশেষতঃ ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে, গণতন্ত্রের বিকাশ, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রুচিশীল শিল্প-সংস্কৃতি, অন্ত্যজ ও উপজাতি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ মূলক শিল্প-নীতি, দুর্নীতি-মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন প্রভৃতি যা আপামর জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে এই সমস্ত) কাজে লাগিয়ে সমস্ত রকম বিচ্যুতি-র বাধা পেরিয়ে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষার কাজ করতে হবে।

লগ্নীপুঁজির অঙ্গুলি হেলনে আজ পশ্চিমবঙ্গে অর্জিত অধিকার বিপন্ন। বর্গাদার উচ্ছেদ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের অধিকার খর্ব, উন্নয়নের অধিকার হরণ, নারী নিগ্রহ ইত্যাদি আজকাল ''তুচ্ছ ঘটনা'' বলে বোঝানো হচ্ছে। বামপন্থীদের কাছে মস্ত সুযোগ এসেছে অতীতের 'ভুল' কে কেবল বক্তৃতা করে 'ভুল' বলে আখ্যা না দিয়ে তাকে শোধরানো। এবং জনগণ যাতে বুঝতে পারে যে সত্যই শোধরানো হচ্ছে সেই মত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই দেখা দেবে নতুন পথের নিশানা। আরও বড় কথা ভদ্রলোকের পার্টি নয় সর্বহারা-র পার্টিই শেষ কথা বলবে।

(ছ) সেপ্টেম্বর ২০১৩

'মানব সমাজে যত দিন কোনওরকম শৃঙ্খল মুক্তির প্রশ্ন থাকবে তত দিন সেই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হবে সমাজতন্ত্র'

এই দিয়েই শুরু হোক এবারকার সংযুক্তি। শাসক শ্রেণীর রঙবেরঙের জোড়াতালির গণতন্ত্র, ধ্বজাধারী সুশীলদের মেকি গণতন্ত্র, জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা সামন্ততন্ত্র, তথাকথিত মুক্ত-বিশ্ব-মুক্ত গণতন্ত্রের নামে বেনিয়া করপোরেট পুঁজিতন্ত্র এবং বেশুমার লগ্নীপুঁজি-র এই সমাজে বাঁচতে হলে লড়াই করে বাঁচতে হবে। এখানে বিকশিত হতে হলে, পাহাড় প্রমাণ বাধা বিপত্তি পেরিয়ে বামপন্থীদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে সেই উঁচু করতে চাওয়া মাথায় নানা জটিল হিসেব ধারণ করতে হয়। আমরা এমনই এক জটিল সমাজে বসবাস করি, যেখানে প্রতিনিয়ত শ্রেণী-সংগ্রামের আগুনে পুড়ে পুড়েই একমাত্র বামপন্থীরা নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষের বামপন্থার ইতিহাস বহু প্রাচীন। চার্বাক-দর্শন থেকে শুরু করে অধুনা গণতান্ত্রিক অবস্থা পর্যন্ত। সেই সব ইতিহাস, ঐতিহ্য মাথায় রেখেই বামপন্থীদের কাজ করতে হবে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশের ২৫ বছর পর কার্ল মার্কস ১৮৭২ সালে প্রকাশিত সংস্করণের মুখবন্ধে বলেছেন:

"... The practical application of the principles will depend, as the Manifesto states, everywhere and at all times, on the historical conditions...for that reason, no special stress is laid on the revolutionary measures proposed

at the end of section two. That passage would, in many respects, be very differently worded today. In view of the gigantic strides of Modern Industry in the last twenty five years, and of the accompanying improved and extended party organisation of the working class, in view of the practical experience gained, first in the February Revolution, and then, still more, in the Paris Commune, where the proletatiat for the first time held political power for two whole months, this programme has in some details become antiquated. One thing especially was proved by the Commune, viz. that 'the working class cannot simply lay hold of the ready-made State machinery, and wield it for its own purposes...".

আমরা জানি কাজটি মোটেই সহজ সরল নয়। এর প্রতিটি বাঁকেই ওৎ পেতে আছে হাজারো সমস্যা, প্রশ্ন এবং বিভেদ-বাধার দেয়াল। এবং আমরা এও জানি ওই দুর্গম বিভেদের পাহাড় টপকানোর যে ব্রত আমাদের, তার প্রেরণা সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির আলোক বর্তিকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এটাই আমাদের পাথেয়। ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে এমন একমাত্র শ্রেণী যে তার মুক্তি সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির ভিত্তিতেই শুধু সম্ভব এবং তার সামাজিক আধিপত্য কখনোই কোন নতুন শোষণ ব্যবস্থার জন্ম তো দেয়ই না বরং সমস্ত রকম শোষণের অবসান ঘটায়। আর তাই কোনওরকম অন্ধ বিশ্বাস বা বিভ্রান্তি ছাড়াই বস্তুগত ও বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে সামাজিক বাস্তবকে অনুধাবন করতে একমাত্র মার্কসবাদ-ই সক্ষম। তাই মার্ক্সবাদ। শুধু জ্ঞানের খ্যতিরে নয়, জানের দায়েও।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যখনই বাস্তব অনুশীলন গুরুতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে তখনই তত্ত্ব চর্চা গভীরতর করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে মৌল তত্ত্বের পুনর্বিকাশ ঘটানো হয়েছে। দেখা গেছে নব-গঠিত সেই তত্ত্বের আলোকে সমস্যার সমাধানও হয়েছে। একটি নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য মার্কসীয় তত্ত্বকে সময়োপযোগী করতে না পারলে শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাহত হয় এবং পুঁজিবাদ মতাদর্শগত ও দার্শনিক আধিপত্য করতে শুরু করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আজকের দিনে সমাজতন্ত্রের অনুশীলনে যে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় চলছে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে এর তুলনা গত দেড়শ বছরের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে তত্ত্বের নিবিড় চর্চা কি অসামান্য গুরুত্ব নিয়ে আজ উপস্থিত হয়েছে। এই কাজে আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর জন্য এই প্রয়াস। ফলিত সমাজতন্ত্রের এই সমূহ সঙ্কটের সময়ে মার্কসবাদ তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে।

প্রথমতঃ আক্রান্ত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া তাত্ত্বিক-দের দ্বারা। প্রায় প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদের আবির্ভাব এবং প্রতিটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্ষয় এদের মধ্যে চরম আহ্লাদ সৃষ্টি করেছে। মার্কসবাদ যে আজকের যুগে অচল হয়ে গেছে সেটি চিৎকার করে ঘোষণা করার এমন চমৎকার বাস্তব পরিস্থিতি এর আগে কখনও আসে নি। এ পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এরা হিংস্র ভাবে মার্কসীয় তত্ত্বকে আক্রমণ করেছে। 'উত্তর-আধুনিকতা' তাদের মার্কসবাদ বিরোধী অস্ত্র ভান্ডারে নতুন সংযোজন। স্বাভাবিক ভাবেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের এই অভিযানকে প্রতিহত করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অর্ন্তনিহিত শক্তি ও সারবত্তা এবং তার বিজয়ের অনিবার্যতাকে তুলে ধরা আজকের দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত মার্কসবাদী শিবিরের মধ্যেই একটি দক্ষিণ পন্থী আক্রমণ চলছে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও কারিগরির অসামান্য অগ্রগতির হাত ধরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আপাতঃশক্তি সঞ্চয় বিহ্বল করে দিয়েছে 'মার্কসবাদী'দের এক বড় অংশকে। তাত্ত্বিক ভাবে এরা মার্কসবাদকে নাকচ করছেন না। কিন্তু মনের অনেক গভীরে বিশ্বাস টলে গেছে। সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, আর এই সন্দিগ্ধ মন নিয়ে তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না শ্রেণী সংগ্রামের ঝঞ্ঝাবাত্যায় বুক পেতে দেওয়া। এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্বকে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারা নতুন মোড়কে এক অতি পুরানো তত্ত্ব আমদানি করছে যার সার কথা হলো শ্রেণী সংগ্রাম এখন গৌণ স্থানে চলে গিয়েছে। মার্ক্সবাদীদের অপেক্ষা করতে হবে যতোদিন না উৎপাদন-শক্তির অবাধ বিকাশ পুঁজিবাদের মধ্যে নতুন ভাবে একটি আভ্যন্তরীণ সঙ্কট সৃষ্টি করে।

বামপন্থীরা এই বিপজ্জনক মতবাদের বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি নিয়ে লড়াই করবে। যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও পশ্চাৎপদ দেশের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, ও একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধন বৈষম্য তীব্র ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে শ্রেণী সংগ্রামের বস্তুগত ভিত্তি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। নব্বই-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে পশ্চিমী দুনিয়া সহ সমগ্র পৃথিবী জুড়েই যে শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন জোয়ার আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা আগামী দিনের গভীরতর ও প্রশস্ততর শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা। একথা ঠিক, বিষয়ীগত কারণে এবং যা ভাবা হত পুঁজিবাদের টিকে থাকার

ক্ষমতা তার চেয়ে বেশী হওয়ার কারনে, শ্রেণী সংগ্রাম আপেক্ষিক ভাবে দুর্বল অবস্থাতে রয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই আমরা মনে করি প্রত্যক্ষ শ্রেণী সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত করতে গেলে বামপন্থীদের যে নির্ধারক ভূমিকা আজ প্রয়োজন তাকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে তত্ত্বের কাজ পরিনত হবে আত্মতুষ্টিতে ভরপুর নেহাত বুদ্ধিজীবী-সুলভ চর্চায়। মার্ক্স ও এঙ্গেলেস তাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে শ্রেণীসংগ্রামের নানান উত্থানপতনের মধ্যেও এটিকে সমস্ত তত্ত্ব ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে যেতে হয়। আশা করি বামপন্থীরা যত্নবান হবেন শ্রেণীসংগ্রামের এই প্রাধান্যকারী ভূমিকাটি-কে সতত উর্ধ্বে তুলে ধরতে।

তৃতীয় আক্রমণটি আসছে একটি ''বাম'' সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন সমস্ত বিশ্বে সমাজতন্ত্রের যে বিপর্যয় চলছে তা মার্কসবাদের কোন সঙ্কট সূচনা করে না, সূচনা করে মাক্সবাদীদের সঙ্কটকে। এ চিন্তা দাঁড়িয়ে আছে এক ভ্রান্ত যুক্তির (fallacy) উপরে। এ যুক্তি আমাদের মার্কসবাদ বিরোধী অবস্থানে ঠেলে দিতে বাধ্য। প্রথম কথা হচ্ছে মার্ক্সবাদীদের সঙ্কট আর মার্কসবাদের সঙ্কটকে কোন ভাবেই বিভাজিত করা সম্ভব নয়, কারণ মার্ক্সবাদীদের চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ বিকশিত হয়; আর মার্ক্সবাদীদের চিন্তন-প্রক্রিয়ায় যদি সঙ্কট উপস্থিত হয় তবে তা অনিবার্য ভাবে মার্কসবাদের বিকাশের রুদ্ধতার মধ্যেই প্রতিফলিত হবে। আর সেটাই মার্কসবাদের সঙ্কট। দ্বিতীয়তঃ 'মার্কসবাদ' এমন এক দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞান যার মর্মকথাই হচ্ছে এর 'বিকাশমানতা'। শ্রেণীসংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতি, নির্দিষ্ট একটি সমাজে ও তারই সঙ্গে গোটা বিশ্বে ক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তনগুলি যে নতুন সব সমস্যা উত্থাপিত করে সেগুলির সৃজনশীল সমাধানসূত্র হাজির করাই তো মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রাণ! তুলনামূলক ভাবে একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে যদি এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজটি করতে মার্ক্সবাদীরা ব্যর্থ হয়, তবে তা অবশ্যই মার্কসীয় তত্বের বিকাশের রুদ্ধতাকেই প্রমাণিত করে। যে বিকাশমানতা এই তত্ত্বের সার কথা তার রুদ্ধতা যদি তত্ত্বের সঙ্কট না হয় তবে তত্ত্বের সঙ্কট আর কীভাবে হতে পারে? এই সত্যটি বুঝতে না পারার অর্থ হচ্ছে মার্কসবাদকে একটি অনড় অটল আপ্ত বাক্যে (dogma) পর্যবসিত করা, এবং গতিময়তাই যে এই তত্ত্বের নির্যাস তা উপলব্ধি না করা। এই প্রবণতাটি ভীষণ ভাবে বিপজ্জনক এই কারণে যে এটি অনেক বেশি প্রতারণা পূর্ণ। মার্কসবাদের জয় গান গাইতে গাইতেই মার্কসবাদের অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করে এই মতবাদ। এই গোঁড়ামিবাদের (doctrinarism) বিরুদ্ধতা করাটাই বামপন্থীদের অন্যতম কর্তব্য। আমরা মনে করি বিগত কয়েক দশক ধরেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যে বিপর্যয় চলছে তা স্পষ্টই নির্দেশ করছে যে এতকাল পর্যন্ত যে অনুশীলন হয়েছে তাতে বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্য, এবং তৎসম্পর্কিত অনেকগুলি সমস্যা সমাধান করা যায়নি! আজ যারাই আন্তরিক ভাবে সমাজতন্ত্রের পতাকাকে বয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁদেরই প্রধান কাজ হবে সেই সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা, তার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এবং সৃজনশীলভাবে তার প্রয়োগে নামা। এ কাজের কোন বিকল্প নেই। একাজ না করে শ্রেণীসংগ্রামের কোন যোগ্য ভূমিকা পালন করা যাবেনা, অগ্রণী চিন্তাকে সংহত করা যাবে না, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনগণ থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট কর্মিবাহিনীর মধ্যেও যে হতাশার পরিবেশ তৈরী হয়েছে তাকেও দূর করা যাবে না। সংকীর্ণতাবাদীরা মনে করেন মার্কসীয় তত্ত্বের কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে বলা মানে হচ্ছে এক ভাবে মার্কসবাদকে নাকচ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ। যে বাবে আজ মার্কসবাদের মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে তাতে এ ভয়ের একটা বাস্তব ভিত্তিও আছে। কিন্তু বিপদ হলো এ আশঙ্কা কাটাবার জন্য তাঁরা যে অন্ধপূজার পথ ধরেছেন তা মার্কসবাদী তত্ত্বের উপর বিপরীত দিক থেকে আর এক সর্বনাশা আঘাত। এটা বোঝা আজ অত্যত জরুরী হয়ে উঠেছে যে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্কটকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে মার্ক্সবাদকে অস্বীকার করা বা ছোট করা তো নয়ই, বরঞ্চ মার্ক্সবাদকে রক্ষা করার সব চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ।

এ কাজ তখনই সম্ভব যখন মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে তাকে অতিক্রম করার এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত না হওয়া যায়। এ সংগ্রাম চালাতে গেলে তে দিনের অনুশীলনকে, তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই, সন্ধানী আলো ফেলে আবার দেখতে হবে, দুর্বল ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে, মীমাংসার সূত্র বার করতে হবে। সার্বিক সঙ্কটের সময় তত্ত্বের কাজ বেশি গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। তার সাথে প্রচেষ্টা থাকতে হবে ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল, ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি, দেশের ও বিদেশের নানা ধরনের আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণ করতে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই যে অভিশাপের মত দক্ষিণ ও বাম-বিচ্যুতি প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে একে আক্রান্ত করে রেখেছে তার মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক উৎসগুলিকে খুঁজে বার করতে। চেষ্টা করবে 'গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতা'র ধারণাটি নিয়ে

নতুন ভাবে চর্চা করতে, কারণ আমরা মনে করি এই ধারণাটি-র অপ-প্রয়োগের ফলে বারে বারে চিন্তার স্বাস্থ্যকর সংঘর্ষ ব্যাহত হয়েছে। তার ফলে যে মননের প্রক্রিয়ায় 'সত্য' উদঘাটিত হয় তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই আজ যখন সঙ্কট মোচনের জন্য সর্বাত্মক তাত্ত্বিক সংগ্রাম প্রয়োজন তখন তাকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাটা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সে কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা-র ধারণাকে কীভাবে সব চেয়ে কার্যকরী ভাবে আজ প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে ভাবনা জরুরী হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই পর্বে বিপ্লবকামীদের মধ্যে যে নতুন নতুন চিন্তার উৎসারণ ঘটেছে, এবং নতুন পথ সন্ধানের যে আর্তি জেগেছে, এটি অবশ্যই শুভ লক্ষণ। শুধু চিন্তা চর্চা বা তত্ত্ব বিশ্লেষণই নয়, বিপ্লবের বাস্তব পথের উন্মোচনও পৃথিবীর এখানে-ওখানে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা বা নিকারাগুয়ার মতো দেশে জনগণ তো ব্যালটের মাধ্যমেই তাদের বিপ্লবী অভীপ্সার কথা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে এবং একমেরু বিশ্বের মোড়ল মার্কিন সম্রাজ্যবাদের মুখের উপর চপেটাঘাতই করে বসেছে বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরেও বিশ্বায়ন-বিরোধী জনগণের প্রচার-হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। এসব দেখে শুনে আমাদের দেশের বিপ্লবকামীদের মধ্যেও নতুন উৎসাহ ও আশাবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। তবে, ভুললে চলবে না যে, উৎসাহ ও আশাবাদের আগুনে অনবরত উপযুক্ত ইন্ধনের জোগান দিতে না পারলে সে আগুন কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছড়ায় এবং তারপরই নিভে যায়। তাই আজকের দিনে আমাদের ভাবনা-বৃত্তে যে-আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েছে তাকে জ্বালিয়ে রাখতে হলেও অবশ্যই উপযুক্ত ইন্ধনের সন্ধান করতে হবে। সে-ইন্ধন পাওয়া যাবে আমাদেরই দেশে ও দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভেতর মহলে। আমাদের পূর্বসূরি ও বিপ্লবকামীরা তাঁদের প্রয়াসে যে কেবল বিফলতাই অর্জন করেন নি, অনেক সাফল্যের সঞ্চয়ও যে তাঁরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সে কথা ভুলে যাওয়া হবে একান্তই আত্মঘাতী। আগেই বলেছি, বিগত শতকের চল্লিশের দশকের শেষে ও পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, এখানকার বামপন্থীরা অতি-বাম ভাবনা আক্রান্ত হয়ে ঐতিহ্য-বিরোধী কালাপাহাড়ি কর্মকান্ডে লিপ্ত হলেও, অচিরেই তা থেকে তাঁরা নিবৃত্তও হয়ে ছিলেন। নির্বিচার ঐতিহ্য-হননের বদলে সু বিচার ঐতিহ্যনুরাগকে যে তাঁরা ধারণ করতে পেরেছিলেন, সে ইতিহাস ভুলে গেলে তো চলবে না। হ্যাঁ, ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেও সেই সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁরা যে দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উদ্ধার ও গ্রহণীয় ঐতিহ্যকে সর্বজনগ্রাহ্যরূপে উপস্থাপন করতে পারেন নি, সে-কথাও মিথ্যা নয়। তাঁদের সেই অপূর্ণতা ও বিফলতাগুলোকে দূর করার দায়িত্বই বর্তেছে উত্তর-সূরিদের ওপর। সে দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্ব-সূরিদের সঠিক সিদ্ধান্ত ও সফলতাগুলোকে অবশ্যই অঙ্গীকার করে নিতে হবে। উনিশ শতকে রামমোহন বা রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ এবং বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী বা এ রকম মনীষীবৃন্দ সমাজ প্রগতিতে কী অবদান রেখেছেন, অথবা আদৌ কোনো সদর্থক অবদান রেখেছেন কিনা, এ-বিষয়ে এ-কালের বামপন্থীদের চিন্তা খুব একটা স্বচ্ছ নয়।

''দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চ কণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।'' —রবীন্দ্র রচনাবলী-অবতরণিকা পৃ ১.

আমরা এর আগের সংযুক্তি (সংযুক্তি-৫) ভারতবর্ষের সামন্ত-পুঁজিবাদী অবস্থার অবতারনা করেছি এবং এই ধরনের সমাজে পুরাতন ব্যবস্থা (অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র) এবং পুঁজিবাদ এই দুইয়ের সহ অবস্থানের ফলে একদিকে যেমন ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক পণ্য বিপনি-র এবং সু উচ্চ সুর্দশন আধুনিক অট্টালিকার পাশাপাশি দেখা যায় স্বজাতিতে বিবাহ না করার ফলে দম্পতির প্রাণ হরণের ঘটনাও। অর্থাৎ এক অদ্ভুত খিঁচুড়ি। ৬১ পাতায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের অপ্রসরের বিষদ ব্যাখ্যার সঙ্গে আছে বিশ্বায়নের প্রভাব।

ধ্রুপদী মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় শিল্প পুঁজিবাদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী পর্বকে 'আদি সঞ্চয়নের পর্ব (Primitive Accumulation of Capital) বলে বর্ণনা করা হয়। 'এই পর্বে জমির পণ্যায়ন ও জমি ব্যক্তি মালিকানাধীনে চলে যাওয়া এবং জমি থেকে কৃষকের বলপূর্বক উচ্ছেদ; বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির অধিকারের (সাধারণ, যৌথ, রাষ্ট্রাধীন ইত্যাদি) ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরণ; সাধারণ অধিকারের অবদমন; শ্রম শক্তির পণ্যায়ন এবং বিকল্প (দেশীয়/সামূহিক) উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রী ভোগের উপর অবদমন; প্রাকৃতিক সম্পদ সহ অন্যান্য সম্পদের ঔপনিবেশিক, নয়া-ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী আত্মসাঁৎ এর ঘটনা; অর্থকে বিনিময় ও করের মাধ্যমে করে তোলা (বিশেষ করে

জমির ক্ষেত্রে)—এই পরিঘটনাগুলি ঘটে চলে। দাস ব্যবসা, মহাজনি, জাতীয় ঋণ ব্যবস্থা হল আদি সঞ্চয়ের (radical) উপায় সমূহ'। এবং ''রাষ্ট্র তার হিংসার একচেটিয়া অধিকার আর আইনের নানারকম সংজ্ঞা দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে মদত দেওয়া ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে", (পুঁজি, কার্ল মার্কস)। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ৯০ দশকে পরিবর্তিত হয় মার্কিন শাসিত নয়া অর্থনীতি। এই অর্থনীতি বাজারের উদারীকরণ, সম্পদের বেসরকারীকরণ ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নকে দুর্বল দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেয়। এই উদারীকরণ নীতি এমন কোনও সম্মানপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি যেখানে সকলেই সুখে থাকতে পারে। পরিবর্তে এই নীতি সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে আগের থেকেও অনেক বেশি অসাম্যের জন্ম দিয়েছে। আদতে এই নয়া উদারনৈতিক মতবাদ হলো পুঁজিবাদের আদি সঞ্চয়নের পর্বে ফিরে যাওয়া। এর মূল কথা হল ''—অধিকারচ্যুতি-র মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয় করা। দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অধিকারচ্যুতি ঘটানো হয়েছে। এক, সাধারণ সম্পদের বেসরকারীকরণ (বিদ্যুৎ, জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শক্তি ইত্যাদি)। দুই, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (structural adjustment) নীতির মাধ্যমে IMF, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দ্বারা বাস্তবত বিশ্বের গরিব দেশগুলির পুনঃঔপনিবেশিকরন। বর্তমানের শিল্পীয় পুঁজির ক্রমবর্ধমান ফাটকা পুঁজিতে রূপান্তরেই এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়া আগের সবগুলি রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের পরিবেশগত সাধারণ সম্পত্তি (জমি, বাতাস, জল) দ্রুত নিঃশেষিত করে ফেলা, স্বাভাবিক বাসস্থানের দ্রুত অবনমন ইত্যাদি, কৃষি উৎপাদন পুঁজিনিবিড় পদ্ধতিকে বাতিল করে এবং প্রকৃতির পাইকারী পণ্যায়ন ঘটে সবরকমভাবে। সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মেধাগত সৃজনশীলতার পণ্যায়নের বাঁধনে ঘটে চলে সার্বিক অধিকারচ্যুতি-র ঘটনা"। (নয়া সাম্রাজ্যবাদ। ডেভিড হারভে)।

The irony in India is that unlike Russia and China where the vanguard role was played by leaders who had succeeded in uniting the oppressed masses, the Indian vanguard parties are themselves fragmented into various communist parties. These divided communists cannot lead a united front of the oppressed. The upshot of the above description is that a necessity for forming a united front of the oppressed has to be felt by fragmented communists because it is only then that they can challenge the class power of the exploiters. People blames the rulers for following the policy of scocial "divide to rule",while the issue is that fragmented communists cannot organise a revolution of any kind. This is the crux of the issue.

এটা যেমন একদিকে সত্য, তেমনই সত্য হচ্ছে এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্তির আপ্রাণ প্রচেষ্টা। অধুনা অনেক ঘটনা যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জন বিক্ষোভ থেকে, দিল্লীর ধর্ষণ থেকে সুদীপ্ত গুপ্তের হত্যা, বামেদের জাঠায় অভূতপূর্ব সাড়া, ভারত জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ (যা দুই দিন ব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে শাসককে তাঁদের দাবী মানতে বাধ্য করায়), কামদুনি-র মানুষের লড়াই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে সঠিক নেতৃত্ব থাকলেই তাঁরা সাড়া দেন।

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর দেখা গেছে যে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কেবলমাত্র নিরঙ্কুশ একাধিপত্যই (যে কাজ কেসময় বাম তথা সি.পি.এমের লোকেরাও করেছিলেন) কায়েম করে ক্ষান্ত থাকছেন না, নিপীড়িত কৃষক শ্রেণী এবং জমির উপরেও তাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। আমরা শুনেছি বেশ কিছু জায়গায় তারা প্রকাশ্যে প্রচার করছেন ''বাম ফ্রন্টের আমলে যে ভূমি বন্টন ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা গ্রাম বাংলাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাঁদের প্রথম চেষ্টা হবে ঐ গুরুতর অন্যায় কে ন্যায়-তে পরিনত করা, এবং সেটা একমাত্র সম্ভব যদি জমির আসল মালিককে জমি ফিরিয়ে দেওয়া।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের ধারনা বেশ ব্যাপক আকারেই বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারনা। যার ফলে তাঁরা গ্রামীন মধ্য ও উচ্চবিত্তেরই মানসিক ভাবনা-র দাসত্ব করতেন। ফলে গরিবদের শ্রেণী সচেতন স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে তাঁরা গরিবদের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অধুনা এই গ্রামীণ মধ্য ও উচ্চবিত্ত-রাই তৃণমূলের পতাকার নীচে সমবেত হয়ে গরিবদের দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে কষ্টাজিত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন।

নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে লাগামহীন সন্ত্রাস থেকে শুরু করে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত তৃণমূল প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭০০০, প্রায় ১০০০০ কেন্দ্রে বিরোধীদের এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে বসতে দেওয়া হয়নি, এমনকি গণনার সময়ও ব্যালটের বাক্স নিয়ে কারচুপি ইত্যাদি সত্ত্বেও যেখানেই মানুষ নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন এবং যেখানেই বামপন্থীরা তাঁদের শ্রেণীসচেতনতা দিয়ে লড়াই করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানেই ফল দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেক্ষ্য যে বামপন্থীদের কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি.জে.পি সবার সাথেই লড়তে হয়েছে। বর্তমানে আশু এবং একান্ত জরুরী কর্তব্য হল সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই

ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করা। বিশেষতঃ যখন সাধারণ মানুষ সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-নায়ক ও বহুজাতিক বৃহৎ পুঁজিমালিকরা বর্তমান নিও-লিব্যারেল অর্থনীতির ও ব্যবস্থার সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছেন না। একদিকে বিকাশ বজায় রাখা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মোকাবিলা করা—এ দুয়ের নাগপাশ থেকে বেরোনোর কোনো প্রেসক্রিপশন এই নিও-লিব্যারেল অর্থনীতিতে নেই বরঞ্চ তাদের তথাকথিত বিশ্বায়নের বিপরীতে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মোর্চা গড়ে তুলছেন। ব্রাজিল-রাশিয়া-ভারত-চীন ইত্যাদি ব্রিক (BRIC) দেশগুলি সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হয়েছে। এধরনের বিভিন্ন মেরুকরণ আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রমাগত ক্ষমতার কেন্দ্রীয় বিন্যাসকে পরিবর্তিত করছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকছে। বিশ্ব তথা দেশের শ্রমিকরা কি এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে জেগে উঠবে না? উত্তর সম্ভবতঃ ইতিবাচক। নব জাগরণের এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নতুন বিকাশমুখী বামপন্থী চিন্তাধারার প্রবেশ জরুরি। নতুন বাস্তবতায় নতুন চিন্তা ও কাজ হতাশার বিপরীতে বাস্তবের আশার দিকটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে ও সমাজের অভ্যন্তরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে। কল্পনা ও বাস্তবের রসায়নের মধ্যেই আশা ও হতাশার দ্বন্দ্বের মীমাংসা লুকিয়ে আছে। অতএব মানুষের সংগ্রামকেও সমুদ্র উজিয়ে দ্রুততর এগিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রাম কতিপয় বহুজাতিক কোম্পানী কিংবা নিছক পুজির প্রতিভূ রাষ্ট্রের বিপক্ষে নয়, বরং পুঁজিবাদী জীবনদর্শন তথা ভোগবাদের আদত কাঠামোর বিরুদ্ধে। যেখানে স্লোগান-সর্বস্বতা কিংবা আদর্শশূন্য গলাবাজীর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট গন্তব্য, বিশ্বাস ও আদর্শিক অঙ্গীকারই হবে নিপীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার। মানবিক পৃথিবী নির্মানের সেই সংগ্রামই থামাতে পারে পুঁজিবাদের একচ্ছত্র হালুম হালুম।

একদিকে যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে নব-উদারবাদের বিরোধী আন্দোলন চলছে তখন দেশের সরকার আরো বেশি করে সংস্কারের পথে হাঁটছে। এই অবস্থায় বামপন্থীদের আশু কর্তব্য সারা ভারতব্যাপী এক সুবৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা যা আমাদের দেশে নব-উদারবাদকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সমস্ত ধারার আন্দোলনকে একটি খাতে মেলাতে হবে। ভারতের জনতা যদি সেই আন্দোলনে সামিল হন তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নব-উদারবাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় এসে দাড়াবেনই। আমরা যদি ভারতে বসে 'আরব বসন্ত' ও 'ওকুপাই ওয়াল স্ট্রীট' আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চাই তবে ভারতের বুকে বিশাল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আজকে ভারতের বামপন্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রধান কর্তব্য। এর জন্য চাই ব্যাপক একটি বাম ও গণতান্ত্রিক মঞ্চ যার সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে প্রকৃত বামপন্থীরা।

''...এটা অনস্বীকার্য যে বর্তমান সময়ে অনেক শক্তিই বামপন্থীদের এই 'গতানুগতিক অভ্যাসবাদ' (যাকে ইংরাজীতে **'empiricisation'** বলা হয়, বা আমাদের আরেকটি প্রতিবেদনে যাকে আমরা 'হাতুড়েকরন' আখ্যা দিয়েছি)-র দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এইসব ঝোঁককে বামপন্থীদের সজাগ ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। যদি সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বাস্তবায়িত করার প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে এই 'গতানুগতিক অভ্যাসবাদ'-কে কাটিয়ে তুলতেই হবে। বামপন্থীরা কেবল আজকের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করলে হবে না, বুনিয়াদী শ্রেণী সংগ্রামকে মাথায় রেখেই সর্বহারার শ্রেণী-স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা, ইত্যাদির জন্যও নিরলস আন্দোলন চালাতে হবে। এই সব সংগ্রাম বাম শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, এবং বাম সরকার রক্ষার অছিলায় এই আন্দোলনকে আপাতত স্থিতিশীল রাখার 'গতানুগতিক' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই বামেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাম সরকার গুলির পরিচালনার সাথে সাথেই পার্টিকে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতানুযায়ী নতুন উপায় উদ্ভাবন করে শ্রেণীস্বার্থরক্ষার আন্দোলনও পরিচালনা করতে হবে। এর কোনকিছুই সহজ নয়, কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা বামেদেরই করতে হবে। কেরলের এল.ডি.এফ-র অভিজ্ঞতা থেকে যা আমি বুঝেছি তার ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বামেদের তার সমাধান সম্ভব।

এমন একটি সময়ে যখন বহুসংখ্যক মানুষ সম্রাজ্যবাদের ধারণা পরিত্যাগ করেছে, যখন লগ্নীপুঁজির 'ভাড়াটে প্রচারক' থেকে শুরু করে অনেক পশ্চিমী মার্ক্সবাদী, চীনের 'সরকারী' মুখপাত্রেরা, এমনকি ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিকাশের উচ্চ হার দেখে চমকিত (যদিও তা দিয়ে কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সুপুষ্টি ঘটেছে), তখন একমাত্র সি. পি. আই. এম এই সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ প্রকল্পের ধারণার (যা লেনিন ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী উত্তর সূরীদের চিন্তাদ্ভূত) প্রতি দৃঢ় আস্থা বজায় রেখেছে। যতোদিন এই ধারণা ও প্রকল্প অকাট্য থাকবে তত দিন সি. পি. আই. এম-র প্রাসঙ্গিকতাও অক্ষুন্ন থাকবে। যদি কোনও ভাবে

পার্টিতে চলতে থাকা 'গতানুগতিক অভ্যাসবাদ' বা 'হাতুড়েকরণ'-এর প্রক্রিয়াকে পার্ট রোধ করতে না পারে এবং বুর্জোয়া তত্ত্বের আধিপত্যের কাছে আত্ম-নিঃশেষ করে তবে অপর কোনও কমিউনিস্ট সংগঠন (যে কিনা তত্ত্বগত দিক থেকে বর্তমানুরূপ অবস্থান গ্রহণ করে) এগিয়ে এসে তার জায়গা দখল করবে। কিন্তু সংস্কার পন্থী শক্তি সমূহের কোনও মোর্চা তা সে যতই ভালো তত্ত্ব বা জনগণের প্রতি নিষ্ঠান দেখাক না কেন, বুনিয়াদী শ্রেণী সমূহের স্বার্থ-রক্ষক হিসাবে কমিউনিস্ট দের জায়গা দখল করতে পারবে না। যদিও তাদের কিছু সাধারণ গণতান্ত্রিক ইস্যুগুলিতে একসঙ্গে কাজ করা যেতেই পারে"। (প্রভাত পট্টনায়ক—ই.পি.ডব্লু-১৬ জুলাই ২০১১)

(জ) ডিসেম্বর ২০১৩

পরিশেষ (আমাদের কাজ - সংযুক্তি-৭)

আমাদের কাজ (সংযুক্তি-৬) প্রকাশ হবার পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলাফলের প্রভাবে ষষ্ঠদশ লোকসভার মেরুকরণ নিয়ে দেশ ও বিদেশে আলোচনা বা চর্চা চূড়ান্ত পর্যায় পৌছচ্ছে। আমাদের স্পষ্ট মতামত এবার জানাচ্ছি।

● দিল্লী-মিজোরাম-ছত্তিশগড়-মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থান মোট পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে মিজোরাম বাদে বাকী রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। বিজেপি-র পালে হাওয়া জোরালো হয়েছে এবং বামপন্থীসহ তৃতীয় শক্তি আসনের নিরীখে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দিল্লী বাদে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS) এবং কর্পোরেট পরিচালিত সমস্ত সংবাদ মাধ্যম আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর জয় প্রায় ঘোষণা করে দিয়েছে। এর সঙ্গে বল্লভ ভাই পাটেলের উত্তরাধিকার, স্বচ্ছ ও শক্ত প্রশাসক, প্রভৃতি নানান চমক যেমন থাকছে তেমন নাইডু নামক কুমির ছানা দেখিয়ে নানান আঞ্চলিক দল বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মোদীর নতুন জোট সঙ্গী হিসেবে সম্ভাব্য যোগদানের প্রচারও রয়েছে। দেশের সমস্ত পুঁজিপতি বা কর্পোরেট হাউস (টাটা থেকে আম্বানী) এর কাছে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আস্থা চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। আন্তঃর্জাতিক লগ্নী পুঁজিও মোদীর নীতিতে বেশ স্বাচ্ছ্যন্দবোধ করে। মোদী কংগ্রেসকে সবমিলিয়ে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিচ্ছে। তাই মেরুকরণের একটা মেরু অবশ্যই মোদীকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS), ভারতবর্ষে সবচেয়ে বৃহৎ সাম্প্রদায়িক শক্তি। এটাই ১৩তম লোকসভায় অটলবিহারী বাজপায়ীর নেতৃত্বে NDA-র সঙ্গে বর্তমান মেরুর গুণগত তফাত।

● পশ্চিমবঙ্গে শেষ কয়েকটি পুরো ভোটের ফলাফলে প্রাথমিকভাবে ধারণা তৈরি হয়েছে বামপন্থীরা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে বিলীনের পথে এগোচ্ছে এবং তৃণমূল এককভাবে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে বামপন্থীসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি (যাঁরা প্রায় সবাই তৃণমূলের সঙ্গী ছিলেন ৩৪ বছরের বামজামানার অবসানে) কে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। পরিবর্তনের পরিবর্তন এর যে ইঙ্গিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন নির্বাচনে মনে হচ্ছিল তা বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক ছিল। অথচ এই সময়ে মহিলাদের সম্মানহানি, মূল্যবৃদ্ধি থেকে সারদাকান্ডে মানুষের ক্ষোভ বাড়বার কথা। প্রশ্ন উঠতে লাগল দোদুল্যমান বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে। কংগ্রেস থেকে ব্যাপক হারে তৃণমূলে যোগদানের সাথে নির্বাচিত বামপন্থী পঞ্চায়েত ও পৌরসভা সদস্যদের মধ্য থেকেও তৃণমূলে যোগদান ঘটতে শুরু করেছে। এমনকি বিধানসভায় নির্বাচিত একজন বামফ্রন্টের MLA ও আছেন। আরও ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সারা রাজ্য থেকে। বামফ্রন্টকে এইভাবে পর্য্যুদস্ত করার সাফল্য তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সারদা কান্ডে অভিযুক্ত বিতাড়িত তৃণমূল সংসদ শ্রী কুনাল ঘোষের জেলে যাবার প্রক্কালে সংবাদ মাধ্যমে C.D. মারফত বিবৃতি অনুযায়ী জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল নেত্রীর অভিপ্রায়েরও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের বাহিরে যে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় শক্তি রয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে যাবার তৃণমূলের অভিপ্রায় ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে।

● সাধারণভাবে বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে বামপন্থী কার্যকলাপের সঠিক গভীরতা ও ব্যপ্তির প্রকাশ নিরপেক্ষতার(?) কারণে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় না। সদ্য কয়েকটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাক, (১) দিল্লীতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক কর্মচারীদের পার্লামেন্ট অভিযানের অভিজ্ঞতা। গত ফেব্রুয়ারিতে সারা ভারতে ২ দিনের সাধারণ ধর্মঘট থেকে ওঠা নূন্যতম মজুরী এবং পেনশনের দাবী এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে পার্লামেন্ট অভিযানের দিনেই কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনার আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত থেকে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ঐক্য এবং জঙ্গী মনোভাবের জন্যই এই ঘটনা। (২) ত্রিপুরার বিধানসভায় বামপন্থীদের সাফল্য এবং জাতীয়ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গড় আয় বৃদ্ধি, বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সফলতা সহ ২০-২১টি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অর্জ্জন করেছে ত্রিপুরা সরকার। সঠিক বিকল্প ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। (৩) কেরালায় দুর্নীতিতে অভিযুক্ত CPI(M) এর সাধারণ সম্পাদককে তদন্ত চালিয়ে বেকসূর ছেড়ে দিতে হয়েছে যেমন তেমনি রাজ্যের কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রীকে কোনঠাসা করে তুলেছে। রাজ্যে CPI(M) এর প্লেনাম

সংগঠিত হয়েছে এই পটভূমিকায়, (৪) পশ্চিমবঙ্গে প্রতিরোধে সফল হলে বামপন্থীদের নির্বাচনে সন্তোষজনক ফলাফল হচ্ছে। (৫) এমনকি সদ্য রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে প্রবল অর্থ ও বিজেপি ঝড়ের মধ্যেও CPI(M) এর ভোট সংখ্যায় বেড়েছে গত বিধানসভার থেকে। (৬) UPA-II সরকারের শেষ ভাগে কাজের অধিকার বিল, খাদ্য সুরক্ষা বিল, মহিলা সংরক্ষণ বিল, লোকপাল বিলের মত জনগনের দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের ফসল পাশ হয়েছে বা হতে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ মানুষ জানেন যে ভূমিসংস্কার আইন বা পঞ্চায়েত আইনের মত এই বিল বা আইনগুলির ও বাস্তবায়ন বামপন্থীদের নেতৃত্ব ছাড়া ঘটবে না। (৭) বিজেপি ও কংগ্রেসকে বাহিরে রেখে বামপন্থীদের ডাকা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশনে দেশের ১৪টি দল অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয়ভাবে। (৮) এমনকি দিল্লীর সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দেশে সাধারণ মানুষের দুর্নীতি বিরোধী মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। মাত্র এক বছরের একটি দল আম আদমী পার্টি (AAP) কংগ্রেস ও বিজেপির বাহিরে মানুষের দুর্নীতি মুক্ত তৃতীয় শক্তির বিশ্বাস অর্জ্জন করাতেই সাফল্য এসেছে।

● ১৬তম লোকসভা নির্বাচন কয়েক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক সন্ত্রাস, মিডিয়া সন্ত্রাস, টাকার খেলা প্রভৃতি অশুভ প্রবণতার মাত্রা দ্রুত বাড়ছে এবং আরও বাড়বে। আবার মানুষের দুর্নীতি বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাবও তীব্র এবং ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ভারতবর্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার যতই প্রচার হোক রাজনৈতিক বৈচিত্র্য অর্থাৎ 'রেইনবো প্যাটার্ন' ৭৭ সালের পর থেকেই বাস্তব। কিন্তু ধারাবাহিক এক দলীয় শাসন অতীত হলেও লোকসভার পূর্ণ পাঁচ বছরের মেয়াদ দুই বৃহৎ সর্ব ভারতীয় দল কংগ্রেস বা বিজেপির নেতৃত্বে ফ্রন্ট ছাড়া পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। দুই বৃহৎদল কংগ্রেস এবং বিজেপির মিলিত ভোট গতবারে ১৪তম লোকসভার তুলনায় ১.৩% কমেছিল এই ধারা বজায় থাকবে। অর্থাৎ ৪৭.৪% র কম ভোট পাবে। বিজেপির ভোট এবং আসন বাড়বেই তবে আসন ২০০ অতিক্রম করবে না। আর কংগ্রেসের ভোট এবং আসন দুইই কমবে। কংগ্রেস ক্ষমতার বাহিরে থেকে বিজেপি বিরোধী কোন জোটকে সমর্থন করতে বাধ্য হবে। কংগ্রেস ও বিজেপির বাহিরের বৃহৎ আঞ্চলিক এবং ছোট জাতীয় দলগুলির মিলিত ভোট গত তিনবারের ৩৭.৫% থেকে বাড়বে। তবে দোদুল্যমানতার জন্য, যা পরিস্থিতির চাপে কাটতে শুরু করলেও, এই অল্প সময়ের মধ্যে বামপন্থীদের নেতৃত্বে তৃতীয় বিকল্পের সম্ভবনা প্রায় নেই। সব মিলিয়ে ১৬তম লোকসভা স্থায়ী পাঁচ বছরের সরকার মনে হয় দিতে পারবে না। কেনাবেচা বা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে চলবে ১৬তম লোকসভা। গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, স্বাধীনতার গর্ব্ব, জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্রে আস্থা, ধর্ম্মনিরপেক্ষতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অসহনীয় জ্বালা, বৈষ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রভৃতি বামপন্থী কার্যকলাপের আসল রসদ তাই সংসদ বহীর্ভূত ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর বামপন্থী কার্যকলাপ নির্ধারণ করবে ভারতবর্ষের রাজনীতির নতুন মেরুকরণ।

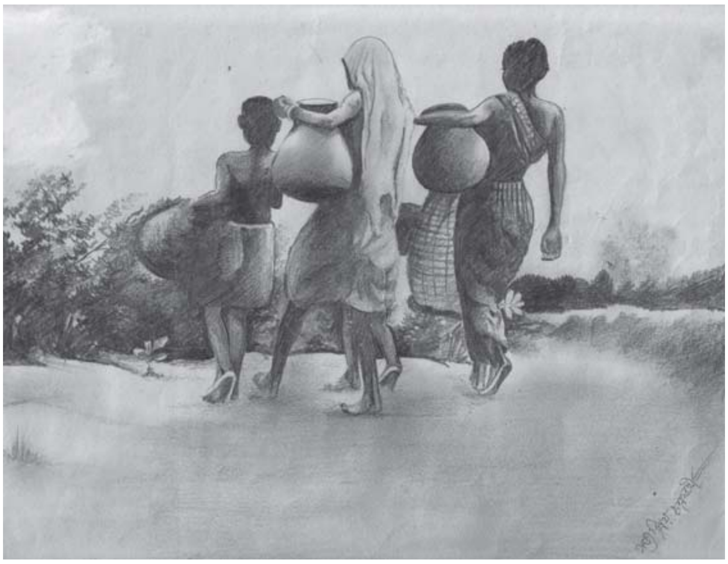

সত্যপ্রিয় চক্রবর্ত্তী